ইতিহাস

প্রথম পত্র

উপমহাদেশের ইতিহাস

[১৫২৬ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত]

কোর্স কোড: HSC-1855

বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের
ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ইতিহাস প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1855

এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০১৯

পুন:মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি- ২০২০, মার্চ-২০২২, জানুয়ারি-২০২৩, জুন-২০২৪, জানুয়ারি-২০২৬

[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত]

প্রচ্ছদ

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর।

কভার গ্রাফিকস

আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ

মোঃ টিপু সুলতান

© **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

ISBN 978-984-34-3147-9

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ

বাংলাবাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫৩, নর্থ ব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০।

সূচিপত্র

ইউনিট- ১: ভারতবর্ষে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা: বাবর ও হুমায়ুন ১-১২
পাঠ-১: মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা ১-৩
পাঠ-২: বাবরের ভারত জয় ও মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ৪-৮
পাঠ-৩: হুমায়ুনের শাসনকাল.....৯-১২

ইউনিট-২ দিল্লি ও বাংলায় আফগান শাসন ১৩-২৩
পাঠ-১: শেরশাহের উত্থান.....১৩-১৫
পাঠ-২: শেরশাহের রাজ্য বিস্তার.....১৫-১৭
পাঠ-৩: শেরশাহের কৃতিত্ব ১৭-১৯
পাঠ-৪: বাংলায় শূর-আফগান শাসন.....১৯-২১
পাঠ-৫: বাংলায় কররানি আফগান শাসন ২১-২৩

ইউনিট- ৩ : মোগল শাসন (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রি.).....২৪-৪৯
পাঠ-১: আকবরের ক্ষমতা গ্রহণ ২৪-২৭
পাঠ-২: আকবরের শাসনকাল : ভূমিরাজস্ব ২৭-২৯
পাঠ-৩: আকবরের শাসনকাল : ধর্মনীতি ২৯-৩১
পাঠ-৪: জাহাঙ্গীরের শাসনকাল ও কৃতিত্ব..... ৩২-৩৩
পাঠ-৫: শাহজাহানের শাসনকাল ও কৃতিত্ব ৩৪-৩৬
পাঠ-৬: আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ও কৃতিত্ব ৩৬-৩৯
পাঠ-৭: মোগল যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ৩৯-৪১
পাঠ-৮: মোগল আমলের অর্থনীতি.....৪১-৪৩
পাঠ-৯: মোগল যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন ৪৩-৪৫
পাঠ-১০: মোগল আমলের স্থাপত্যকলা ৪৫-৪৭
পাঠ-১১: মোগল সাম্রাজ্যের পতন.....৪৭-৪৯

ইউনিট-৪: বাংলায় মোগল শাসন ৫০-৬০
পাঠ-১: বাংলায় বার ভূঁইয়া.....৫০-৫২
পাঠ-২: বাংলায় মোগল সুবাহ প্রতিষ্ঠা ৫২-৫৪
পাঠ-৩: বাংলায় সুবেদারি শাসন ৫৪-৫৫
পাঠ-৪: মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ৫৬-৫৭
পাঠ-৫: মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্প.....৫৮-৬০

ইউনিট-৫: উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন ও ইংরেজ শাসনের সূচনা.....৬১-৮১
পাঠ-১: ইউরোপীয়দের আগমন ৬১-৬৪
পাঠ-২: নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ ৬৫-৬৯
পাঠ-৩: রবার্ট ক্লাইভ ৭০-৭২
পাঠ-৪: মীর কাসিম ও বক্সারের যুদ্ধ.....৭২-৭৫
পাঠ-৫: কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ও এর ফলাফল.....৭৫-৭৭
পাঠ-৬: দ্বৈতশাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ৭৮-৮১

ইউনিট-৬: ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন : কোম্পানি আমল (১৭৬৫-১৮৫৭ খ্রি.) ৮২-১০৯
পাঠ-১: ওয়ারেন হেস্টিংস ৮২-৮৭
পাঠ-২: লর্ড কর্নওয়ালিস ৮৭-৯০
পাঠ-৩: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ফলাফল ৯০-৯৩
পাঠ-৪: লর্ড ওয়েলেসলি ৯৩-৯৭
পাঠ-৫: লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ৯৭-১০০
পাঠ-৬: লর্ড ডালহৌসি ১০১-১০৪
পাঠ-৭: কোম্পানি আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ১০৫-১০৯

ইউনিট-৭: বৃটিশ শাসনামলে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম (১৮৫৭ খ্রি.) ১১০-১১৯
পাঠ-১: সিপাহী বিপ্লবের স্বরূপ ১১০-১১২
পাঠ-২: সিপাহী বিপ্লবের কারণসমূহ ১১৩-১১৫
পাঠ-৩: বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণসমূহ ১১৫-১১৭
পাঠ-৪: বিপ্লবের ফলাফল ১১৭-১১৯

ইউনিট-৮: বৃটিশ শাসনামলে সামাজিক সংস্কার ও স্বাধীকার আন্দোলন ১২০-১৩০
পাঠ-১: ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ১২০-১২২
পাঠ-২: স্যার উইলিয়াম কেরী ১২২-১২৩
পাঠ-৩: রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার ১২৪-১২৬
পাঠ-৪: হাজি শরীয়ত উল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন ১২৬-১২৮
পাঠ-৫: তিতুমীরের আন্দোলন ১২৯-১৩০

ইউনিট-৯: বৃটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন (১৮৫৮-১৯১১ খ্রি.) ১৩১-১৫২
পাঠ-১: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৩১-১৩৩
পাঠ-২: স্যার সৈয়দ আহমদ খান, আলীগড় আন্দোলন ও মুসলিম সংস্কার ১৩৪-১৩৬
পাঠ-৩: মুসলিম সমাজ সংস্কার ১৩৬-১৩৯
পাঠ-৪: বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ ..... ১৪০-১৪২
পাঠ-৫: বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ১৪২-১৪৪
পাঠ-৬: সিমলা ডেপুটেশন ১৪৪-১৪৬
পাঠ-৭: মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম ১৪৬-১৪৮
পাঠ-৮: মর্লি-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯ খ্রি.) ১৪৮-১৫০
পাঠ-৯: বঙ্গভঙ্গ রদ ১৫০-১৫২

ইউনিট-১০ : লক্ষ্ণৌ চুক্তি থেকে ভারত বিভাগ (১৯১৬-১৯৪৭ খ্রি.) ১৫৩-১৮৬
পাঠ ১: লক্ষ্ণৌ চুক্তি (১৯১৬ খ্রি.) ১৫৩-১৫৫
পাঠ ২: খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ১৫৬-১৫৮
পাঠ-৩: বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন (১৯১১-৩৪ খ্রি.) ১৫৮-১৬০
পাঠ- ৪: ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ১৬০-১৬২
পাঠ-৫: বেঙ্গল প্যাক্ট (১৯২৩ খ্রি.) ১৬২-১৬৪

পাঠ-৬: নেহেরু রিপোর্ট ১৬৪-১৬৬
পাঠ-৭: জিন্নার চৌদ্দ দফা ১৬৭-১৬৯
পাঠ-৮: গোলটেবিল বৈঠক ১৬৯-১৭১
পাঠ-৯: সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (১৯৩২ খ্রি.) ১৭১-১৭৩
পাঠ-১০: ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ১৭৩-১৭৫
পাঠ-১১: লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০ খ্রি.) ১৭৫-১৭৭
পাঠ-১২: মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা.....১৭৮-১৮০
পাঠ-১৩: ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন ১৮১-১৮৩
পাঠ-১৪: পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়.....১৮৪-১৮৬

ইউনিট-১১ : পূর্ব বাংলা থেকে মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১).....১৮৭-২৩১
পাঠ ১: ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ১৮৭-১৮৯
পাঠ ২: ভাষা আন্দোলন.....১৯০-১৯৩
পাঠ-৩: পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি ১৯৪-১৯৭
পাঠ- ৪: ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন.....১৯৮-২০১
পাঠ-৫: সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)..... ২০২-২০৫
পাঠ-৬: ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন.....২০৬-২০৮
পাঠ-৭: উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান.....২০৯-২১২
পাঠ-৮: ১৯৭০ সালের নির্বাচন.....২১৩-২১৫
পাঠ-৯: অসহযোগ আন্দোলন ২১৬-২১৮
পাঠ-১০: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ২১৯-২২২
পাঠ-১১: প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ ২২৩-২২৭
পাঠ-১২: মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা ২২৮-২৩৩

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : ইতিহাস প্রথম পত্র **কোর্স কোড : HSC-1855**

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে
বইটি কিভাবে পড়বেন

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা জানেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকারী একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো দূরশিক্ষন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা। দূরশিক্ষন পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে সরাসরি শিক্ষাদান প্রক্রিয়া বিদ্যমান থাকে না। তাই প্রধানত মুদ্রিত সামগ্রী ও শ্রবণ-দর্শন উপকরণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধান সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ দিকটি বিবেচনা করে কোর্সের নাম : ইতিহাস প্রথম পত্র কোর্স কোড : (HSC-1855) বইটি স্ব-শিখন পদ্ধতিতে লেখা হয়েছে এবং লেখার সময় বাউবি'র নির্ধারিত কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে। বইটির প্রতিটি ইউনিট এবং পাঠ সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সহজ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এ বইটিতে রয়েছে প্রচুর জীবন-ঘনিষ্ঠ উদাহরণ। বইটি সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রণীত।

বইটি পড়ার সময় আপনি অবশ্যই প্রতিটি ইউনিট এবং পাঠের প্রথম অংশ ভালোভাবে পড়বেন। সংশ্লিষ্ট পাঠে কি কি বিষয়ে পাঠদান করা হবে এবং আপনি কি কি জানতে পারবেন তা উল্লেখ রয়েছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, প্রথমে ভালোভাবে প্রতিটি পাঠের তত্ত্বীয় আলোচনা করবেন। প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়ন অংশের নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করবেন। যদি পাঠোত্তর সমস্যাগুলোর সমাধান সঠিকভাবে করতে না পারেন, তাহলে বুঝবেন আপনার পাঠটি আবার পড়ার প্রয়োজন রয়েছে। পাঠটি পুনরায় পড়ার পরেও যদি আপনি বুঝতে অসমর্থ হন, সেক্ষেত্রে আপনি প্রতি মাসের নির্ধারিত শুক্রবারে টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে কর্তব্যরত টিউটরের সহায়তা নিতে পারেন। এছাড়াও, বইটির গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহের উপর টেলিভিশন ও বেতারে প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে পাঠের বিষয় শিখতে পারবেন।

আপনার কোর্সের সাথে সংশ্লিষ্ট ভিডিও ও অডিও লেকচার সামগ্রী বাউবি'র ওয়েবসাইটে BOUTube-এ আপলোড করা হয়েছে (ওয়েবসাইটের ঠিকানা: www.bou.edu.bd)। আপনি এগুলো ব্যবহার করে পাঠের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন। আরও জেনে রাখুন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মুদ্রিত/অমুদ্রিত বই ও শিক্ষার্থী-নির্দেশনাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পাঠসামগ্রী ই-বুক (E-BOOK) আকারে ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। আপনি মোবাইল, ল্যাপটপ, নোটপ্যাড বা কম্পিউটারে এগুলো ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম, কোর্স, ভর্তি ও বিবিধ তথ্য গুগল স্টোরে/বাউবি ওয়েবসাইটে BOU APPS আইকনে পাবেন। ওয়েবসাইটে আরও দেখতে পাবেন OSAPS – ONLINE SERVICE AND PAYMENT SYSTEM নামক একটি আইকন। এটি ব্যবহার করে আপনি অনলাইনে সকল প্রকার ফি বিকাশের মাধ্যমে বাউবি অনলাইন একাউন্টে জমা দিতে পারবেন।

সকল শিক্ষার্থীর মঙ্গল কামনা করছি।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল এর কোন্‌টি শিখনফল, কোন্‌টি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোন্‌টি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোন্‌টি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

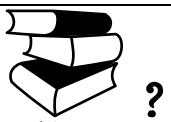 কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

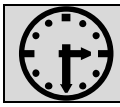 **কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ ৯০ দিন সময় লাগবে**

ই-বুক	এ বিষয়ের ই-বুকের জন্য ব্রাউজ করুন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটের নিচের লিংকে www.bou.edu.bd

অডিও/ভিডিও	এ বিষয়ের অডিও ও ভিডিও প্রোগ্রাম যথাক্রমে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হবে। প্রোগ্রামের সিডিউল সংগ্রহ করে তা শুনতে পাবেন।

প্রয়োজনে	**সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–**	ড. মো. আদনান আরিফ সালিম সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস) ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর-১৭০৫। adnan@bou.ac.bd

ভারতবর্ষে মোগল শাসনের প্রতিষ্ঠা: বাবর ও হুমায়ুন

ইউনিট ১

ভূমিকা

ষোল শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষের অরাজক রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর এদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। রাজত্বকালের পুরো সময়েই তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি বংশধরদের জন্য একটি সুসংগঠিত রাজ্য রেখে যেতে পারেন নি। এ কারণে হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করার পরই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। দিল্লির সিংহাসন তাঁর হাত-ছাড়া হয়ে যায়। তবে দীর্ঘ পনের বছর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন।

বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল, কিভাবে বাবর এদেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর পুত্র হুমায়ুনের শাসন কেমন ছিল তা এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১.১ মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- তৎকালীন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে এদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজন্যবর্গের অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ক্ষুদ্র রাজ্য, ইব্রাহিম লোদী, রাজপুত, মোগল

মধ্য এশিয়া থেকে রাজ্যজয়ের নেশায় বেরিয়েছিলেন বাবর। ১৪১৪ সালে কাবুল অধিকারের পর বাবর ভারত বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। ১৫১৯ সালে ভারত অভিযানের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। এসময় ভারতের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন লোদী সুলতানরা। ভারতের পথে ছোট খাট আরো কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করতে কয়েকটি বছর কেটে যায়। বাবরের আক্রমণের পূর্বে ভারতের শেষ সুলতান ছিলেন ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৫ খ্রি.)। দিল্লি ও আশেপাশের অঞ্চলগুলোর উপর তাঁর অধিকার ছিল। ইব্রাহিম লোদী খুব দক্ষ শাসক ছিলেন না। সামন্ত রাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অনেকেই তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। তাছাড়া ভারতবর্ষের হিন্দু রাজন্যবর্গ ও রাজপুতদের সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করতে পারেন নি দিল্লির সুলতানগণ। ফলে তুঘলক বংশের শাসনের (১৩২০-১৪১৩) শেষের দিকে দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ কারণে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। ভারতে সুদূর দক্ষিণে বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য, উত্তর ভারতে কাশ্মীর ও জৌনপুর রাজ্য, পূর্বাঞ্চলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে পাঞ্জাব, মালব ও গুজরাটে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বাধীনতা প্রিয়। এদের সাথে

বিরোধের ফলে দিল্লির কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। ভারতের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বাবর এদেশে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবরের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে পাঞ্জাবে দৌলত খান লোদী স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। দিল্লির সুলতান ইব্রাহিম লোদী দৌলত খানের স্বাধীন শাসনের বিরোধিতা করায় উভয়ের মধ্যে দারুণ শত্রুতা দেখা দেয়। সুলতান ইব্রাহিম লোদীর খালাত ভাই আলম খান লোদী বিদ্রোহী দৌলত খান লোদীর সাথে যোগ দিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান ও দৌলত খানের সাথে যোগদান করেন। তাঁরা দিল্লির লোদী শাসনের অবসানের জন্য কাবুলে অবস্থানরত বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

দিল্লির লোদী সাম্রাজ্যের বাইরে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মালব। মালব রাজ্যটি ছিল রাজপুতনা ও বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) মালব স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৬ শতকে মালবের সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁর রাজপুত সামন্তরা ক্ষমতা দখল করে নেয়। সামরিক দিক থেকে মালবের অবস্থান ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া গুজরাটেও একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এ রাজ্যটি ছিল সমৃদ্ধশালী। গুজরাটের বন্দর থেকে বহু পণ্য পশ্চিম এশিয়ায় রপ্তানি হতো। এ জন্য পর্তুগিজ বণিকরা গুজরাটের উপকূলে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। গুজরাটের সুলতান শেষ পর্যন্ত পর্তুগিজদের দমন করতে সক্ষম হন। রাজপুতনায় অনেকগুলো স্বাধীন রাজ্য ছিল। দিল্লির সুলতানের দুর্বলতার সুযোগে এসব রাজ্য শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই রাজ্যগুলোর মধ্যে মেবার ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। সংগ্রাম সিংহ বা রানা সংগ্রাম সিংহ ছিলেন মেবারের শাসনকর্তা। তিনি রাজপুতদের নেতা ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত ছিল। ইব্রাহিম লোদীর দুর্বলতার সুযোগে সংগ্রাম সিংহ দিল্লি অধিকারের ইচ্ছা পোষণ করেন।

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যের রাজা কৃষ্ণদেব খুব উচ্চাভিলাষী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজ প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাহমনী রাজ্যের সাথে তাঁর সংঘাত শুরু হয়। অন্যদিকে উত্তর ভারতে কাশ্মীর রাজ্যেও তখন গোলযোগপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল। পূর্ব ভারতের বাংলায় সুলতান হুসেন শাহের পুত্র নুসরত শাহ রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্য সীমানা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভারতবর্ষ একটি বিশাল দেশ। এদেশে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা রাজনৈতিক অস্থিরতার মূল কারণ। এমন পরিস্থিতি বাবরের জন্য সুযোগ এনে দেয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে তিনি চূড়ান্ত আক্রমণ পরিচালনা করেন। আক্রমণ করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মধ্যযুগের ভারতের একটি মানচিত্র অংকন করবে এবং এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোর অবস্থান বিভিন্ন রঙে চিত্রিত করবে

সারাংশ

বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রাক্কালে এদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। তখন দিল্লি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শাসক ছিলেন ইব্রাহিম লোদী। তিনি অনেকটা দুর্বল শাসক ছিলেন। ফলে অমাত্যবর্গ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের উপর তার নিয়ন্ত্রণ কম ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের দৌলত খান লোদী সুলতানের চরম বিরোধিতা করেন এবং ইব্রাহিম লোদীকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বাবরকে আমন্ত্রণ জানান। এমন সংকটপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাবর ভারত আক্রমণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাবরের ভারত বিজয়ের প্রাক্কালে দিল্লির সুলতান ছিলেন কে?

ক) ইব্রাহিম লোদী
খ) দৌলত খান লোদী
গ) আলম খান লোদী
ঘ) দরিয়া খান

২। দৌলত খান লোদী কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন?
ক) কাশ্মীর খ) মালব
গ) পাঞ্জাব ঘ) বাংলা

৩। মেবার-এর শাসনকর্তা ছিলেন কে?
ক) রাজা কৃষ্ণ দেব খ) রানা সংগ্রাম সিংহ
গ) দৌলত খান লোদী ঘ) দরিয়া খান

৪। বাবরের ভারতবর্ষ বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন কে?
ক) হুসেন শাহ খ) নুসরৎশাহ
গ) গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ঘ) আলাউদ্দিন মাহমুদ শাহ

৫। বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান–
i. দৌলত খান লোদী
ii. আলম খান লোদী
iii. দরিয়া খান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

কামালউদ্দিন ছিলেন বহরমপুরের জমিদার। তার জমিদারী ছিল সমৃদ্ধশালী। এখানকার বন্দর থেকে বহু পণ্য পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে রপ্তানি হতো। এটা দেখে রতনপুর রাজ্যের বণিকরা বহরমপুরের উপকূলে তাদের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। বহরমপুরের জমিদার শেষ পর্যন্ত উক্ত ব্যবসায়ীদের দমন করতে সক্ষম হয়।

ক. কোন দেশের অধিবাসীদের পর্তুগিজ বলা হয়? ১
খ. মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? ২
গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন দেশের বণিকদের আধিপত্য বিস্তারে সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. 'উক্ত বণিকরা শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়।' পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১.২ বাবরের ভারত জয় ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাবরের বাল্যজীবন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাবরের ভারত জয়ের লক্ষ্যে পরিচালিত অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- পানিপথ যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করতে আরও যে সকল যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল তার বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাদশাহ বাবরের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বাবর, পানিপথ, খানুয়া, তুলঘুমা

জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পিতার দিক থেকে বাবর ছিলেন বিখ্যাত তুর্কি তৈমুর লং-এর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং মায়ের দিক থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান। উপমহাদেশে বাবরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মোগল বংশ নামে পরিচিত হয়েছে মোঙ্গলদের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকার কারণেই। বাবর ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার ফারগানায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওমর মির্জা ফারগনার শাসনকর্তা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বাবর বার বছর বয়সে ফারগানার অধিপতি হন। তিনি তাঁর বিখ্যাত পূর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ একাধিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দখল করেন। কিন্তু অচিরেই বাবরের নিকট আত্মীয় পরিজন, রাজন্যবর্গ এবং উজবেক নেতা সাইবানি খানের বিরুদ্ধাচারণের ফলে ফারগানা ও সমরখন্দ তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়। তিনি রাজ্য হারা হয়ে ভাগ্যান্বেষণে বের হন। এভাবেই এক সময় হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন তিনি। ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে উজবেক শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথম বারের মতো বাবর কাবুল জয় করেন। কাবুল বিজয়ের পরও বাবর পিতৃসিংহাসন পুনরুদ্ধার ও রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

বাবরের ভারত অভিযান

বাবরের ভারত অভিযান আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। ঐতিহাসিকদের মতে মধ্য এশিয়ায় বাবরের যে ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছিল তা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্যই তিনি ভারত অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ভৌগোলিকভাবে হিন্দুস্তানের অবস্থান ছিল কাবুলের পাশেই। অন্যদিকে ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারতীয় কোনো কোনো শাসকের আমন্ত্রণ বাবরকে ভারত আক্রমণে উৎসাহ যুগিয়েছিল। দিল্লির শাসক ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে পানিপথের যুদ্ধের পূর্বেও বাবর কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এসব অভিযানকে প্রাথমিক অভিযান বলা হয়ে থাকে। ১৫১৯ থেকে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাবর ভারতে তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানে তিনি সিন্ধুনদ অতিক্রম করে অতি সহজেই বজৌর দুর্গ, ভীরা, কুশব ও চেনাব নদীর অববাহিকা অঞ্চল দখল করেন। ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী ও কয়েকজন আফগান অমাত্য বিশেষ করে আলম খানের আমন্ত্রণ জানালে বাবর তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন এবং লাহোর, দিপালপুর ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। এ বিজয়ের পর বাবর পাঞ্জাবকে কয়েকভাগে ভাগ করেন এবং দৌলত খানের পুত্র দিলওয়ার খান, ইব্রাহিম লোদীর চাচা আলম খান এবং মোগল আমীরদেরকে প্রশাসনের দায়িত্ব দিয়ে কাবুলে ফিরে যান। বাবরের অনুপস্থিতিতে দৌলত খান পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করেন এবং আলম খান ও দিলওয়ার খানকে বিতাড়িত করেন। আলম খান বাধ্য হয়ে কাবুলে আশ্রয় নেন এবং বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে ১৫২৫ খ্রিস্টাব্দে বাবর পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি সহজে পাঞ্জাব জয় করেন এবং দিল্লির দিকে এগিয়ে যান। ইব্রাহিম লোদী বাবরকে পানিপথ প্রান্তরে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে বাঁধা দেন। এই বিখ্যাত পানিপথ প্রান্তরের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদী পরাজিত হলে প্রাথমিকভাবে বাবরের ভারত বিজয় সম্পন্ন হয়।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ

বাবর বুঝেছিলেন পানিপথের প্রান্তরের যুদ্ধে জয় লাভ করলে তাঁর দিল্লির সিংহাসনে বসার পথ সহজ হয়ে যাবে। তাই তিনি দিল্লির নিকটবর্তী পানিপথ প্রান্তরে দিল্লির লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পরেন। তারিখটি ছিল ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ এপ্রিল। বাবরের আত্মজীবনী *তুযুক-ই-বাবরী* থেকে জানা যায়, এ সময়ে তাঁর সাথে বার হাজার সৈন্য ছিল। তাছাড়া পাঞ্জাব জয়ের পর কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত সৈন্যও তাঁর সাথে যোগদান করে। তাঁর জ্যৈষ্ঠপুত্র হুমায়ুনও তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। অপরদিকে ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। পানিপথ প্রান্তরে বাবর ভিন্ন রকম যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিরক্ষা হিসেবে পরিখা খনন করেন। আর ভারতবর্ষে প্রথমবারের মতো কামান ও গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করেন। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন।

যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ

প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের মূল কারণগুলো নিম্নরুপ:

১. বাবরের সৈন্য ইব্রাহিম লোদীর সৈন্য অপেক্ষা অধিক সুশৃঙ্খল ও সুশিক্ষিত ছিল।
২. ইব্রাহিম লোদীর অস্ত্রশস্ত্র অপেক্ষা বাবরের অস্ত্রশস্ত্র ছিল অধিক উন্নতমানের।
৩. বাবর ছিলেন একজন দক্ষ সেনানায়ক। তিনি ইব্রাহিম লোদীর বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে দক্ষতার সাথে এবং উন্নত যুদ্ধ কৌশল গ্রহণ করে জয় লাভ করেন। তাছাড়া যুদ্ধ পরিচালনায় ইব্রাহিম লোদী অপেক্ষা বাবর অধিক অভিজ্ঞ ছিলেন।
৪. ইব্রাহিম লোদীর আত্মীয় স্বজনের ষড়যন্ত্র তাঁকে যেমন দুর্বল ও শক্তিহীন করে ফেলেছিল বিপরীত দিকে এই পরিস্থিতি বাবরকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছিল।
৫. বাবর প্রথম ভারতবর্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগ্নেয়াস্ত্র কামান ব্যবহার করেন। তাঁর গোলন্দাজ বাহিনী সুশৃঙ্খল ও দক্ষ ছিল।
৬. বাবর উজবেগী ও তুর্কীদের নিকট থেকে নতুন রণকৌশল শিখেছিলেন। এ কৌশলকে বলা হত 'তুলঘুমা' যুদ্ধরীতি। এ রীতি মোতাবেক তিনি যুদ্ধে পরিখা খনন, সৈন্যদের মাঝে ব্যুহ রচনা, আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও অশ্বারোহী দ্বারা আক্রমণ পরিচালনা করেন।

পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ যুদ্ধে বাবরের বিজয়ের ফলে ভারতের তুর্কী আফগান দীর্ঘ শাসনের (১২০৩-১৫২৬ খ্রি.) অবসান ঘটে। এ যুদ্ধের ফলে বাবর দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে লোদী সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে মোগল বংশের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। পানিপথের যুদ্ধের ফল হিসেবে ভারতের প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে না হলেও আংশিকভাবে বাবরের হাতে চলে যায়। পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর বাবর মোগল বাহিনীর অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষে গোলন্দাজ বাহিনী প্রবর্তন করেন। এ যুদ্ধে বাবরের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। রাশব্রুক উইলিয়ামস বলেছেন যে, "পানিপথের জয় দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ ঘটে; তখনও আফগান উপজাতিসমূহের বিরোধিতা ছিল প্রধান বাধা"। পানিপথের যুদ্ধ জয়ের পর বাবর দিল্লি ও আগ্রায় বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন এবং এ সম্পদ বিতরণ করে তিনি সহযোগীদের সমর্থন আদায় করেন। তাছাড়া পানিপথের জয়ের পর বাবর ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বাবরের অধিকারে আসে। বহু আফগান সর্দার তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন।

সুতরাং বলা যায় পানিপথের এই যুদ্ধের ফলাফলের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে দীর্ঘস্থায়ী মোগল সাম্রাজ্যের সূচনা পর্ব শুরু হলো।

খানুয়ার যুদ্ধ, ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দ

ভারতের অন্যান্য শক্তির মধ্যে রাজপুত শক্তি ছিল অন্যতম। রাজপুতানার মেবারের অধিপতি ছিলেন রানা সংগ্রাম সিংহ। সংগ্রাম সিংহ আশা করেছিলেন যে বাবর তাঁর পূর্বপুরুষের ন্যায় দিল্লি লুট করে স্বদেশে ফিরে যাবেন। তখন তিনি ইব্রাহিম লোদীর রণক্লান্ত সেনাবাহিনীকে সহজেই পরাস্ত করে মুসলিম শাসনের ধ্বংসস্তূপের উপর এক স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু পানিপথের যুদ্ধে জয় লাভের পর বাবরের ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্পের কথা জেনে সংগ্রাম সিংহ একটি শক্তিশালী রাজপুত সৈন্য বাহিনী গঠন করেন। বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবর্গ, আজমীর, মারওয়াড়, আম্বর ও চান্দেরীর রাজপুতগণ এবং মেওয়াটের হাসান খান তাঁর দলে যোগদান করেন। প্রতিপক্ষের যুদ্ধ প্রস্তুতি দেখে বাবরের সৈন্যগণ আতংকিত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ না করে কাবুলে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। সেনাদলের মনোবল বৃদ্ধির জন্য

বাবর দু'টি কাজ করেন। তিনি নিজের পানপাত্র ভেঙ্গে ফেলেন এবং তাঁর সোনার ও রূপার পানপাত্রগুলো বিতরণ করে দেন। বাবর সৈন্যদেরকে উদ্দীপ্ত করে মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দেন। এভাবে তিনি রাজপুতদের মোকাবেলা করার জন্য আগ্রার পশ্চিমে খানুয়ার প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেন।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ খানুয়ার প্রান্তরে রানা সংগ্রাম সিংহ এবং বাবরের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রায় ১০ ঘন্টার যুদ্ধে রাজপুত বাহিনী অসাধারণ বিক্রম দেখালেও বাবরের রণকৌশল শেষ পর্যন্ত রাজপুতদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। বাবর এ যুদ্ধেও তুলঘুমা যুদ্ধ রীতি এবং আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা রাজপুত শক্তিকে ধ্বংস করেন। সংগ্রাম সিংহ আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সহযোগীরা তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব

খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর সংগ্রাম সিংহের ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যায়। শক্তিশালী মোগলদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য আর কোনো শক্তি রইল না। রাজপুত শক্তি পতনের ফলে আফগানরাও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কারণ রাজপুতদের সাথে যোগ দিয়ে জোট গড়ার সম্ভাবনাও বিলীন হয়ে যায়। এ যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারতে মোগল শক্তির ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং বাবর কাবুল থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। অতঃপর তিনি সহজে মালবের মেদিনী রায়কে পরাস্ত করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক খানুয়ার যুদ্ধকে বক্সারের যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রাধান্য স্থাপনে বক্সার যেমন একটি নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ, ভারতে মোগল শক্তির উত্থানে খানুয়ার যুদ্ধও ছিল তদরূপ।

ফলাফল

১. খানুয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে মোগল শক্তি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।
২. বাবরের ভারতবর্ষ আক্রমণকালীন সময়ে এদেশে দুইটি পরাক্রমশালী শক্তি ছিল। তাঁরা হলো আফগান ও রাজপুত। পরপর দু'টি যুদ্ধে বিজয়ের ফলে উভয় শক্তি বিনষ্ট হয়। ফলে ভারতবর্ষে মোগল শক্তির উত্থানের পথ খুলে যায়।
৩. খানুয়ার প্রান্তরে জয়লাভের পর মোগলদের কেন্দ্রীয় রাজধানী কাবুল থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়।
৪. খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর অন্যান্য রাজপুতদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হন।

গোগরার যুদ্ধ, ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দ

ভারতবর্ষের দু'টি বৃহৎ শক্তি ইব্রাহিম লোদী ও রানা সংগ্রাম সিংহ বাবরের নিকট পরাজিত হলেও পূর্ব ভারতের আফগানগণ তাঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি। বাংলার সুলতান নুসরত শাহের আশ্রয়ে আফগান সর্দারগণ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। বিহারের শের খান, জৌনপুরের মুহম্মদ লোদী এবং নুসরৎ শাহ একযোগে দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। বাবরের বাহিনী দ্রুত কনৌজ, বারাণসী, এলাহাবাদ দখল করে বিহার সীমান্তে গোগরা নদীর তীরে উপনীত হলে মুহম্মদ লোদী ও শের খান বাধা দেন। কিন্তু সুশিক্ষিত মোগল বাহিনীর নিকট আফগান বাহিনী পরাজিত হয়। ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে মাহমুদ লোদী বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহের শরণাপন্ন হন। কিন্তু বাবরের সঙ্গে নুসরত শাহের এক সন্ধি হয়। এর ফলে বাংলার সুলতান মোগল আফগান যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে বাবর নুসরত শাহের রাজ্য সীমা মেনে নেন এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অঙ্গীকার করেন। এ যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে বাবরের বিজয় অভিযান সমাপ্ত হয়। বাবর আমুদরিয়া থেকে গোগরা এবং হিমালয় থেকে গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হন। এভাবে ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন বাবর আগ্রায় ইন্তেকাল করেন।

বাবরের চরিত্র

তুর্কী ভাষায় 'বাবর' শব্দের অর্থ 'সিংহ'। বাবরের চারিত্রিক গুণাবলি ও দৃঢ়তার জন্য তাঁর এ নামকরণ যথার্থ বলে অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মধ্য এশিয়ার দুই প্রধান বিজেতা তৈমুর লং ও চেঙ্গিস খানের রক্ত তাঁর দেহে প্রবহমান ছিল। বাবরের চরিত্রে উভয় নেতার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি ছিলেন মধ্য এশিয়ার একজন যাযাবর যোদ্ধা। যোদ্ধা জাতিসুলভ স্বভাব নিয়ে সমরখন্দ, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে ভাগ্যান্বেষণ করেন। মধ্য এশিয়ার জন্য তাঁর ভালবাসা ছিল আন্তরিক। মধ্য এশিয়ার লোকদের স্বভাব অনুযায়ী বাবর যুদ্ধকে জীবনের এক স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে মনে করতেন।

জয় বা পরাজয়ে তিনি ছিলেন অবিচলিত। যুদ্ধের প্রয়োজনে চরম নিষ্ঠুরতা দেখালেও তিনি স্বভাব-নিষ্ঠুর ছিলেন না। যুদ্ধের মধ্যেও তিনি উদ্যান রচনা ও কবিতা রচনার কথা ভাবতেন। বস্তুত বাবরের হৃদয় ছিল কোমল। তিনি তাঁর পরিবারের

লোকজনদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন সাহসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও আত্মবিশ্বাসী, বিপদে তিনি ধৈর্য হারাতেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে তিনি শত্রুপক্ষের দুর্বল দিকগুলো খুঁজে বের করতেন। সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্যে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে বাবর ছিলেন ফরাসি বীর নেপোলিয়নের মতো আত্মনির্ভরশীল এবং ধৈর্যশীল। ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, "যোদ্ধা, শাসক ও পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে বাবর মধ্যযুগের একজন আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নরপতি ছিলেন।" বাবর ছিলেন কষ্টসহিষ্ণু। রাজ্যহারা হয়ে তিনি বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন। তবুও তিনি হতোদ্যম হন নি। সর্বোপরি তিনি ছিলেন স্নেহবৎসল পিতা।

শাসক হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তিনি যদি মোগল শক্তিকে ভারতমুখী না করতেন তাহলে মধ্য এশিয়ায় হয়ত উজবেগ জাতির সাথে সংঘর্ষে তারা ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ধ্বংস করে একক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি রাজপুত এবং আফগান শক্তিকে দুর্বল করে দিয়ে পরবর্তীকালে আকবরের সাম্রাজ্য গড়ার কাজ সহজ করেছিলেন। তিনি 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ এবং সিংহাসনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। বাবরের সাম্রাজ্য পশ্চিমে কাবুল থেকে পূর্বে বিহার এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি মাত্র চার বছর (১৫২৬-১৫৩০ খ্রি.) রাজত্ব করেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে শাসন কাঠামোর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করতে পারেন নি। তবে তিনি বাদশাহ ও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক দপ্তরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা, দিওয়ান (রাজস্ব কর্মকর্তা), শিকদার ও কোতোয়াল বা নগরাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। তবে তিনি সামন্ত ও জায়গীরদারদের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করেন।

শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী হিসেবে বাবরের কৃতিত্ব

বাবর শুধু একজন শাসক ও যোদ্ধাই ছিলেন না, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত *তুযুক-ই-বাবরী* বা বাবরের আত্মজীবনী তুর্কী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাবর দিল্লি ও আগ্রায় বেশ কয়েকটি অট্টালিকা, উদ্যান এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নর্দমা নির্মাণ করেছিলেন।

বাবর পরাজিত আফগান ও রাজপুতদের প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে মৈত্রী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বাবর ছিলেন মধ্যযুগের একজন আকর্ষণীয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নরপতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাবরের কৃতিত্ব নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন

সারাংশ

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবর পিতৃরাজ্য ফারগানা হারিয়ে অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে কাবুলের সিংহাসন দখল করেন। কাবুল থেকে বাবর ভারতবর্ষে আক্রমণ পরিচালনা করেন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা তাঁকে এদেশ বিজয়ে উৎসাহিত করে। বাবরের এদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চল আক্রমণের প্রাথমিক সাফল্য এবং পরবর্তীকালে পানিপথ, খানুয়া ও গোগরার যুদ্ধের বিজয়ের মধ্যদিয়ে এদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাট বাবর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক) তাসখন্দ খ) ফারগানা

গ) বোখারা ঘ) সমরখন্দ

২। কত খ্রিস্টাব্দে পানি পথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক) ১৫২৪ খ) ১৫২৫
গ) ১৫২৬ ঘ) ১৫২৭

৩। লোদী বংশের শেষ সুলতান কে?
ক) ইব্রাহিম লোদী খ) বাহলুল লোদী
গ) দৌলত খান লোদী ঘ) সিকান্দার লোদী

৪। কত খ্রিস্টাব্দে বাবর মৃত্যুবরণ করেন?
ক) ১৫২৬ খ) ১৫২৭
গ) ১৫২৯ ঘ) ১৫৩০

৫। পানি পথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের কারণ–
i. বাবরের সৈন্য সুশৃংখল ও সুশিক্ষিত ছিল
ii. বাবরের অস্ত্র-শস্ত্র অধিক উন্নতমানের ছিল
iii. এ যুদ্ধে বাবর কামান ব্যবহার করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জাফরের পিতা চন্দ্রদ্বীপ নামক নগর রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই জাফরকে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অচিরেই তার নিকটাত্মীয় পরিজন, সভাসদ, আমীর ওমরাদের বিরুদ্ধাচারণের ফলে তার রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে যায়। অনেক বার চেষ্টা করেও রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে তা দখল করে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. তুযুক-ই-*বাবরী* গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১
খ. 'ভারত বর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল'– ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের জাফরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন শাসকের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত শাসকের সমর কৌশল বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১.৩ হুমায়ুনের শাসনকাল (১৫৩০-১৫৪০ খ্রি. ও ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সিংহাসনে আরোহণ করে হুমায়ুন যেসব বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুমায়ুনের সাথে শেরশাহের সংঘর্ষের কারণ ও ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।
- বাহাদুর শাহের সাথে হুমায়ুনের সংঘর্ষের বিবরণ দিতে পারবেন।
- হুমায়ুনের বিপর্যয়ের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	হুমায়ুন, শেরখান, শেরশাহ, বিলগ্রামের যুদ্ধ

মৃত্যুর পূর্বে সম্রাট বাবর পুত্র হুমায়ুনকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছিলেন। তাই ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর মৃত্যুবরণ করলে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। বাদশাহ হুমায়ুনের শাসনামলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায় ১৫৩০-৪০ খ্রিস্টাব্দ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। মাঝখানে ১৫ বছর তিনি পারস্যে প্রবাস জীবনযাপন করেন।

হুমায়ুনের রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণের সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অস্থিতিশীল ও বিপদসংকুল। পূর্বদিকে আফগানগণ এবং পশ্চিমে গুজরাটের শাসক বাহাদুর শাহ মোগল প্রভুত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাড়িয়েছিল। হুমায়ুনের আপন ভাইয়েরাও নানা ধরণের সংকট তৈরি করেন। তাঁর ভগ্নিপতি মুহম্মদ জামান মির্জা এবং চাচাতো ভাই মুহম্মদ সুলতান মির্জারও দিল্লির সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত মোগল সৈন্যবাহিনী কিছুটা বিশৃঙ্খল হয়ে পরেছিল। এমন দুর্বল অবস্থা থেকে উত্তরণে ব্যর্থ হলে হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনচ্যুত হন।

হুমায়ুনের সাথে বাহাদুর শাহের সংঘর্ষ

সিংহাসনে আরোহণের ছয় মাসের মধ্যে হুমায়ুন কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন। তবে বিহারের শাসনকর্তা মাহমুদ লোদী বিদ্রোহ করলে তিনি অবরোধ উঠিয়ে ফেলেন এবং বিহার আক্রমণ করে মাহমুদ লোদীকে পরাস্ত করেন। হুমায়ুন এ বিজয়ের পর আফগান নেতা শের খান সুরের চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। শেরখান হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করলে তিনি (হুমায়ুন) আগ্রায় ফিরে আসেন। কিছু দিনের মধ্যে পূর্বাঞ্চলে শের খান এবং গুজরাটে বাহাদুর শাহ তাঁদের নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করে। এ সংবাদে বাদশাহ শংকিত হয়ে পূর্বাঞ্চলের পরিবর্তে গুজরাটে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।

গুজরাট কাথিয়াড়ের সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। হুমায়ুনের আমলে গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন বাহাদুর শাহ। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং হুমায়ুনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। আফগান বিদ্রোহীদের আশ্রয়দান এবং সাহায্য প্রদান করে তিনি হুমায়ুনের বিরাগভাজন হন। তাছাড়া মালব, রণথম্ভোর, রাজপুতনা ও চিতোর বিজয়ের পরিকল্পনা করলে তাঁর সাথে হুমায়ুনের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। হুমায়ুন বিদ্রোহী আমীরদেরকে ফেরত চেয়ে বাহাদুর শাহের সাথে আপোস মীমাংসার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের প্রস্তাব নাকচ করে দেন। ফলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন আহমদাবাদে। এরপর বাদশাহ হুমায়ুন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলে বাহাদুর শাহ গুজরাট পুনরুদ্ধার করেন। এ সময়ে পূর্বাঞ্চলে শের খান প্রভাবশালী হয়ে উঠলে বাহাদুর শাহের বিদ্রোহ দমন সম্রাটের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি।

হুমায়ুনের সাথে শের খানের সংঘাত

শের খান ছিলেন ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে বিহার প্রদেশের আফগান নেতা। শের খান বাদশাহ বাবরের জীবদ্দশাতেই বিহারের অন্তর্গত সাসারামের সামন্ত শাসক ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি চুনার দুর্গের অধিপতি তাজ খানের বিধবা পত্নী লাদ মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গের অধিপতি হন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ হুমায়ুন চুনার দুর্গ অবরোধ করলে শের খান তাঁর সাথে সন্ধি

করেন এবং বাদশাহের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিজকে রক্ষা করেন। ইতোমধ্যে বিহারের শাসনকর্তা জামাল খান লোহানী বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দিন মাহমুদ শাহের সাহায্যে শের খানকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বীর যোদ্ধা শেরখান এই সম্মিলিত বাহিনীকে সুরাজগড়ের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এভাবে তিনি বিহারের অধিপতি হন। অতঃপর শেরখান বাংলার প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি উপর্যুপরি দু'বার বাংলা আক্রমণ করে রাজধানী গৌড়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিলেন।

বাদশাহ হুমায়ুন পূর্বাঞ্চলে শেরখানের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে কিছুটা চিন্তিত হন এবং তাঁকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে সসৈন্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। বাংলার পথে হুমায়ুন চুনার দুর্গ আক্রমণ করে অধিকার করে নেন। চুনার দুর্গ জয় করে হুমায়ুন দীর্ঘ ছয় মাস বাংলায় অতিবাহিত করেন। এ সুযোগে শের খান বানারস ও জৌনপুর অধিকার করেন।

সুচতুর শেরখান হুমায়ুনের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া করেন। তিনি বিহার ও জৌনপুরে মোগল অধিকৃত অঞ্চল দ্রুত অধিকার করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। শের খান দিল্লির সাথে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেন। ফলে হুমায়ুন আতংকিত হয়ে পড়েন এবং কাল বিলম্ব না করে সসৈন্যে আগ্রার দিকে যাত্রা করেন। পথে গঙ্গা নদীর তীরে চৌসা নামক স্থানে শেরখান তাঁর গতিরোধ করেন। এই দুঃসময়ে হুমায়ুন তাঁর ভাইদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে শেরখানের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। এ যুদ্ধে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন পরাজিত হন। হুমায়ুনের সৈন্য বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য গঙ্গা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এতে অনেকের সলিল সমাধি ঘটে। হুমায়ুন কোনো রকমে গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ বাঁচান এবং আগ্রায় পৌঁছেন। কথিত আছে যে তিনি যখন গঙ্গায় নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হন তখন নিজাম নামে এক ভিস্তিওয়ালা তাঁকে প্রাণে রক্ষা করেন। তিনি তাঁর প্রাণরক্ষাকারীকে বিপুল সম্মানে ভূষিত করেন এবং একদিনের জন্য দিল্লির সিংহাসনে বসান। এই যুদ্ধ জয়ের ফলে বাংলা, বিহার, জৌনপুর, কনৌজ শেরখানের হস্তগত হয়। তাঁর শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তিনি ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে. 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করে রাজকীয় মর্যাদায় নিজেকে ভূষিত করেন। তিনি নিজের নামে খুৎবাহ পাঠ ও মুদ্রা ইস্যুর ব্যবস্থা করেন।

বিলগ্রামের যুদ্ধ (১৫৪০ খ্রি.)

চৌসার যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি এবং ব্যর্থতার বেদনা সহ্য করতে না পেরে হুমায়ুন পুনরায় ভাইদের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাহায্য তিনি পান নি। তাই তিনি মাত্র চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে শেরশাহকে বাধা দেয়ার জন্য কনৌজের পথে অগ্রসর হন। অপর পক্ষে শেরশাহের সৈন্য সংখ্যা ছিল পনের হাজার। তিনি এ সৈন্য নিয়ে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে হুমায়ুনের মুখোমুখী হন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আগ্রার পথে পলায়ন করেন। শেরশাহ দ্রুত দিল্লি, আগ্রা অধিকার করে নিলে হুমায়ুন পারস্যের দিকে পলায়ন করেন। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতে সাময়িকভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে এবং শেরশাহের নেতৃত্বে আফগান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ব্যর্থতার কারণ

শেরশাহের সাফল্য ও হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ করা যায়:

১. **শেরশাহের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও সামরিক দক্ষতা**- শেরশাহ ছিলেন কৌশলী ও দূরদর্শী শাসক। তিনি হুমায়ুনকে গৌড় জয় করতে সুযোগ দিয়ে কৌশলে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করেন। অন্যদিকে হুমায়ুনের দূরদর্শিতার অভাব ছিল। চুনার এবং পরে গৌড়ে অযথা কালক্ষেপণ তাঁর অদূরদর্শিতা প্রমাণ করে।

২. **বাবরের সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক দুর্বলতা**- বাবর যে সাম্রাজ্য ও শাসন ব্যবস্থা রেখে যান তা এত দুর্বল, কাঠামোহীন ও ভঙ্গুর ছিল যে হুমায়ুনের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বাবর রাজকোষ শূন্য রেখে যান এবং তিনি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থা কায়েম করে যেতে পারেন নি।

৩. **সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য**- শেরশাহের সেনাবাহিনী যুদ্ধ নিপুণ সৈন্য দ্বারা সুগঠিত ছিল। কিন্তু হুমায়ুনকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল বলে তিনি সৈন্য বাহিনীকে সুগঠিত করার সময় ও সুযোগ পান নি।

৪. **হুমায়ুনের চারিত্রিক দুর্বলতা**- হুমায়ুন ছিলেন দুর্বল চিত্তের অধিকারী। তিনি তাঁর ভাইদের প্রতি কোমলতা দেখিয়ে পরে অনুতাপ করতে বাধ্য হন। ঐতিহাসিক লেনপুল বলেছেন যে হুমায়ুনের চরিত্রে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, জেদ ও অধ্যবসায়ের অভাব ছিল। তিনি কোনো বিষয়ে আংশিক সফলতার পর আমোদ প্রমোদে অযথা সময় ব্যয় করতেন।

৫. **হুমায়ুনের ভাইদের বিরোধিতা**- হুমায়ুনের তিন ভাই কামরান, হিন্দাল এবং আশকারী বিপদের সময়ে হুমায়ুনকে কোনোরূপ সাহায্য করেন নি। ফলে একা হুমায়ুনের পক্ষে দিল্লির সিংহাসন রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

৬. **আফগানদের নিরঙ্কুশ সমর্থন**- শেরশাহের প্রতি আফগানদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। অন্যদিকে হুমায়ুন তাঁর আপনজনের সমর্থন থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন। ফলে হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত হন এবং ভারতের ভাগ্যাকাশে ধুমকেতুর মতো শেরশাহের আবির্ভাব ঘটে।

হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ

শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন বহু দুঃখ দুর্দশার মধ্যদিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যোধপুরে আশ্রয় লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি অমরকোটে রানা প্রসাদের আশ্রয় প্রার্থী হন। রানা প্রসাদ তাকে আশ্রয় দেন এবং সিন্ধু ও খাট্টা পুনরুদ্ধারে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। অমরকোটে থাকা অবস্থায় হুমায়ুনের স্ত্রী হামিদা বানুর গর্ভে পুত্র আকবরের জন্ম হয়। রানা প্রসাদের সাথে হুমায়ুনের মত বিরোধ দেখা দিলে তিনি হুমায়ুনকে সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। হুমায়ুন আশ্রয়ের আশায় কান্দাহারে ভাই আশকারীর স্মরণাপন্ন হন। কিন্তু আশকারী সম্মত না হওয়ায় তিনি শিশু পুত্র আকবরকে কান্দাহারে রেখে পারস্য অভিমুখে রওনা হন। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে পারস্যে পৌঁছলে সম্রাট শাহ তামসপ হুমায়ুনকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান। পারস্য সম্রাটের সাথে সম্পাদিত এক চুক্তি অনুসারে হুমায়ুনকে বোখারা, কাবুল, কান্দাহার ও তাঁর ভারতে মোগল রাজ্য পুনরুদ্ধারে সেনাবাহিনী ও অর্থ দিয়ে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। বিনিময়ে হুমায়ুন শাহ তামসপকে কান্দাহার ফিরিয়ে দিতে এবং শিয়া ধর্মমত গ্রহণ করতে রাজী হন।

হুমায়ুনের রাজ্য পুনরুদ্ধার

পারস্য সম্রাটের সহায়তায় হুমায়ুন তাঁর ভাইদের পরাজিত করে কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করেন। কান্দাহার থেকে শিশুপুত্র আকবরকে উদ্ধার করা হয়। ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বাসী সেনাপতি বৈরামখানের সহায়তায় হিন্দুস্তান পুনরুদ্ধারে অগ্রসর হন। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দর শূরকে পরাজিত করে পাঞ্জাব দখল করেন। দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করে তিনি মোগল শাসন পুনপ্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি বেশি দিন রাজ্য ভোগ করতে পারেন নি। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি হুমায়ুন দিল্লিতে তাঁর পাঠাগারের সিঁড়ি হতে পড়ে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু বরণ করেন।

হুমায়ুনের চরিত্র ও কৃতিত্ব

হুমায়ুন শান্ত স্বভাব, দয়ালু ও বাৎসল্য প্রবণ ছিলেন। তাঁর মধ্যে মমত্ববোধও ছিল অপরিসীম। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার মতো দুর্লভ গুণও তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি ছিলেন শিক্ষিত, মার্জিত ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। এছাড়াও তাঁর মধ্যে সমরদক্ষতা ও সাহসিকতারও অভাব ছিল না। তবে তাঁর মধ্যে বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক দুরদর্শিতার অভাব ছিল। নব প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য রক্ষা করার এবং আফগানদের বিরোধিতা মোকাবেলা করে সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করার জন্য প্রয়োজনীয় দুরদর্শিতা, কুটকৌশল ও ধৈর্য্য তাঁর ছিল না। ঐতিহাসিক লেনপুল এর মতে, হুমায়ুনের চরিত্র ছিল আকর্ষণীয়, কিন্তু প্রভাবশালী নয়। ব্যক্তি জীবনে হয়ত মনোরম সঙ্গী ও বিশ্বাসী বন্ধু ছিলেন কিন্তু সম্রাট হিসেবে ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সম্রাট হুমায়ুনের দেশ-দেশান্তরের উপর মানচিত্রসহ একটি রচনা তৈরি করবেন।

সারাংশ

সম্রাট বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুমায়ুন আফগানদের সাথে বিশেষ করে শেরখানের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দিল্লির সিংহাসন হারান। পরবর্তীকালে দীর্ঘ পনের বছর পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলেও বিজয়ের সুফল ভোগ করতে পারেন নি। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি তিনি পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হুমায়ন কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসন বসেন?
ক) ১৫২৫ খ) ১৫৩০
গ) ১৫৩৫ ঘ) ১৫৪০

২। হুমায়ুন প্রবাস জীবনযাপন করেন–
ক) ১৫ বছর খ) ১৬ বছর
গ) ১৮ বছর ঘ) ২০ বছর

৩। হুমায়ুনের শাসনামলে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল?
ক) মুর্শিদাবাদ খ) গৌড়
গ) ঢাকা ঘ) লক্ষ্মনাবতী

৪। হুমায়ুনের শাসনামলে গুজরাটের শাসক ছিলেন কে?
ক) মাহমুদ শাহ খ) বাহাদুর শাহ
গ) জামাল খান ঘ) শেরখান

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

কবির উদ্দিন ছিলেন জোতদার। প্রতিপক্ষের হাতে জমি জমা সব হারিয়ে দীর্ঘদিন তিনি এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান। অবশেষে বন্ধুদের সহায়তায় জোতদারী উদ্ধার হলেও হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় বেশি দিন ভোগ করতে পারেন নি।

৫। উদ্দীপকের কবির উদ্দিনের সাথে কোন মোগল শাসকের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৬। উক্ত শাসক আশ্রয় নিয়েছিলেন–
i. অমরকোটে
ii. কান্দাহারে
iii. পারস্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক একটি রাষ্ট্রের সম্রাট ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর অল্প বয়সেই তাকে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অচিরেই তার নিকটাত্মীয় পরিজন, সভাসদ, আমীর ওমরাদের বিরুদ্ধাচারণের ফলে তার রাজ্য হাত ছাড়া হয়ে যায়। অনেক বার চেষ্টা করেও রাজ্য পুনরুদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে তা দখল করে শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. সম্রাট হুমায়ুন কে ছিলেন? ১
খ. বিলগ্রামের যুদ্ধ কেন হয়? ২
গ. হুমায়ুনকে কেন এদেশ থেকে সে দেশ পালিয়ে বেড়াতে হয়? ৩
ঘ. হুমায়ুনের ব্যর্থতা ও শেরশাহের সাফল্যের কারণ কী? ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। খ ৬। খ

দিল্লি ও বাংলায় আফগান শাসন

ইউনিট ২

ভূমিকা

বাংলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে শেরশাহের রাজসিক উত্থান বস্তুত এ অঞ্চলের ইতিহাস নতুনভাবে লিখতে বাধ্য করেছিল। মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে সিংহাসন চ্যুত করে উত্তর ভারত ও বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। তখন আফগানদের মধ্যে দুটি গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। তার একটি শূর আফগান আর অন্যটি কররানি আফগান। শেরশাহ শূর আফগান গোত্রভুক্ত ছিলেন। বিহার ও বাংলায় পরাজিত মোগল সম্রাট হুমায়ুন শেষ পর্যন্ত তার কাছেই আগ্রার সিংহাসন হারিয়েছিলেন। হুমায়ুনের দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার পর্যন্ত শেরশাহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ ভারতবর্ষে তাঁদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এদিকে শেরশাহের ছেলে ইসলাম শাহের রাজত্ব পর্যন্ত বাংলা দিল্লির শাসনাধীনে ছিল। বাংলার অন্যান্য শাসনকর্তা ও কররাণী আফগানগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। দাউদ খান কররাণীকে পরাজিত করে সম্রাট আকবর বাংলার অধিকার নিয়েছিলেন। এ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে শেরশাহের উত্থান, তাঁর রাজ্য বিজয় ও কৃতিত্ব, বাংলায় শূর আফগান এবং কররাণী আফগান শাসনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-২.১ শেরশাহের উত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফরিদ তথা শেরখানের বাল্যজীবন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শেরশাহের দিল্লির সিংহাসন লাভের পটভূমির বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ফরিদ, সাসারাম, চৌসার যুদ্ধ

শেরশাহের বাল্যজীবন

পানিপথের যুদ্ধে সম্রাট বাবর আফগান শক্তিকে পরাজিত করলেও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে যাঁর নেতৃত্বে আফগানরা নতুনভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তিনি হচ্ছেন শেরশাহ। বাল্যকালে তার নাম ফরিদ। তাঁর পিতা হাসান খান শূর বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গীরদার ছিলেন। শেরশাহের জন্ম ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে। সম্রাট বাবর ও তার ছেলে হুমায়ুনের মত শেরশাহও ভাগ্য বিড়ম্বিত ছিলেন। তিনি বিমাতার ষড়যন্ত্রে একাধিকবার সাসারামের জায়গীর হারিয়েছিলেন। তবে নিজ সক্ষমতা, প্রতিভা ও নিষ্ঠায় তিনি একদিন জায়গীরদার থেকে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি বিহারের শাসনকর্তা বাহারাম খানের অধীনে কর্মরত থাকাকালীন নিজগুণে তাঁর আস্থা অর্জনে সক্ষম হন। এ সময় একটি বাঘ হত্যা করে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিলে ফরিদ 'শের খান' উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন তিনি ।

শেরশাহ

ক্ষমতা অর্জনের পটভূমি

অন্য ভাইদের চেয়ে যোদ্ধা কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে এগিয়ে ছিলেন ফরিদ তথা শেরখান। তার বাবা হাসান খান শূরের জীবদ্দশাতে তিনি সাসারামের জায়গীর লাভ করেন। তাঁর একুশ বছরের শাসনামলে সাসারামের অনেক উন্নতি হতে দেখা যায়। এতে তাঁর ঈর্ষান্বিত বিমাতা ষড়যন্ত্রে এক পর্যায়ে এসে সাসারাম ত্যাগে বাধ্য হন ফরিদ। কিন্তু কিছুদিন ব্যবধানে তার বাবা হাসান খানের মৃত্যু হলে পুনরায় জায়গীর লাভ করেন ফরিদ। এবার বৈমাত্রেয় ভাই সুলায়মান নতুন করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ফরিদ আবার সাসারাম ত্যাগ করে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খানের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে শেরখান বিহার ত্যাগ করে আগ্রায় চলে যান। সেখানে মোগল সম্রাট বাবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে বাবরের বিহার যাত্রাকালে শেরখান তাঁকে সহযোগিতা দেন এবং বাবরের সাহায্যে সাসারামের জায়গীর পুনরুদ্ধার করেন। ইতোমধ্যে বিহারের শাসনকর্তা বাহার খান মৃত্যুবরণ করেন এবং শেরখান তাঁর শিশু পুত্র জামাল খানের অভিভাবক নিযুক্ত হন এবং উপ শাসনকর্তা হিসেবে বিহার শাসন করেন। ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে শেরখান চুনার অধিপতি তাজখানের বিধবা স্ত্রী মালেকা জাহানকে বিয়ে করে চুনার দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ করেন।

জামাল খান তাঁর অভিভাবক শেরখানের ক্ষমতা বিস্তৃতিতে সন্দিহান হয়ে পড়েন। তাই তিনি শেরখানের কর্তৃত্ব বিলোপের জন্য বাংলার শাসনকর্তা সুলতান মাহমুদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুরজগড়ের যুদ্ধে শেরখান উভয়ের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে বিহারের আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর তিনি বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। কিন্তু বাংলার শাসনকর্তা মাহমুদ শাহ শেরখানের সাথে অর্থের বিনিময়ে মিত্রতা স্থাপন করেন। অবশ্য পরের বছর অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে শেরখান বাংলা আক্রমণ করে গৌড় অবরোধ ও অধিকার করেন।

ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে শেরখানের ক্রমাগত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে দিল্লির মোগল সম্রাট হুমায়ুন অত্যধিক শংকিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি গুজরাটে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান প্রত্যাহার করেন। পরে শেরখানকে দমন করার উদ্দেশ্যে বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন তিনি। বাংলার পরিবর্তে চুনার দুর্গ আক্রমণ করে দখল করেছিলেন হুমায়ুন। এরপর ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুন বাংলার রাজধানী গৌড়ও নিজের দখলে নিয়েছিলেন।

শেরখান ছিলেন দূরদর্শী যোদ্ধা। তাই তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অকারণে কোনো সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন নি। বরং হুমায়ুন যখন গৌড় দখল করে সেখানে অবস্থান করছিলেন তখন শেরখান পিছু হটেছিলেন। তবে এ সময় তিনি বিহার ও জৌনপুরের মোগল অধিকৃত অঞ্চল দখল করে কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি দিল্লির সাথে বাংলার যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এতে হুমায়ুন আতংকিত হয়ে পড়েন এবং আগ্রার দিকে যাত্রা করেন। কুশলী যোদ্ধা শেরখান বক্সারের কাছে চৌসা নামক স্থানে সম্রাট হুমায়ুনের গতিরোধ করেন। ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দের এ যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হন এবং তিনি অতি কষ্টে আগ্রা ফিরে যান।

শেরখান বাংলা, বিহার, জৌনপুরের একচ্ছত্র অধিপতি হন এবং 'শেরশাহ' উপাধি ধারণ করেন। হুমায়ুন চৌসার যুদ্ধের গ্লানি ও ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে পুনরায় কনৌজের পথে অগ্রসর হন। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কনৌজের অদূরে বিলগ্রামে উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেরশাহ কনৌজ, দিল্লি ও আগ্রা অধিকার করেন। এভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে দিল্লির সিংহাসনে শেরশাহের অভ্যুত্থান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শেরশাহের উত্থানের উপর একটি নিবন্ধ লেখার চেষ্টা করবেন।

সারাংশ

সামান্য একজন জায়গীরদার থেকে শেরশাহ দিল্লির সম্রাট হন। তিনি নিজ প্রতিভা ও সমর কৌশল ব্যবহার করে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটান। তিনি প্রথমে বিহার, পরবর্তী কালে বাংলা এবং সবশেষে উত্তর ভারতে নিজ আধিপত্য বিস্তার করে এ দেশে শূর আফগান বংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহের পিতার নাম কী?

ক) জামাল খান খ) জালাল খান

গ) হাসান খান সুর ঘ) সোলায়মান খান সুর

২। শেরশাহ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ১৪৭০ খ) ১৪৭২ গ) ১৪৭৫ ঘ) ১৪৮০

৩। ফরিদ কার বাল্য নাম?

ক) শেরশাহ খ) হাসান খান সুর

গ) সোলায়মান খান সুর ঘ) বাহার খান

৪। যে মোগল সম্রাটকে শের শাহ যুদ্ধে পরাজিত করেন, তার নাম–

ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৫। কত খ্রিস্টাব্দে বিল গ্রামের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

ক) ১৫৩৭ খ) ১৫৩৮ গ) ১৫৩৯ ঘ) ১৫৪০

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুরাদের পিতা ছিলেন জমিদার। পিতার জীবতকালেই তিনি জমিদারীর দায়িত্ব পান; কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর বিমাতা ও আপনজনদের ষড়যন্ত্রে একাধিকবার পিতৃ জমিদারী থেকে বিতাড়িত হন। পরবর্তীকালে নিজ প্রতিভা দুরদর্শিতা ও সাহসিকতার গুণে ক্ষমতাশীনদের পরাজিত করে সামান্য একজন জমিদার থেকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ক. শেরখান কার উপাধী? ১

খ. চৌসার যুদ্ধে হুমায়নের পরাজয়ের কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের মুরাদের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন সুর আফগান শাসকের সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত শাসকের দিল্লির সম্রাট হওয়ার পটভূমি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-২.২ শেরশাহের রাজ্য বিস্তার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শেরশাহের পাঞ্জাব, সিন্ধু, মুলতান জয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শেরশাহের বাংলা বিজয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।
- শেরশাহ কর্তৃক রাজপুতনার বিভিন্ন রাজ্য জয়ের বর্ণনা করতে পারবেন।
- কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বিলগ্রাম, আগ্রা, কালিঞ্জর, রাজপুতনা, গোয়ালিয়র

চৌসা ও বিলগ্রামের যুদ্ধে শেরশাহ মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। ফলে তিনি দিল্লি, আগ্রার একচ্ছত্র অধিপতি হন। ভারতবর্ষ থেকে মোগলদের বিতাড়িত করে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। হুমায়ুনের ভাই কামরান ইতোমধ্যে পাঞ্জাব ছেড়ে দিয়ে শেরশাহের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। পাঞ্জাব বিজয়ের পর শেরশাহ ঝিলাম ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী গাক্কার অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি সিন্ধু, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলও জয় করেন।

১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ বাংলা আক্রমণ করে বাংলার সুলতান খিজির খানকে পরাজিত ও বিতাড়িত করেন। বাংলায় যাতে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে না পারে সে জন্য তিনি বাংলাকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করে প্রত্যেকটির শাসনভার একজন আমিনের উপর ন্যস্ত করেন। পশ্চিম ভারতে রাজপুত শক্তি খানুয়ার পরাজয়ের পর নতুন করে শক্তি লাভ করতে থাকে। শেরশাহ রাজপুতদেরকে দমন করার কাজে হাত দেন। তিনি ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে মালব জয় করে গোয়ালিওর দুর্গ অবরোধ করেন। দীর্ঘ দুই বছর অবরোধের পর দুর্গটি তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। মালব শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও মালবের রাইসিন দুর্গাধিপতি পুরনমল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন নি। ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ পুরনমলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। পুরনমল দেশের স্বাধীনতা ও সর্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য বিশাল রাজপুত বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন কিন্তু যুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেরশাহ উজ্জয়িনী ও রণথম্ভোরও জয় করেন।

রাজপুতদের মধ্যে যোধপুরের মাড়ওয়াড়ের অধিপতি মালদেব খুব শক্তিশালী ছিলেন। ১৫৪৪ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ মালদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এই যুদ্ধে তিনি রাজপুতদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। অবশেষে এ যুদ্ধেও শেরশাহ জয়ী হন। মালদেবের পরাজয়ের ফলে সমগ্র রাজস্থান শেরশাহের বশ্যতা স্বীকার করে। রাজপুতনা জয়ের পর শেরশাহ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করেন। এই দুর্গের অধিপতি কিরাত সিং তাঁকে এক বছর পর্যন্ত বাধা দেন। এ দুর্গ অবরোধ চলাকালীন বারুদের বিস্ফোরণে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে ২২ মে শেরশাহ মৃত্যুবরণ করেন। বিহারের সাসারামে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

বুন্দেলখণ্ডের কালিগঞ্জ দুর্গ দখল করতে এসে শেরশাহ মারা যান

শিক্ষার্থীর কাজ	শের রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

সম্রাট হুমায়ুনের কাছ থেকে দিল্লি ও আগ্রা অধিকারের পর শেরশাহ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও মুলতান জয় করেন। তিনি বাংলাকেও তাঁর অধিকারে আনেন। এরপর শেরশাহ রাজপুতনা অধিকার করেন। বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধের সময় তিনি বারুদের বিস্ফোরণে মৃত্যু বরণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহ কত খ্রিস্টাব্দে বাংলা আক্রমন করেন?
ক) ১৫৪০ খ) ১৫৪১ গ) ১৫৪২ ঘ) ১৫৪৩

২। শেরশাহ বাংলাকে কয়টি সরকারে বিভক্ত করেছিলেন?
ক) ১৯ খ) ২০ গ) ২১ ঘ) ২২

৩। কার পরাজয়ের ফলে সমগ্র রাজস্থান শেরশাহের বশ্যতা স্বীকার করে?
ক) পুরনমল খ) মাল দেব
গ) কিরাত সিং ঘ) সংগ্রাম সিংহ

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জসিম কোম্পানিতে একজন সামান্য ক্লার্ক হিসেবে চাকরি নিয়ে স্বীয় প্রতিভা ও দূরদর্শিতার গুণে কোম্পানীর ম্যানেজারকে হার মানিয়ে কোম্পানিতে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন।

৪। উদ্দীপকের জসিমের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন সুর আফগান শাসকের সাদৃশ্য আছে?

ক) হাসান খান সুর খ) শেরশাহ সুর

গ) সোলায়মান খান সুর ঘ) জামাল খান

৫। উক্ত শাসক যে যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন–

i. বিল গ্রামের যুদ্ধ

ii. সুরুজ গড়ের যুদ্ধ

iii. চৌসার যুদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৩ শেরশাহের কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিজেতা শেরশাহের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রাজনীতিক ও শাসক হিসেবে শেরশাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংস্কারক হিসেবে তাঁর কার্যক্রমের বিররণ দিতে পারবেন।
- ব্যবসা বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে শেরশাহ গৃহীত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিচার ব্যবস্থায় শেরশাহের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	পাট্টা, কবুলিয়ত, রাজস্বনীতি

শেরশাহ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বছর (১৫৪০-১৫৪৫ খ্রি.) বাজত্ব করেন। অথচ এই স্বল্প সময়ের তিনি বিজেতা, শাসক, সংস্কারক হিসেবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বিজেতা হিসেবে কৃতিত্ব: শেরশাহ একজন দক্ষ সমরনায়ক ছিলেন। তিনি সামান্য একজন জায়গীদার থেকে নিজ প্রতিভা বলে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ বীরত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা, মালব, রাজপুতনা বিজয় তাঁর সামরিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে। তিনি সম্রাট হুমায়ুনকে রণকৌশলে পরাস্ত করেছিলেন।

সরকার ও পরগণায় বিভক্তি: শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাচারী ছিল না। তিনি জনগণের সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নিয়েছিলেন। শাসনকাজের সুবিধার্থে তিনি পুরো সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকারে বিভক্ত করেন। প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত হতো। প্রতিটি সরকার ও পরগণায় বিভিন্ন ধরণের কর্মচারি নিয়োজিত ছিল। তবে শেরশাহ স্বয়ং শাসন ব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগ তত্ত্বধায়ন করতেন।

রাজস্ব সংস্কার: রাজস্ব সংস্কার শেরশাহের অন্যতম সফলতা। তার আগে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য কোনো ভূমি জরিপের ব্যবস্থা ছিল না। প্রথমবারের মতো শেরশাহই ভূমি জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি জমির উর্বরা শক্তির তারতম্য অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে শস্য কিংবা নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় করা যেত। শেরশাহ প্রথম 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ত' প্রথা চালু করেন। সরকারের পক্ষ থেকে জমির উপর কৃষকের সত্ত্ব স্বীকার করে পাট্টা দেয়া হতো। কৃষকরা তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও দাবি বর্ণনা করে কবুলিয়ত নামক দলিল সম্পাদন করে দিত। শেরশাহের রাজস্ব নীতি শুধু পরবর্তীকালে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছিল।

মুদ্রা নীতি: ভারতবর্ষের মুদ্রানীতিতে প্রথম উপযুক্ত সংস্কার সাধিত হয় শেরশাহের শাসনকালে। তিনি বিশেষ ধরনের রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি স্বর্ণ মুদ্রারও প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি 'দাম' নামে নতুন তাম্র মুদ্রার বহুল প্রচলন করেন। সিকি, আধুলি, দুয়ানি প্রভৃতি শেরশাহের প্রবর্তিত মুদ্রার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। শেরশাহের মুদ্রাগুলো উপাদানে নির্ভেজাল, ওজনে নির্ভেজাল ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অনন্য ছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি: শেরশাহের শাসনকালে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ব্যবস্থার উপযুক্ত উন্নতি সাধিত হয়। এজন্য তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এসব চওড়া রাস্তার মধ্যে 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' অন্যতম। বিখ্যাত এই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বাংলাদেশের সোনারগাঁও থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার দিকে যাতায়াত ও পরিবহনে এই পথের গুরুত্ব ছিল অনেক। তিনি এপথে গমনকারী পথচারীদের সুবিধার জন্য রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও সরাইখানা স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ডাক ব্যবস্থা: শেরশাহ প্রথম বারের মতো ভারতবর্ষে ডাক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। এ বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন। এর ফলে সহজেই এক স্থান হতে অন্যস্থানে সংবাদ আদান প্রদানের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে সবাই। বিশেষ করে সামরিক নানা সংবাদের পাশাপাশি বেসামরিক তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও শেরশাহ প্রবর্তিত এই ডাক ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।

নতুন সামরিক নিয়ম: শেরশাহ সামরিক বাহিনীকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য তিনি সেনাবহিনীর সদস্যদের নিয়মিত হাজিরার ব্যবস্থা করেন। জায়গীরের পরিবর্তে নগদ টাকায় সৈন্যদের বেতন দেয়ার বন্দোবস্ত করেছিলেন তিনি। এক্ষেত্রে নিয়মিত বেতন পাওয়ায় সৈন্যরা তার প্রতি অনুগত ছিল। পাশাপাশি ঘোড়া চিহ্নিত করার প্রথা ও সৈন্যদের বিবরণমূলক তালিকা রাখারও ব্যবস্থা ছিল তখন। একজন সম্রাট হয়েও শেরশাহ স্বয়ং সেনাবাহিনী তদারকি করতেন। ফলে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা তাকে শক্তিশালী প্রশাসন নিশ্চিতকরণে সহায়তা করেছিল। তাঁর অধীনে ১ লক্ষ অশ্বারোহী, ৫০ হাজার পদাতিক বাহিনী ও পাঁচ হাজার রণহস্তী ছিল।

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা: একজন ন্যায়বান সম্রাট হিসেবে শেরশাহের আমলে ধনী, দরিদ্র, উঁচু-নিচুর মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। প্রায় প্রত্যেক পরগণাতে কাজী ও মীর আদিল ফৌজদারী মোকদ্দমা এবং মুনসীফ-ই-মুনসিফান দেওয়ানি মামলা পরিচালনা করতেন। কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ফৌজদারী বিচার তদারক করতেন। সম্রাট নিজেও বড় বড় মোকদ্দমার বিচার করতেন। তাঁর ন্যায় বিচারের খ্যাতি তখনকার সময়ে ছিল সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষ করে ধর্মীয় নানা আইন কানুনে বেশ পারদর্শী ছিলেন তিনি।

শিল্প-সাহিত্য : একজন কৃতি শাসকের পাশাপাশি শেরশাহ শিল্প সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিল্প, সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি কোনোভাবেই ধর্মান্ধ ছিলেন না। বরং সকল ধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। শেরশাহের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে অনেকে তাঁকে যেকোনো মোগল সম্রাটের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

সাসারামে অবস্থিত শেরশাহের সমাধি

শিক্ষার্থীর কাজ	শেরশাহের চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লেখার চেষ্টা করবে।

সারাংশ

বহু প্রতিভার অধিকারী শেরশাহ সামান্য একজন জায়গীরদার থেকে দিল্লির সম্রাট হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের উন্নতিকল্পে এবং প্রজা সাধারণের সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ভূমি রাজস্ব ক্ষেত্রে কবুলিয়ত ও পাট্টা প্রবর্তন এক যুগান্তকারী ঘটনা। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের মধ্যে অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শেরশাহ মোট কত বছর রাজত্ব করেন?
ক) ৪ খ) ৫ গ) ৬ ঘ) ৭

২। শাসন কাজের সুবিধার জন্যে শেরশাহ সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতটি সরকারে বিভক্ত করেন?
ক) ৪৫ খ) ৪৬ গ) ৪৭ ঘ) ৪৮

৩। পাট্টা ও কবুলিয়াত প্রথা চালু করেন কে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) শেরশাহ ঘ) আকবর

৪। শেরশাহের শাসনামলে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতেন–
ক) কাজী খ) কাজী ও মীর আদিল
গ) মুনসীফ-ই-মুনসিফান ঘ) শিকদার-ই-শিকদারান

৫। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শেরশাহ–
i. গ্রান্ড ট্র্যাংক রোড নির্মাণ করেন
ii. রাস্তার উভয় পাশে ছায়াদার বৃক্ষ রোপন ও সরাইখানা নির্মাণ করেন
iii. ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৪ বাংলায় শূর-আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শেরশাহের বাংলা অধিকার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলার শাসনকর্তাগণের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- শূর আফগান শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	খিজির খাঁ, সুরজগড়, সোনার গাঁও, 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড'

শেরশাহের শাসন

সম্রাট হুমায়ুন প্রথমে চেয়েছিলেন শেরশাহকে শায়েস্তা করতে। তিনি এজন্য প্রথম দিকে অভিযান চালিয়ে গৌড় দখল করেছিলেন। তবে চৌসার যুদ্ধে সম্রাট হুমায়ুনের পরাজয় সব হিসেব পাল্টে দেয়। বলতে গেলে এই যুদ্ধজয় শেরশাহের সিংহাসনে বসার পথ করে দিয়েছিল। যুদ্ধজয়ের পরপর শেরশাহ সবার আগে গৌড় পুনরুদ্ধার করেন। গৌড় থেকেই তিনি হুমায়ুনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছিলেন। এরপর বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের পর শেরশাহ গৌড় থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। বলতে গেলে তখন থেকে বাংলা দিল্লির অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয়। খিজির খাঁ নামক একজন কর্মকর্তাকে বাংলা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এদিকে ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে খিজির খাঁ বাংলার ভূতপূর্ব সুলতান গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহের কন্যাকে বিয়ে করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে শেরশাহ বাংলা অভিযান করে খিজির খাঁকে বন্দি করেন। তিনি খিজির খাঁ'র স্থলে কাজী ফজীলতকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পাশাপাশি প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিদ্রোহ বন্ধের জন্য শেরশাহ বাংলাকে কয়েকটি পরগণা ও

সরকারে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি ভারতের নানা স্থানের মতো বাংলাতেও যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করতে রাস্তা নির্মাণ করেন।

শেরশাহ পরবর্তীকাল

কুশলী সমরনায়ক ও সুশাসন শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৩ খ্রি.) দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তাঁর শাসনামলে সুলেমান খান নামে একজন ধর্মান্তরিত রাজপুত বাংলা অধিকারের চেষ্টা করলে তাঁকে দমন করা হয়। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ শাহ স্বল্পকাল রাজত্ব করেন। তারপর ইসলাম শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহাম্মদ আদিল শাহ দিল্লির সিংহাসনে বসেন। মুহম্মদ আদিল শাহের শাসনামলে বাংলার শাসনকর্তা মুহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে তাঁর সেনাপতি হিমু মুহম্মদ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। এরপর আদিল শাহ বাংলার শাসনকর্তা রূপে শাহবাজ খাঁকে নিয়োগ করেন। কিন্তু শাহবাজ খাঁ নিহত মুহম্মদ খাঁ'র পুত্র খিজির খাঁ কর্তৃক নিহত হন এবং খিজির খাঁ নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন এবং গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করেন।

এই সময় দিল্লির রাজনৈতিক পট পরিবর্তন চলছিল। সম্রাট হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর পুত্র আকবরের নিকট দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে আদিল শাহের সেনাপতি হিমু পরাজিত ও নিহত হন। আর আদিল শাহ সুরজগড়ের যুদ্ধে গিয়াসউদ্দীনের নিকট পরাজিত ও নিহত হলে শূর বংশের পতন ঘটে। বিজয়ী গিয়াসউদ্দীন মোগল সেনাপতি খানজাহানের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করে মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই জালালউদ্দিন দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি মোগলদের সাথে সদ্ভাব রক্ষা করে বাংলাকে নিরাপদে রাখেন। দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রকে সরিয়ে এক আফগান দলপতি তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে কররানি আফগান বংশীয় সর্দার তাজ খান তৃতীয় গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে বাংলায় কররানি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলায় শূর আফগান শাসনের একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

শেরশাহ শূর ও তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ শূরের আমলে বাংলা দিল্লির শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীকালে বাংলার শাসনকর্তাগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। এই শাসনকর্তাগণের পর বাংলায় কররানি আফগান বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন যুদ্ধে জয়ের পর শেরশাহ রাজধানী গৌড় থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করেন?
ক) বিলগ্রাম খ) সুরুজগড়
গ) চৌসা ঘ) খানুয়া

২। শেরশাহ কর্তৃক নিযুক্ত বাংলার প্রথম শাসনকর্তা কে?
ক) সুলেমান খা খ) খিজির খা
গ) কাজী ফজিলত ঘ) মুহাম্মদ খা

৩। ইসলাম শাহ কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৫৪২ খ) ১৫৪৩
গ) ১৫৪৪ ঘ) ১৫৪৫

৪। সুর আফগান বংশের তৃতীয় সুলতান কে?
ক) ইসলাম শাহ খ) আদিল শাহ
গ) সিকান্দর শাহ ঘ) ফিরোজ শাহ

৫। শেরশাহের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসনে বসেন–

i. ইসলাম শাহ
ii. ফিরোজ শাহ
iii. মোহাম্মদ আদিল শাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৫ বাংলায় কররানি আফগান শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কররানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।
- সুলেমান কররানির রাজত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দাউদ কররানি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সুলেমান কররানি, দাউদ কররানি

কররানি উপাধিধারী আফগানরা হচ্ছে একটি আফগান গোত্র। এ বংশের সর্দার তাজ খান কররানি বাংলায় কররানি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন (১৫৬৪ খ্রি.)। তিনি এক সময় শেরশাহের অধীনে চাকরি করতেন। আদিল শাহের আমলে তাজ খান বাংলার তাণ্ডায় জায়গীরদার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলার অধিপতি হওয়ার এক বছরের মধ্যে মারা যান (১৫৬৫ খ্রি.)।

সুলেমান কররানি (১৫৬৫ - ১৫৭২ খ্রি.)

তাজ খানের তাঁর ভাই সুলেমান কররানি প্রায় সাত বছর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলাকে উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর আমলে বাংলায় অপেক্ষাকৃত সুশাসন ও শান্তি বিরাজ করেছে। পাশাপাশি তিনি তাঁর রাজ্যসীমাও বেশ বিস্তৃত করতে পেরেছিলেন। প্রধান উজির লোদী খানের পরামর্শে সুলেমান কররানি কূটনৈতিক বিষয়গুলোতে সফলতার মুখ দেখেন। নেহায়েত প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্ত তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে তেমন বিপজ্জনক কোনো অভিযানে লিপ্ত হন নি। এ সময় গৌড় নগরী বাসযোগ্যতা হারালে সুলেমান কররানি তান্ডাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

সুলেমান কররানির সময় উড়িষ্যা শাসন করতেন রাজা হরিচন্দন মুকুন্দদেব। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে তাঁর অধিকারে নিয়ে আসেন। সুলেমানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় পুরি অধিকার করেন। সেনাপতি কালাপাহাড় কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে তেজপুর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সব মিলিয়ে সুলেমান কররানি বাংলার শাসক হিসেবে এখানে শান্তি নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হওয়া তাঁর সময় রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ন্যায় বিচারক হিসেবেও তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। অনেক বিজ্ঞ আলেম ও দরবেশ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজ্যে শরিয়তের বিধান কার্যকর করার পাশাপাশি তিনি নিজেও তা নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। সবমিলিয়ে সুলেমান ছিলেন দূরদর্শী শাসক। রাজ্যের নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি মোগলদের সাথে মিত্রতা নিশ্চিত করেন। বিপুল সামরিক শক্তির অধিকারী সুলেমান কররানি একঅর্থে সফল শাসকই ছিলেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে সুলেমান কররানির মৃত্যু হয়। এরপর তাঁর বড় ছেলে

বায়জিদ কররানি কিছুকাল রাজত্ব করেন। তিনি আফগান অভিজাতদের দ্বারা নিহত হলে তাঁর ভাই দাউদ খান কররানি বাংলার সিংহাসনে বসেন।

দাউদ কররানি

বায়াজিদ কররানির পর ক্ষমতায় আসেন দাউদ। তবে তার মতো দাউদও ছিলেন সুলতান পদের অযোগ্য। তাঁর নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে নানা দিক থেকে। বিশেষ করে তিনি তাঁর মন্ত্রী লোদী খানের জামাতাকে নিহত করে লোদী খানের আস্থা নষ্ট করেছিলেন। পাশাপাশি ক্ষমতার লোভে উন্মত্ত হয়ে তার ভাই বায়াজিদের ন্যায় তিনিও নিজ নামে খুৎবা পাঠ শুরু করান। অন্যদিকে মুদ্রা জারি করে বসলে সম্রাট আকবরের সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। আফগান সেনাপতি গুজর খান দাউদের ভাই বায়াজিদের পুত্রকে বিহারে স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করলে তাঁকে দমনের জন্য দাউদ খান তার মন্ত্রী লোদী খানকে বিহারে পাঠান। সম্রাট আকবরও তাঁর বিখ্যাত সভাসদ মুনিম খানকে বিহার অধিকারের জন্য পাঠান। কিন্তু লোদী খান ও গুজর খান মুনিমের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

এদিকে দাউদ খান লোদী খানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান এবং লোদী খানকে হত্যা করে পাটনার দুর্গ অধিকার করেন। মুনিম খান এ পরিস্থিতিতে পাটনা অধিকারে ব্যর্থ হন। তবে আকবর নিজে পাটনা অবরোধে মুনিম খানের সাথে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত পাটনা অধিকার করে মোগল বাহিনী। ফলে দাউদ কররানি বাংলায় পালিয়ে যান। মোগল বাহিনী দাউদের পিছু নিলে তিনি উড়িষ্যায় চলে যান। এর পরপর বাংলা অধিকার করে মোগলরা। তখন সম্রাট আকবরের নির্দেশে রাজা টোডরমল মুনিম খানের সঙ্গে যোগ দিলে মোগল বাহিনীর শক্তি বেড়ে যায়। তারা উড়িষ্যায় দাউদকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যায়। বালেশ্বরের তুকরাইয়ের যুদ্ধে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে দাউদ খান চরমভাবে পর্যুদস্ত হন। প্রথম দিকে তিনি মোগলদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও সেনাদল দিল্লি ফিরে গেলে নতুন ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

আকবর বাংলার বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে খান-ই-জাহানকে সুবেদার নিযুক্ত করেন। তাঁকে বাংলার হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠানো হয়। খান-ই-জাহান ও টোডরমল তেলিয়াগর্হি অধিকার করেন। তারপর মোগল বাহিনী রাজমহলের দিকে এগিয়ে যান। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলে মোগল বাহিনীর সাথে তুমুল যুদ্ধে হয় দাউদ কররানির। এ যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও বন্দি হন। পূর্ববর্তীকালে সন্ধি ভঙ্গের অপরাধে দাউদ খান কে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে কররানি শাসনের অবসান ঘটার পাশাপাশি বাংলার একাংশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে তখনো পূর্ব বাংলায় ঈসা খাঁর নেতৃত্বে বার ভূইয়াদের শাসন চলছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুলেমান ও দাউদ কররানির শাসককালের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

শেরখানের মৃত্যুর পর তাজখান কররানি বাংলায় কররানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর সুলেমান কররানি বাংলার শাসনকর্তা হন। তার আমলে বাংলা উত্তর-পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিকে পরিণত হয়। বাংলায় তখন শান্তি বিরাজমান ছিল। সুলেমান কররানি উড়িষ্যা ও কুচবিহারে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী শাসকগণ বাংলার সিংহাসনের জন্য যোগ্য ছিলেন না। কররানি বংশের শেষ শাসনকর্তা দাউদ খান কররানি মোগলদের হাতে বন্দি ও নিহত হলে বাংলায় কররানি বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় কররানি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) সুলেমান কররানি
খ) তাজ খান কররানি
গ) দাউদ কররানি
ঘ) বায়াজিদ কররানি

২। কত খ্রিস্টাব্দে বাংলায় কররানি বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৫৬২ খ) ১৫৬৩
গ) ১৫৬৪ ঘ) ১৫৬৫

৩। সুলেমান কররানির প্রধান উজির ছিলেন–
ক) লোদী খান খ) বায়াজিদ কররানি
গ) দাউদ কররানি ঘ) হরিচন্দন

৪। দাউদ কররানির আমলে দিল্লির সম্রাট ছিলেন কে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৫। রাজ মহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৫৭৫ খ) ১৫৭৬
গ) ১৫৭৭ ঘ) ১৫৭৮

৬। দাউদ খান ক্ষমতার লোভে উম্মত্ত হয়ে–
i. নিজ নামে খুৎবা পড়ান
ii. নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন
iii. সম্রাট আকবরের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ

মোগল শাসন (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রি.)

ইউনিট ৩

ভূমিকা

সম্রাট আকবরের সময়কাল থেকে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থিতিশীল অবস্থায় পৌছায়। সম্রাট আকবরের সময় থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্যন্ত (১৫৫৬-১৭০৭ খ্রি.) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তার লাভ করে। এ সময়ের মোগল শাসকদের জনহিতকর বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে। তা সত্ত্বেও এক সময় সম্রাট বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে সম্রাট আকবরের রাজ্য বিস্তার, তাঁর প্রশাসনিক নীতি, ভূমি শাসন ব্যবস্থা, পরবর্তী সম্রাটগণের কৃতিত্ব, মোগল আমলে ভারতের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৩.১ আকবরের ক্ষমতা গ্রহণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আকবরের রাজ্য সীমা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আকবর কর্তৃক ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল আক্রমণের কারণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- আকবরের বিভিন্ন বিজয় অভিযানের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আকবরের সমরাভিযানের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আকবর, পানিপথ, রাজপুতনা, কাবুল, কান্দাহার

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি পিতা সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মাত্র ১৩ বছর বয়সে জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ আকবর নাম ধারণ করে দিল্লির মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের মধ্যে সাম্রাজ্যের সংগঠক ও বিজেতা হিসেবে সম্রাট আকবর অনন্য স্থান দখল করে আছেন। ইতিপূর্বে সুলতানি আমলে একমাত্র আলাউদ্দীন খলজী সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্রাট আকবর ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য বিস্তৃতি নীতি অব্যাহত রাখেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সম্রাট আকবর

সম্রাট আকবর যখন ক্ষমতা গ্রহন করেন তখন মোগল সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, দিল্লি ও আগ্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে আকবর আফগান শাসক আদিল শাহ সুরের সেনাপতি হিমুকে পরাস্ত করেন। মোগল শাসনের ইতিহাসে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ ছিল চূড়ান্ত মীমাংসাত্মক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জয়ের ফলে ভারতে মোগল শক্তি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতে আফগানদের

আধিপত্যের অবসান হয়। এর ফলে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়।

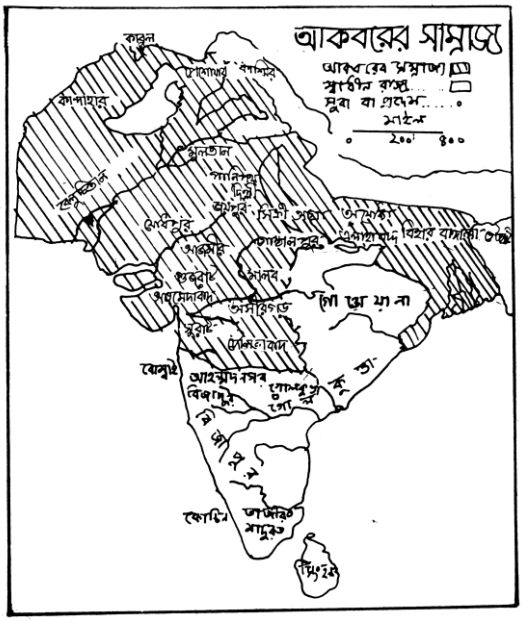

আকবরের সাম্রাজ্য

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর সম্রাট আকবর ভারতের পূর্বাঞ্চলে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি বৈরাম খানের সাহায্যে গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর অধিকার করেন। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আদম খান ও পীর মুহম্মদ মালবরাজ রাজবাহাদুরকে পরাজিত করে মালব জয় করেন।

গন্ডোয়ানা অধিকার- ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর কারা প্রদেশের শাসনকর্তা আসফ খানকে গন্ডোয়ানা জয় করার জন্য প্রেরণ করেন। কারার বীরাঙ্গনা রাণিমাতা দুর্গাবতী দেশ রক্ষার্থে যুদ্ধেক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। গন্ডোয়ানা থেকে হলে বহু ধনরত্ন মোগলদের হস্তগত হয়।

রাজপুতনা অভিযান- সম্রাট আকবর ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে খাজা মঈনউদ্দিন চিশতীর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে আজমীর যাত্রার সময় কৌশলী নীতি অবলম্বন করে অম্বর বা জয়পুরের রাজা বিহারীমলের বশ্যতা লাভ করেন। তিনি বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করেন করেন এবং বিহারীমলের পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মানসিংহকে মনসবদার রূপে নিয়োগ করেন। আকবর ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ সম্রাট। তিনি রাজপুতদের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে আফগানদের ধ্বংসের কৌশল গ্রহণ করেন। তাঁর এই মৈত্রী নীতি ফলপ্রসূ হয়েছিল। ইতোমধ্যে যোধপুরও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু মেবারের রানা উদয়সিংহ কিছুতেই মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। এছাড়া উদয়সিংহ পলাতক মালবরাজ রাজবাহাদুরকে আশ্রয় দান করে আকবরের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করেন। উদয়সিংহ নিকটবর্তী পর্বতে গিয়ে আত্মগোপন করেন। উদয়সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রতাপসিংহ ও পৌত্র অমরসিংহ মোগলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। প্রতাপসিংহ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটের যুদ্ধে এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে অমরসিংহ মানসিংহের নিকট পরাজয় বরণ করেন। আকবর তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র মেবার মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি। পরবর্তীতে আকবর রনথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানী প্রভৃতি রাজ্য জয় করেন। রাজপুতনা এলাকায় নিজের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে আকবর গুজরাট ও সুরাট অধিকার করেন।

আকবরের রাজদরবার

বাংলা অধিকার- ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শেষ আফগান শাসক দাউদ খান কররানি মোগল সেনাবাহিনীর হাতে রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তবে ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার কয়েকজন প্রভাবশালী জমিদার মোগল বাদশার আনুগত্য অস্বীকার করে সতের শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

কাবুল ও কান্দাহার জয়- আকবরের বৈমাত্রেয় ভাই কাবুলের শাসনকর্তা মির্জা মুহম্মদ হাকিম উত্তর ভারত থেকে পালিয়ে যাওয়া কিছু বিদ্রোহীদের প্ররোচনায় ভারত আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। সম্রাট আকবর এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে কাবুল আক্রমণ করেন। তিনি বিদ্রোহী ভাইকে পরাজিত করে কাবুল অধিকার করেন। তিনি ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কান্দাহার দখল করে রাজ্যের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে

নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তিনি কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান জয় করে সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বলখ ও বদখশান অধিকার করে আফগান উপজাতি উজবেগ ও ইউসুফজাইদেরকে নিয়ন্ত্রন করেন।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার- সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা, বিদর এবং খান্দেশ এই পাঁচটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ছিল। এদের মধ্যে আহমদনগর ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। আকবর প্রথমে দূত পাঠিয়ে এসব রাজ্যের সুলতানদের মোগল আধিপত্য মেনে নেয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু একমাত্র খান্দেশের সুলতান সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে। ফলে আকবর সমরাভিযানের প্রস্তুতি মনোনিবেশ নেন। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনী আহমদনগর অভিযানে বের হয়। আহমদনগরের রাণী চাঁদ সুলতানা আকবরকে বেরার প্রদেশ দান করে তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে চাঁদ সুলতানার মৃত্যুর পর আহমদনগর আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইতোমধ্যে খান্দেশের নতুন সুলতান মীরন বাহাদুর মোগল আনুগত্য অস্বীকার করেন। আকবর স্বয়ং খান্দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং রাজধানী বুরহানপুর অধিকার করেন। মীরন বাহাদুর আত্মরক্ষার্থে সুরক্ষিত আসিরগড় দুর্গে আশ্রয় নেন।

১৬০১ খ্রিস্টাব্দে আকবর দুর্ভেদ্য দুর্গ আসিরগড় অধিকার করেন। আসিরগড়ই ছিল আকবরের সর্বশেষ রাজ্য জয়। তিনি আহমদনগর, বেরার ও খান্দেশ নিয়ে একটি সুবাহ গঠন করেন এবং যুবরাজ দানিয়েলকে এই সুবাহর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এভাবে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্যন্ত আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো।

শিক্ষার্থীর কাজ	আকবরের রাজ্য জয় একটি মানচিত্রে প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

সম্রাট আকবরের ক্ষমতা গ্রহণের সময় মোগল রাজত্ব পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে সীমিত ছিল। আকবর দীর্ঘ ৪০ বছর সমরাভিযান পরিচালনা করে তাঁর রাজ্য উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণানদী এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। এই বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সম্রাট আকবর সম্মুখ সমরের পাশাপাশি কখনও কখনও কূটনীতিরও আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাট আকবর কত বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১২ খ) ১৩ গ) ১৪ ঘ) ১৫

২। বাংলা কত খ্রিস্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যেভুক্ত হয়?
ক) ১৫৭৬ খ) ১৫৭৭ গ) ১৫৭৮ ঘ) ১৫৭৯

৩। আকবরের শেষ সমরাভিযান কোনটি?
ক) হলদিঘাটের যুদ্ধ খ) বাংলা বিজয়
গ) আসির গড়ের যুদ্ধ ঘ) কাবুল ও কান্দাহার বিজয়

৪। রানী চাঁদ সুলতানা কোন মুসলিম রাজ্যের রানী ছিলেন?
ক) আহমদ নগর খ) বিজাপুর
গ) গোলকুন্ডা ঘ) খান্দেশ

৫। বাংলার শেষ আফগান শাসক ছিলেন–
ক) সুলেমান কররানি খ) তাজখান কররানি
গ) দাউদ খান কররানি ঘ) বায়জিদ কররানি

সজৃনশীল প্রশ্ন

সেলিম অল্প বয়সে পিতৃ সিংহাসনে আরোহন করেন। তার রাজ্যের রাজপুত ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল বীর ও স্বজাত্যবোধে সচেতন যোদ্ধা হিসেবে খ্যাত। রাজ্যের স্থায়ীত্ব ও সম্প্রসারনের জন্য তিনি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আত্নীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কর। উচ্চ রাজপদে নিয়োগ প্রদান, সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা করা, সর্বোপরি বশ্যতা স্বীকার না করলে সমরাভিযান পরিচালনা করা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি দীর্ঘস্থায়ী এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে পানি পথের দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয়? ১

খ. মোগলদের সাম্রাজ্য সীমার বিবরণ দিন। ২

গ. উদ্দীপকের সেলিমের গৃহিত নীতির সাথে পাঠ্য পুস্তকের মোগল আমলের কোন সম্রাটের গৃহীত নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত সম্রাটের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৩.২ আকবরের শাসনকাল : ভূমি রাজস্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট আকবরের শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা।
- সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতির কারণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- আকবরের রাজপুত নীতির ফলাফলের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট আকবরের সময়ের গৃহীত ভূমি ব্যবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	রাজপুত, রণথম্ভোর, যোধপুর, জয়সালমীর, বিকানী, চিতোর, পরাউতি, চাচর, বনযর

সম্রাট আকবর ভারতে মোগল শাসন বিস্তার ও সুদৃঢ় করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে তার রাজপুত নীতি, ভূমি ব্যবস্থা তথা মনসবদারী প্রথা ইত্যাদি।

সম্রাট আকবরের রাজপুত নীতি: ভারতে মোগল রাজ্য বিস্তারের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান শক্তি ছিল রাজপুত জাতি। জাতিগতভাবে রাজপুতরা ছিল বীর ও স্বজাত্যবোধে সচেতন যোদ্ধা। সম্রাট আকবর রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি যৌক্তিক রাজপুত নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজপুত নীতিকে দুভাগে ভাগ করা যায় মিলনাত্বক নীতির অংশ হিসেবে **১.** মিত্রতামূলক নীতি এবং **২.** যুদ্ধদেহী নীতি।

আকবর রাজপুতদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে উচ্চ পদে নিয়োগ, জিযিয়া ও তীর্থ কর রহিতকরণ, এবং রাজপুত সংস্কৃতি পৃষ্ঠপোষকতা করে মিত্রতা স্থাপন করেন। আকবর স্বয়ং অম্বররাজ বিহারীমলের, বিকানীর ও জয় সিলমিরের রাজপুত কুমারীকে বিয়ে করেন। তিনি ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে যুবরাজ সেলিমের সাথে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যার বিয়ে দেন। তিনি রাজার টোডরমল, রাজা বিহারী মল, ভগবান দাস এবং মানসিংহকে প্রশাসনের উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি জিযিয়া ও তীর্থযাত্রীদের কর বাতিল করেন। তিনি কবি পণ্ডিত ও চিত্রশিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। যুদ্ধাংদেহী নীতির অংশ হিসেবে আকবর রনথম্ভোর, যোধপুর, জয়সালমীর, বিকানী এবং চিতোর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এই অঞ্চলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজপুত নীতির ফলাফল

আকবরের রাজপুত নীতি মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। এর ফলে মোগলরা পরবর্তী চার পুরুষ ব্যাপী রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। এ ছাড়াও রাজপুত ও মোগল সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

আকবরের ভূমি শাসন ব্যবস্থা

সম্রাট আকবরের ভূমি শাসন ব্যবস্থা অনন্য কৃতিত্বের দাবীদার। শেরশাহের রাজস্ব-সংস্কার নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে মুজাফ্ফর খান তুরবতী ও রাজা টোডরমলের সহযোগিতায় আকবর রাজস্ব ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তাঁর রাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য ছিল- ১. জমির শ্রেণি বিভাগকরণ, ২. উৎপন্ন শস্যের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব নির্ধারণ।

ভূমি জরিপ ও ভূমির শ্রেণি বিভাগ

সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত টোডরমল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সকল জমি জরিপ করিয়ে উর্বরতা ও কত কাল যাবৎ চাষাবাদ করা হয়-এসব তথ্যর ভিত্তিতে চাষের জমি সমূহকে ৪ ভাগে ভাগ করেন। যথা **১. পোলাজ জমি**— এ সমস্ত জমি প্রতি বছর চাষ করা হত। ২. **পরাউতি জমি**— এ ধরনের জমি একবার চাষের পর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য কিছুদিন অনাবাদী রাখা হত। ৩. **চাচর জমি**— এ সমস্ত জমি তিন বা চার বছর পর পর চাষ করা হত। ৪. **বনযার জমি**— এ ধরনের জমি পাঁচ বছরের জন্য অনাবাদী থাকত। প্রথম দুই ধরনের ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে গৃহীত হতো। চাচর ও বনযার জমির উপর সামান্য হারে রাজস্ব ধার্য করা হয়। কৃষকগণ নগদ টাকায় অথবা শস্যে খাজনা দিতে পারতো। এই ভূমি রাজস্ব নীতি 'যাবতী' বা টোডরমলের 'রায়তওয়ারী' প্রথা নামে পরিচিত। এছাড়াও কোন কোনো জমির উৎপাদিত ফসলের ১/৩ অংশ সরকার কর হিসেবে পেত। সাম্রাজ্যের কোনো কোনো সুবাহতে ফসল উৎপাদনের কোনো জরিপ না করে অনুমানের ভিত্তিতে সরকার ও রায়তের মধ্যে ফসল ভাগ করা হতো।

প্রত্যেক সুবাহ বা প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বলা হতো দিওয়ান। তিনি আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সুবাদারকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়ার পর উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণ করতেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও আর্থিক দুর্যোগের সময় রাজস্ব আদায় শিথিল করা হতো। প্রয়োজনে খাজনা মওকুফ করার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাজস্ব কর্মচারিদের দুর্নীতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

ফলাফল

এই রাজস্ব নীতির ফলে কৃষক ও রাষ্ট্র উভয় পক্ষই লাভবান হয়। রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ায় রাষ্ট্রের ঘাটতি কমে যায় এবং রাজস্ব কর্মচারিদের দুর্নীতি বন্ধ হয় এবং পাশাপাশি কৃষকদের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আকবরের রাজস্ব নীতি নিয়ে শিক্ষার্থীগণ দুটি দলে বিভক্ত হয়ে একটি বিতর্ক সভা আয়োজন করবে।

সারাংশ

সম্রাট আকবর রাজ্যের স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতির লক্ষ্যে রাজপুতদের প্রতি শুধু মিলনাত্মক নীতিই গ্রহণ করেন নি, বরং তার পাশাপাশি তিনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁর রাজপুত নীতির ফলে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুবরাজ সেলিম কত খ্রিস্টাব্দে ভগবানদাসের কন্যাকে বিবাহ করেন?

ক) ১৫৮০ খ) ১৫৮২ গ) ১৫৮৪ ঘ) ১৫৮৬

সাইফের সাম্রাজ্যের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা ছিল বীর ও জাতীয়তাবোধে সচেতন যোদ্ধা জাতি। তাদেরকে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য তিনি মিলনাত্মক ও যুদ্ধংদেহী নীতি গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

২। উদ্দীপকের সাইফের গৃহিত নীতির সাথে পাঠ্য পুস্তকের মোগল আমলের কোন সম্রাটের গৃহীত নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৩। রাজা টোডরমল কোন সম্রাটের অর্থমন্ত্রী ছিলেন?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৪। রাজা টোডরমল চাষের জমিসমূহ কয়ভাগে ভাগ করেন?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

৫। প্রতি বছর চাষ করা হতো যে জমি, তাকে বলা হয়–
ক) পরাউতি খ) চাচর গ) বনযার ঘ) লোপাজ

উদ্দীপকটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রানী বিলকিসের ভূমি কর্মকর্তা রাজ্যের সব জমি জরিপ করে জমিগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ করতেন।

৬। উদ্দীপকের রানির ভূমি কর্মকর্তার সাথে পাঠ্য পুস্তকের মোগল আমলের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য পাওয়া যায়।
ক) রাজা টোডরমল খ) মুজাফ্ফর খান গ) ফৈজী ঘ) আবুল ফজল

৭। উক্ত ব্যক্তির গৃহিত নীতির ফলে–
i. কৃষক ও রাষ্ট্র উভয়ই উপকৃত হয়
ii. কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্দ হয়
iii. কৃষকগণ সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৩ সম্রাট আকবরের শাসনকাল: ধর্মনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট আকবরের ধর্মীয় নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট আকবরের উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দীন-ই-ইলাহী, জাল্লাজালালুহু, ধর্মীয় উদারতা

সম্রাট আকবর ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত ও পরধর্মসহিষ্ণু। সকল ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন সমানুরাগী। তাঁর এই উদার ধর্মীয় নীতির পিছনে নিম্নোক্ত কারণ কার্যকর ভূমিকা পালন করে:

১. **গৃহশিক্ষক ও পারিবারিক প্রভাব:** আকবরের গৃহশিক্ষক আব্দুল লতিফ উদারপন্থী ছিলেন, তাঁর পিতা ও পিতামহ এমন কি মাতা হামিদা বানু কেউই গোঁড়া ছিলেন না। তিনি প্রথম জীবনে সুফি শেখ মুবারক ও তাঁর দুই পুত্র ফৈজী এবং আবুল ফজলের দ্বারা প্রভাবিত হন। বাল্যকালেই তিনি সুফি ধর্মমতের প্রভাবে আসেন। এর ফলে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যে ধর্মীয় উদার ও সহিষ্ণু ব্যক্তি হিসেবে বড় হন।

২. **ভক্তি ও মাহদী আন্দোলনের প্রভাব:** ষোল শতক ছিল ধর্ম আন্দোলনের যুগ। আকবর ছিলেন সে যুগের প্রতিচ্ছবি। কবীর, গুরু নানক, শ্রী চৈতন্য, রামানন্দ প্রমুখ মরমী সাধকগণ আকবরের ধর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছিলেন। ভারতের ভক্তি ও মাহদী আন্দোলনের প্রভাব জনসাধারণের মনকে সম্রাট আকবরকেও নাড়া দিয়েছিল।

৩. **ইবাদত খানায় বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতগণের আলোচনার প্রভাব:** সম্রাট আকবর দর্শন ও ধর্মীয় আলোচনার জন্য ফতেহপুর সিক্রিতে ইবাদতখানা নির্মাণ করেন। কিন্তু এইখানে আমন্ত্রিত আলেমগণের আলোচনায় তিনি বিদ্বেষ ও ধর্মীয় গোঁড়ামি, ব্যক্তিগত আক্রমণের মনোভাব ও ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা লক্ষ করেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে এইভাবে সত্যের সন্ধান করা বৃথা। তাই তিনি 'অভ্রান্ত বা সর্বময় কর্তৃত্বের' ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা দ্বারা সম্রাট রাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ক যেকোনো সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করেন। তবে এর ফলে গোঁড়া সুন্নী মুসলমানরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

৪. **রাজনৈতিক কারণ:** সম্রাট আকবর উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষ বিভিন্ন ধর্মের মানুষের দেশ। ফলে মোগল শাসক গোষ্ঠী হিসেবে ভারতীয়দের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করতে হলে ধর্মীয় ব্যাপারে সহনশীল ও উদার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

দীন-ই-ইলাহী

সম্রাট আকবর ১৫৮২ সালে 'দীন-ই-ইলাহী' নামে একেশ্বরবাদমূলক এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সকল ধর্মের সারবস্তু নিয়ে এই ধর্মমত গঠিত হয়। এই ধর্মমতের কালেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবর খলিফাতুল্লাহ'। দীন-ই-ইলাহী রীতি-নীতি, বিধানগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. এই ধর্মের অনুসারীগণ পরস্পর দেখা হলে, 'আসসালামু আলাইকুম' এর পরিবর্তে 'আল্লাহু আকবার' এবং প্রত্যুত্তরে 'ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম' না বলে 'জাল্লাজালালুহু' বলা।
২. এই ধর্মীয় বিধান অনুসারে মৃত্যুর পরে নয়, মৃত্যুর পূর্বেই দাওয়াত বা আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা।
৩. সভ্যগণ নিজ নিজ জন্মদিন পালন এবং ভোজের আয়োজন করবেন।
৪. সভ্যগণ ভিক্ষা প্রদান করবেন কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না।
৫. এই ধর্মমত গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা হবে না।

ড. ভি. স্মিথের মতে, সংকীর্ণ অর্থে আকবরের দীন-ই-ইলাহী কোনো ধর্ম নয়। এটি ছিল একটি জীবন দর্শন মাত্র। সম্রাট আকবর জোর করে তাঁর ধর্মমত কারও উপর চাপিয়ে দেন নি। এ জন্যই দীন-ই-এলাহীর দীক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র বিশজন। এদের একমাত্র হিন্দু ছিলেন রাজা বীরবল এবং বাকী সকলেই মুসলমান। দীন-ই-এলাহীর মাধ্যমে সকল ধর্মের সারাংশের এক অপুর্ব সংমিশ্রণ সাধন করা ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এর পিছনে তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদেরকে একসঙ্গে নিয়ে আসা। দীন-ই-ইলাহী সম্রাট আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫ খ্রি.) সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়।

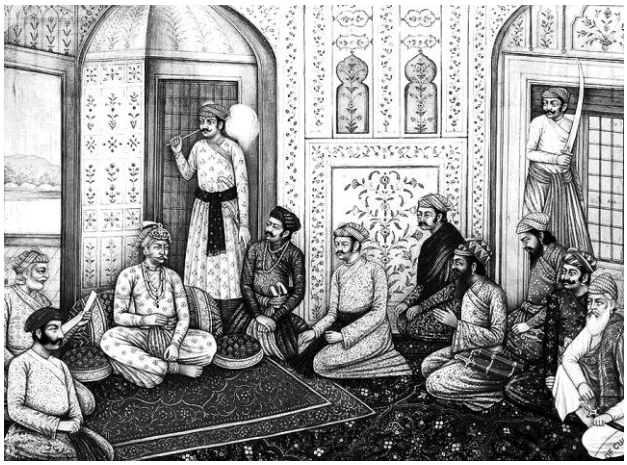

আকবরের বিখ্যাত সভাসদদের নয়জন (নবরত্ন)

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ আকবরের ধর্মনীতি নিয়ে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

সম্রাট আকবর ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন প্রভাব তাঁর ধর্মীয় উদার নীতির জন্য দায়ী ছিল। তিনি সব ধর্মের সার নিয়ে দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন। কিন্তু এ মতবাদ তাঁর মৃত্যুর পরপরই বিলুপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। 'দ্বীন-ই-ইলাহী' এর প্রবর্তক কে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন
গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

২। সম্রাট আকবর কত খ্রিস্টাব্দে দ্বীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেন?
ক) ১৫৮১ খ) ১৫৮২
গ) ১৫৮৩ ঘ) ১৫৮৪

৩। ধর্মান্দোলনের যুগ কোনটি?
ক) ত্রয়োদশ খ) চতুদর্শ
গ) ষোড়শ ঘ) সপ্তদশ

৪। সম্রাট আকবর ফতেহপুর সিক্রিতে নির্মাণ করেন–
ক) ইবাদত খানা খ) বৈঠক খানা
গ) মসজিদ ঘ) দরবার খানা

৫। দ্বীন-ই-ইলাহীর' বিধানগুলোর মধ্যে ছিল–
i. মৃত্যুর পূর্বেই দাওয়াত বা আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা
ii. সদস্যদের মাংস ভক্ষণ নিষেধ
iii. সদস্যরা ভিক্ষা প্রদান করবেন, গ্রহণ করতেন না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জামাল উদ্দিনের রাজ্যের অধিকাংশ জনগণ হিন্দু ধর্মের অনুসারী; কিন্তু শাসকগোষ্ঠী মুসলমান। তদুপরি ধর্মীয় নেতাদের আলোচনায় বিদ্বেষ, ধর্মীয় গোড়ামী ও ব্যক্তিগত আক্রমনের মনোভাব লক্ষ্য করে বিভিন্ন ধর্মগুরুদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও পর ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা দুর করার উদ্দেশ্যে জামালউদ্দিন এক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সব ধর্মের সার নিয়ে এই ধর্মমত প্রবর্তন করলেও তার মৃত্যুর পরপরই এই নতুন ধর্মীয় মতবাদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ক. "ইমাম-ই-আদিল" খেতাব গ্রহণ করেন কে? ১
খ. ভারতে "ভক্তি ও মাহদী" আন্দোলনের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের জামাল উদ্দিনের নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের সাথে মোগল যুগের যে সম্রাটের ধর্মমত প্রবর্তনের সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "ষোল শতক ধর্মান্দোলনের যুগ"– পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৩.৪ জাহাঙ্গীরের শানসনকাল ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালের জনহিতকর কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	জাহাঙ্গীর, নূরজাহান, প্রথম জেমস্।

সামরিক সাফল্য

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর যুবরাজ সেলিম 'নুরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। আকবরের মতো প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন না হলেও তিনি একজন দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন এবং মেবার বিজয় করেন। তিনি দাক্ষিণাত্য বিজয়েরও উদ্যোগ গ্রহণ করে ছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর

জনহিতকর কাজ

সম্রাট জাহাঙ্গীর ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে আকর্ষণীয়, প্রজ্ঞাবান, দয়ালু ও বুদ্ধিমান শাসক। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি কতগুলো জনহিতকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রজা সাধারণের মন জয়ের চেষ্টা করেন। যাঁরা তাকে সিংহাসন লাভে সহায়তা করেছিলেন তিনি তাঁদেরকে পদোন্নতি প্রদান করেন। অধিকার যারা তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন তাদেরও তিনি উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর পিতার সময়ের বেশকিছু নির্যাতনমূলক আইন বাতিল করেন এবং 'দস্তুর-উল-আমল' নামে ১২টি আইন প্রণয়ন করে দয়া ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। একজন সাধারণ প্রজাও সরাসরি সম্রাটের বিচারপ্রার্থী হতে পারতেন। ধনী ও গরিব সকলেই যেন তাঁর নিকট সরাসরি বিচারপ্রার্থী হতে পারে সেজন্য সম্রাট ষাটটি ঘণ্টাযুক্ত একটি সোনার শিকল আগ্রার প্রাসাদ থেকে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। যেকোন বিচার প্রাথী শিকলে টান দিলে ষাটটি ঘন্টা একসাথে বেজে উঠত এবং সম্রাট যেখানেই থাকুন না কেন দরবার কক্ষে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থীর অভিযোগ শুনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতেন।

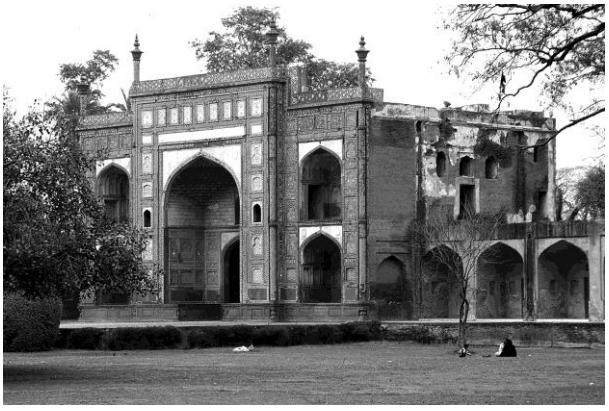

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি

প্রজাদের প্রতি এমনি দয়া ও মহানুভবতা সত্ত্বেও সম্রাটের চরিত্রে বৈপরীত্যের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর চরিত্রে দয়া-দাক্ষিণ্য ও কোমলতার পাশাপাশি শত্রু দমনে ও অপরাধীর শাস্তি বিধানে কঠোরতা, নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি ও বাণিজ্য নীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীর সকল ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে তিনি কোনো প্রকার গোঁড়ামী পছন্দ করতেন না। ফকির, দরবেশ, জ্ঞানী-গুণীদের তিনি সমাদর করতেন। সাহিত্য, শিল্পকলা ও চিত্রশিল্পে তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। সম্রাট নিজে চিত্রকর ও কবি ছিলেন। *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী* রচনা করে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এটি ছিল তাঁর আত্মজিবনী যেখানে সমসাময়িক মোগল ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সাহিত্যের উৎকর্ষতার কারণে তাঁর সময়কালকে অনেকে মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যের 'অগাস্টাস যুগ' বলে অভিহিত করেন। সম্রাটের এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও মদ্যপান এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে। রাজত্বের শেষভাগে স্ত্রী নূরজাহান ও তাঁর ভাই আসফ খান সম্রাটের উপর বিশেষ প্রভাববিস্তার করেছিলেন। ফলে সাম্রাজ্যের কোনো কোনো অঞ্চলে গোলযোগ দেখা দেয়। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য তিনি ভারতবর্ষে পর্তুগিজদের সব রকমের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও ইংরেজ বণিকদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং সুরাটে কারখানা নির্মাণের অনুমতি দেন। ক্যাপ্টেন হকিন্স ও টমাস রো নামক দু'জন ইংরেজ দূত ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের পত্র নিয়ে হাজির হন। এসকল দূতরা ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সম্রাটের নিকট থেকে সুবিধা আদায় করেন। তার সময় থেকেই ভারতে ব্রিটিশদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারের সূত্রপাত ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিচারকাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণ দলীয়ভাবে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

সম্রাট জাহাঙ্গীর মোগল সম্রাটদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দয়ালু ও প্রজারঞ্জক সম্রাট, তবে প্রয়োজনে তিনি কঠোর ও নিষ্ঠুর হতে পারতেন। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সম্রাট জাহাঙ্গীর কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১৬০৫ খ) ১৬০৬ গ) ১৬০৭ ঘ) ১৬০৮

২। জাহাঙ্গীর "দস্তুর-উল-আমল" নামে কয়টি আইন প্রণয়ন করেন?
ক) ১১ খ) ১২ গ) ১৩ ঘ) ১৪

৩। আগ্রার প্রাসাদ থেকে যমুনার তীর পর্যন্ত ঝোলানো সোনার শিকলে কয়টি ঘন্টা ছিল?
ক) ৫০ খ) ৫৫ গ) ৬০ ঘ) ৬৫

৪। *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী* কে রচনা করেন?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। জাহাঙ্গীরের সময়ে সুরাটে কারখানা নির্মাণ করে–
ক) পর্তুগিজরা খ) ওলন্দাজরা গ) ইংরেজরা ঘ) ফরাসিরা

৬। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের নানা তথ্য সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেন–
i. টমাস রো
ii. এডওয়ার্ড টেরি
iii. ক্যাপ্টেন হকিন্স
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ শাহজাহানের শাসনকাল ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট শাহজাহানের শাসনকাল সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপন করতে পারবেন।
- বিজেতা ও শাসক হিসেবে শাহজাহানের কৃতিত্বের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট শাহজাহানের সময়কালের স্থাপত্য শিল্পের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলে পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রধান ঘটনাবলি ও এর ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	শাহজাহান, তাজমহল, নতুন দিল্লি

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর শাহজাদা খুররম ও শাহরিয়ারের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শাহরিয়ার শ্বাশুড়ি নূরজাহানের প্ররোচনায় লাহোরে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। শাহজাদা খুররমের শ্বশুর আসফ খান নিজ জামাতাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে শাহরিয়ারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তাকে পরাজিত করেন এবং অন্ধ করে। দিয়ে সিংহাসনের অনুপযুক্ত করে দেন। শাহজাদা খুররম দাক্ষিণাত্যে ছিলেন তিনি আগ্রায় ফিরে আসেন এবং ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি 'আবুল মুজাফফর শিহাব উদ্দিন মুহাম্মদ শাহজাহান বাদশাহ গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর ত্রিশ বছরের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল।

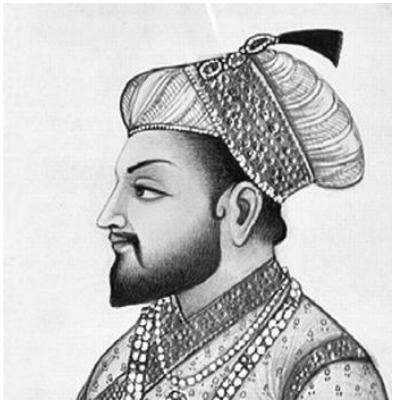

সম্রাট শাহ্জাহান

মোগল ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের জীবনালেখ্য বৈচিত্রময় ঘটনায় পরিপূর্ণ। একজন জনপ্রিয় সম্রাটরূপে তিনি ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমরকুশলী হিসেবে সম্রাট শাহজাহান দক্ষতার পরিচয় দেন। মোগল আধিপত্য বিস্তারেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর আমলে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পর্তুগিজদের দমন করে হুগলী দখল করেন।

সুশাসন, ন্যায়বিচার ও বদান্যতার জন্য শাহজাহানের শাসনকাল উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রশাসনের প্রতিটি স্তরের কার্যক্রম নিজে তদারক করতেন এবং প্রজাদেরকে সন্তানতুল্য বিবেচনা করতেন। তবে অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্তি দানে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সর্বপ্রথম পশ্চিম এশিয়ার এবং ইউরোপের সাথে ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তাজমহল

সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্য পিপাসু শিল্পমনা মানুষ। The Prince of Builder নামে খ্যাত সম্রাট শাহজাহানের আমলে মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাটের স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধ তাজমহল বিশ্বের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম একটি নিদর্শন ও স্ত্রীর প্রতি তার ভালবাসার অনন্য বহিঃপ্রকাশ। দেশি বিদেশি কুড়ি হাজার শিল্পী ও কারিগরের বাইশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে নির্মিত তাজমহলকে ঐতিহাসিক হ্যাভেল ভারতের 'ভেনাস দ্যা মিলো' নামে

আখ্যায়িত করেছেন। এছাড়া মতি মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, জামে মসজিদ তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম কীর্তি। শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসন তাঁর শিল্পানুরাগের এক অপূর্ব নিদর্শন। 'শাহজাহানাবাদ' নামে একটি নতুন নগর তিনি নির্মাণ করান যা বর্তমানে নতুন দিল্লী নামে পরিচিত। এ সকল স্থাপত্য নির্দশনের নির্মাণ কৌশলে ভারতীয় ও পারসিক স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সময়ে চিত্র শিল্পের যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তিনি হস্তলিপি বিদ্যারও পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব : সম্রাট শাহজাহানের চার পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোহ ছিলেন সম্রাটের প্রিয় এবং তিনি পিতার সাথে আগ্রাতে অবস্থান করছিলেন। অন্য তিন পুত্রের মধ্যে সুজা বাংলায়, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে এবং মুরাদ গুজরাটের প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় দারা শিকোহ অসুস্থ সম্রাটের শয্যাপাশে থেকে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। দীর্ঘ সময় রাজকার্যে সম্রাটের অনুপস্থিতি এবং দারাশিকোর ক্ষমতা গ্রহণের স্পৃহা শাহজাহানের অন্য তিন পুত্রের ভিতর সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং এর ফলে উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

উত্তরাধিকার যুদ্ধের কারণ

১. **সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব-** মোগলদের সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তরাধিকার নীতি ছিল না। ফলে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ এবং ভ্রাতৃ কলহ আগেও একাধিকবার সংঘটিত হয়েছিল। সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাবেই শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যেও গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

২. **ভাইদের প্রতি দারার অশোভন আচরণ-** সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার খবর দারা গোপন রাখেন এবং রাজধানী আগ্রার সাথে বাংলা, গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যের যোগাযোগের সব রাস্তা বন্ধ করে দেন। দারার এমনি ধরনের আচরণ ভাইদের মাঝে সংঘাত অনিবার্য করে তোলে।

৪. **দারার প্রতি শাহজাহানের অন্ধ স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব-** সম্রাট শাহজাহান দারার প্রতি সমর্থন জানান এবং তাকে সিংহাসন লাভের জন্য আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেন। তিনি দারার পরামর্শে আওরঙ্গজেবকে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়ে বাধা দেন। দারার প্রতি তাঁর এই পক্ষপাতিত্ব উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগায়।

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের প্রধান ঘটনা প্রবাহ

বাংলার শাসনকর্তা সুজা দারার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম নিজকে মোগল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন এবং সসৈন্য রাজধানী আগ্রা দখল করতে অগ্রসর হন। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাহাদুর গড়ের যুদ্ধে দারার সৈন্য দ্বারা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে সুজা বাংলায় ফিরে যান এবং পরবর্তীতে আরাকানীদের হাতে নিহত হন।

অন্যদিকে গুজরাটে মুরাদ স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। শাহজাদা আওরঙ্গজেব ছিলেন ধীরস্থির ও বিচক্ষণ প্রকৃতির। তিনি অন্য ভাইদের মতো নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন নি। মুরাদের সাথে মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনী উজ্জয়িনীর নিকট ধর্মাটে সম্রাট বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে সম্রাট বাহিনী পরাজিত হয়। এই ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে দারাশিকো ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তার পূর্ণ শক্তি সহকারে সামুগড়ে ভ্রাতাদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে পরাস্ত হন এবং দিল্লীতে পালিয়ে যান। সামুগড়ের যুদ্ধেই উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বের ফয়সালা হয়ে যায়।

দারাকে অনুসরণ করে আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করেন। তিনি বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানকে নজরবন্দী করেন এবং কৌশলে বন্দী করে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব 'আবুল মোজাফ্ফর মহিউদ্দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর বাদশা গাজী' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন অভিযোগের কারণে দারা এবং মুরাদকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। এইভাবে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের উত্তরাধিকার যুদ্ধের উপর একটি নাটিকা রচনা করবেন।

সারাংশ

মোগল শাসনামলের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত। তাঁর আমলে রাজ্যসীমা বিস্তৃত হয়। দেশে শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজমান ছিল। ভারতবর্ষের স্থাপত্য শিল্পে এক অপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাট জাঁকজমকপূর্ণ দরবার বজায় রাখেন। এসব কারণে মোগল ইতিহাসে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল স্বর্ণযুগ হিসেবে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "Prince of Builders" নামে খ্যাত কে?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

২। কোন সম্রাট পর্তুগিজদের দমন করে হুগলী দখল করেন?
ক) হুমায়ুন খ) আকবর গ) জাহাঙ্গীর ঘ) শাহজাহান

৩। তাজমহল নির্মাণে কত বছর সময় লেগেছিলো?
ক) ২০ খ) ২১ গ) ২২ ঘ) ২৩

৪। ময়ুর সিংহাসন নির্মাণ করেন কে?
ক) জাহাঙ্গীর খ) শাহজাহান গ) আওরঙ্গজেব ঘ) শাহ আলম

৫। সম্রাট শাহজাহান "শাহজাহানাবাদ" নামে একটা নতুন নগর নির্মাণ করেন। উক্ত নগরের বর্তমান নাম কী?
ক) আহমেদাবাদ খ) নতুন দিল্লি গ) ফিরোজাবাদ ঘ) গুজরাট

সৃজনশীল প্রশ্ন

সুমাইয়া নামের এক অপরূপ সুন্দরী মহিলাকে তাওহীদ বিবাহ করেন। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই তাওহীদের স্ত্রী পরলোক গমন করেন। প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি অগাধ ভালোবাসা আর আবেগকে অম্লান করে রাখার জন্য, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার স্মৃতিকে জীবন্ত করে রাখার জন্য তাওহীদ তার স্ত্রীর সমাধির উপর অনেক অর্থ ব্যয়ে, অনেক দিন ধরে সুন্দর সুন্দর কারুকার্য খোচিত অপরূপ সৌন্দর্য-মণ্ডিত এক স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন।

ক. ভারতের "ভেনাস দ্যা মিলো" কী? ১
খ. বর্হিবাণিজ্য কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকের স্মৃতি সৌধ নির্মাণের সাথে পাঠ্য পুস্তকের সম্রাটের স্মৃতি সৌধ নির্মাণের কী সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "উক্ত সম্রাটের জাঁক-জমক ও ব্যয় বাহুল্যের অন্তরালে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজ অংকুরিত হয়েছিল"– আপনি কী একমত? পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৩.৬ আওরঙ্গজেবের শাসনকাল ও কৃতিত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আওরঙ্গজেবের সামরিক সাফল্যের বিবরণ দিতে পারবেন।
- আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতির কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধার্মিক মুসলমান ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আওরঙ্গজেবের কৃতিত্বের উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আওরঙ্গজেব, গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, মারাঠা

সম্রাট শাহজাহানের জীবদ্দশায় সংঘটিত উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে বিজয়ী হয়ে ১৬৫৮ খিষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব বাদশাহ আলমগীর উপাধি নিয়ে মোগল সিংহাসনে বসেন। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে তিনি একজন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। ঐতিহাসিক স্টেন্‌লি লেনপুল আওরঙ্গজেবকে মোগল বংশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক বলেছেন। তিনি আকবর অপেক্ষা বৃহত্তর সাম্রাজ্য শাসন ও বিশালতর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছিলেন। সম্রাট হয়েও তিনি সরল ও পবিত্র জীবনযাপন করতেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ধর্মান্ধ ও গোঁড়া মুসলমান হিসেবে অভিযুক্ত করলেও নিঃসন্দেহে তিনি একজন ধর্মপ্রাণ সম্রাট ছিলেন। রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় তিনি ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি নিজের সুখ-সুবিধা অপেক্ষা প্রজাদের কল্যাণের কথা বেশি ভাবতেন।

সামরিক সাফল্য

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন সুদক্ষ সমর নায়ক। যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনে খুব কম যুদ্ধেই তিনি পরাজয় বরণ করেছিলেন। বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল জয় তাঁর সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করেছিল।

বাদশাহ আওরঙ্গজেব

সম্রাট শাহজাহানের সামরিক সাফল্যের পর আওরঙ্গজেবের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা আলোচিত বিষয় ছিল দাক্ষিণাত্য নীতি। যা একটি বিতর্কিত বিষয়।

কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর এই নীতি ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। অন্যান্যদের ধারণা এই যে, তাঁর নীতির মূল উদ্দেশ্য মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি। এ ছাড়াও সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি বা দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযানের অন্যান্য কারণ হচ্ছে:

১. দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলো মোগল সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ ছিল।
২. গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের সুলতানদের কর দিতে অস্বীকৃতি।
৩. মারাঠা নেতা শম্ভুজী সম্রাটের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দান।
৪. দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা এ সময় খুব শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং মোগল সাম্রাজ্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণ ভারত অভিযান

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়কে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমত পর্যায়: সিংহাসনে আরোহণ থেকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা পর্যন্ত। মারাঠা বীর শিবাজী দাক্ষিণাত্যে প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠলে আওরঙ্গজেব তাঁকে দমন করার জন্য প্রথমে শায়েস্তা খানকে এবং পরবর্তী সময়ে দিলীর খান ও জয়সিংহকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযান সফল হলেও মারাঠা শক্তিকে পুরোপুরি ধ্বংস করা সম্ভব হয় নি। দ্বিতীয় পর্যায়: এটি ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময়ে সম্রাট আওরঙ্গজেব বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে দমন ও শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করেন। তৃতীয় পর্যায়: ১৬৮৭ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব শম্ভুজী ও অন্যান্য মারাঠা নেতার ক্ষমতা ধ্বংস সাধন করেন। আওরঙ্গজেব দীর্ঘ ২৫ বছর (১৬৮২-১৭০৭ খ্রি.) দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেছিলেন। এ সময়ে শম্ভুজী পরাজিত ও নিহত হন এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মোগল-মারাঠা সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে।

দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে আওরঙ্গজেবের রাজ্যসীমা কাবুল থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁর দাক্ষিণাত্য নীতির ফলাফল নিম্নরূপ :

১. আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণ করে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য দখল করলে পরোক্ষভাবে মারাঠা শক্তি উত্থানের পথ উন্মুক্ত হয়। বস্তুত বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা ছিল মারাঠাদের স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মোগলদের নিকট এদের পরাজয়ের ফলে মারাঠারা প্রাথমিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত হয়ে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পায়।

২. দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে বিস্তৃত সুবিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে শাসন পরিচালনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

৩. দীর্ঘ সময় সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে অবস্থানের কারণে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আফগান, জাঠ, মেওয়াটি, শিখ ও রাজপুতরা মোগল প্রশাসনিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে।

৪. অবিরাম যুদ্ধের ফলে রাজকোষে চরম অর্থ সংকট দেখা দেয়। কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ অবস্থা মোগল রাজকোষের উপর দারুন চাপ সৃষ্টি করে। রাজকোষ নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় সৈন্যদের বেতন বকেয়া পড়তে থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অসন্তোষ দেখা দেয়। তাই কোনো কোনো ঐতিহাসিক অভিমত প্রকাশ করেছেন যে দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে সম্রাট সব কিছু লাভ করলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি সব কিছুই হারালেন। ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন, দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের খ্যাতি ও দেহের সমাধি ক্ষেত্র রচিত হয়।

আওরঙ্গজেবের সময় মোগল সামাজ্য

ধর্মপ্রাণ ও শিক্ষানুরাগ মুসলমান

সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তিনি শিক্ষাবিদদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। পবিত্র কুরআন তাঁর মুখস্থ ছিল এবং বহু হাদিস তাঁর জানা ছিল। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত ফেকাহ গ্রন্থ *ফতোয়া-ই-আলমগিরী* প্রণীত হয়। তিনি নিজ হাতে কোরআন শরীফ নকল করতেন ও টুপি সেলাই করতেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব বহু সদগুণের অধিকারী ছিলেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানের (মানচিত্রসহ) উপর একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন আদর্শবান সম্রাট ছিলেন। সফল সমর নায়ক হিসেবেও তিনি তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি ধর্মান্ধ ছিলেন না, তবে ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁর বহু গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযান ও তার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রক্রিয়া তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই শুরু হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হলেও দেশে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। মোগল বাহিনীর কাছে মারাঠা নেতা শিবাজী ও শম্ভুজী পরাজিত হলেও মারাঠা শক্তির পুরোপুরি ধ্বংস সাধন সম্ভব হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আওরঙ্গজেব কত খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন?
ক) ১৬৫৮ খ) ১৬৫৯ গ) ১৬৬০ ঘ) ১৬৬১

২। আওরঙ্গজেব কত বছর রাজত্ব করেন?
ক) ৪৮ খ) ৪৯ গ) ৫০ ঘ) ৫১

৩। আওরঙ্গজেব শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রথম কার নেতৃত্বে অভিযান প্রেরণ করেন?
ক) শায়েস্তা খান খ) দিলীর খান গ) জয়সিংহ ঘ) মানসিংহ

৪। আওরঙ্গজেব কত বছর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করেন?
ক) ২২ খ) ২৫ গ) ২৭ ঘ) ২৯

উদ্দীপকটি পড়ুন ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
নিজাম উত্তরাধিকার দ্বন্দ্বে জয়লাভ করে পিতৃ সিংহাসনে আরোহন করেন। কিন্তু বিদ্রোহী পুত্র ও প্রাদেশিক শাসকদের দমন করতে দীর্ঘদিন তাকে রাজধানীর বাহিরে অবস্থান করতে হয়। ফলে সাম্রাজ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়।

৫। উদ্দীপকের নিজামের সাথে কোন মোগল সম্রাটের সাদৃশ্য আছে?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৬। উক্ত সম্রাটের দাক্ষিণাত্য বিজয়ের ফলে সাম্রাজ্য সীমা বিস্তার লাভ করে–
i. কাবুল থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত
ii. কাশ্মীর থেকে কাবেরী পর্যন্ত
iii. হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। "ফাতোয়া-ই-আলমগিরী" কী?
ক) ফেকাহ শাস্ত্র খ) রাজনীতি শাস্ত্র গ) অনুবাদ গ্রন্থ ঘ) আত্মজীবনী

৮। "ফাতোয়া-ই-আলমগিরী" কার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত হয়?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

পাঠ-৩.৭ মোগল যুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল যুগের প্রশাসনিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মোগল সম্রাটের ক্ষমতার বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন মোগল প্রশাসনিক বিভাগের কাজের বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাদেশিক শাসন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ওয়াজির, দিউয়ান, সুবাহ, সরকার, পরগনা, সুবাহদার

মোগল শাসনব্যবস্থা এক-কেন্দ্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী হলেও জনকল্যাণকামী ছিল। এই শাসনব্যবস্থা ছিল প্রধানত সামরিক শক্তি নির্ভর। তাই একমাত্র সদর ও কাজী ছাড়া অন্যসব কর্মচারিকে সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। মোগল শাসন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি রচিত হয় তুর্কি-পারস্য শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে। মোগলরা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থানীয় প্রাদেশিক শাসন কাঠামোও গড়ে তুলেছিল।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন

মোগল শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার উৎস ছিলেন 'পাদশাহ' বা সম্রাট। এটি ফার্সি শব্দ যা বাংলায় বাদশাহ হিসেবে ব্যবহৃত। তিনি একাধারে রাষ্ট্রীয় প্রধান, সামরিক প্রধান এবং প্রধান বিচারক হিসেবে রাজ্য পরিচালনা ও প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। রাজকর্মচারিরা তাদের স্ব স্ব কর্মকান্ডের জন্য বাদশাহের কাছেই দায়বদ্ধ থাকতেন। কর্মচারিদের চাকরির কার্যকাল সম্রাটের ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করত।

দফতর সৃষ্টি:

মোগল আমলে প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠ ভাবে চালানোর উদ্দেশ্যে কতগুলো দফতর বা অফিস সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেক দফতর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার দ্বারা পরিচালিত হত।

ওয়াজির বা প্রধানমন্ত্রী:

সম্রাটের পরই প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজিরের স্থান ছিল। তিনি কোনো কোনো সময় রাজস্ব বিভাগও দেখাশুনা করতেন। তবে মোগল প্রশাসনের ওয়াজিরের পদ অপরিহার্য ছিল না। তাই মোগল আমলে সব সময় ওয়াজির নিযুক্ত হত না।

প্রশাসনিক বিভাগ সমূহ:

১. মোগল আমলের রাজস্ব বিভাগের যাবতীয় কার্যভার দিউয়ানের ওপর ন্যস্ত ছিল। তিনি অর্থনৈতিক বিভাগের পরিচালনা ও পরিদর্শন করতেন। এছাড়াও তিনি সরকারি অফিসার ও সম্রাটের মধ্যে প্রধান মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করতেন। দিউয়ান-ই-খালাসা, দিউয়ান-ই-জায়গীর ও দিউয়ান-ই-তাউজিব পদবীধারী কর্মকর্তাগণ দিউয়ানকে সহযোগিতা করতেন।

২. মীর বকসি ছিলেন সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ রাজকর্মচারি। সৈন্য সংগ্রহ, অশ্ব পরিদর্শন, মনসবদার প্রভৃতি কর্মচারির তালিকা সংরক্ষণ প্রভৃতি তাঁর দায়িত্ব ছিল। এছাড়া মীর-ই-বহর ছিলেন নৌবহরের প্রধান।

৩. মীর-ই-সামান ছিলেন সম্রাটের গৃহ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি। তিনি সম্রাটের পরিবারবর্গের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য প্রভৃতি তদারক করতেন।

৪. সদর-উস-সুদূর ছিলেন ধর্মীয় সম্পত্তি, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারি দান বিভাগের অধিকর্তা।

৫. কাজী-উল-কুজ্জাত বা প্রধান কাজী ছিলেন সম্রাটের অধীনে সর্বোচ্চ বিচারপতি। তিনি প্রাদেশিক কাজী নিয়োগ ও তাদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন। মুফতি তাঁকে আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য করতেন।

এছাড়াও অন্যান্য রাজকর্মচারীর মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হতো এবং জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা বিধান করা হত।

প্রাদেশিক শাসন

বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনের জন্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতগুলো 'সুবাহ' বা প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। সুবাহদার ছিলেন সুবাহর প্রধান কর্ম নির্বাহক। পদমর্যাদায় সুবাহদারের পরেই ছিল প্রাদেশিক দিউয়ান। প্রদেশের আর্থিক উন্নতি এবং রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা ছিল দিউয়ানের দায়িত্ব। সুবাহদার ও দিওয়ান তারা উভয়ই সরাসরি বাদশাহের কাছে তাদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা করতেন এ দুজন প্রধান কর্মকর্তা ছাড়া প্রদেশের অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে সদর ও কাজী, বক্শী, ওয়াকিয়া নবিস, কোতোয়াল ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা। মোগল আমলে প্রতিটি প্রদেশ কয়েকটি সরকার বা জেলায় এবং প্রতিটি সরকার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। ফৌজদার ও শিকদার ছিলেন যথাক্রমে সরকার ও পরগণার প্রধান নির্বাহীকর্তা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মোগল শাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

মোগল শাসন ব্যবস্থার ভিত রচনা করেন সম্রাট আকবর। এ শাসন ব্যবস্থা ছিল মূলত এককেন্দ্রিক স্বৈরতান্ত্রিক। সম্রাট ছিলেন এই শাসন ব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তবে তিনি তাঁর বিভিন্ন অধীনস্ত কর্মচারির সাহায্যে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মোগল প্রশাসন ব্যবস্থায় সম্রাটের পরের স্থান ছিল কার?
ক) কাজী-উল-কুজ্জাত খ) প্রধানমন্ত্রী বা ওয়াজির
গ) দিউয়ান ঘ) মীর বক্সি

২। মোগল প্রশাসনে রাজস্ব বিভাগ ন্যাস্ত ছিল কার উপর?
ক) দিউয়ান খ) কাজী-উল- কুজ্জাত
গ) মীর বক্সি ঘ) মীর-ই-সামান

৩। সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ কর্মকর্তা ছিলেন–
ক) দিউয়ান খ) কাজী
গ) মীর বক্সি ঘ) মীর-ই-সামান

৪। "সুবাহ"-এর প্রধান কার্যনির্বাহক ছিলেন কে?
ক) ফৌজদার খ) শিকদার
গ) সুবাহদার ঘ) দিউয়ান

৫। পরগনাহ প্রধানকে বলা হতো–
ক) সুবাহদার খ) শিকদার
গ) ফৌজদার ঘ) দিউয়ান

৬। মোগল শাসন ব্যবস্থায় দিউয়ান কে সাহায্য করতেন–
i. দিউয়ান-ই-খালাসা
ii. দিউয়ান-ই-জায়গীর
iii. দিউয়ান-ই-তাউজিব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৮ মোগল আমলের অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল আমলের কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মোগল আমলের দ্রব্যমূল্যের উল্লেখ করতে পারবেন।
- মোগল যুগের বাণিজ্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	কৃষি, রাজস্ব, সুরাট, কালিকট, কড়ি

অর্থনৈতিক অবস্থা

মুগল যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। তবে অল্প আকারে হস্ত নির্ভর কুঠির শিল্পের বিকাশও হয়েছিল। এ ছাড়া মোঘলযুগে ভারতবর্ষে ইউরোপিয় বাণিজ্যের বিকাশ শুরু হয়। মোগল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সমকালীন ফার্সি সাহিত্য, ইউরোপিয় পর্যটকদের বিবরণী ইত্যাদি থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া *বাবরনামা*, *হুমায়ুন নামা*, *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থ থেকেও বিশেষ তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে গুলবদন বেগমের *হুমায়ুননামা*-তে উল্লিখিত মোগল আমলের আর্থিক সচ্ছলতার প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলা যায়।

কৃষি ও রাজস্ব নীতি

মোগল যুগে কৃষিই ছিল ভারতের জনগণের প্রধান জীবিকা ও সাম্রাজ্যের রাজস্বের প্রধান উৎস। মোগল আমলে জাবতি, গাল্লাবকস, নাসাব প্রভৃতি প্রথা অনুসারে রাজস্ব আদায় হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট হারে নগদে রাজস্ব আদায়ের নিয়ম ছিল। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে উৎপন্ন শস্যের তিন ভাগের এক অংশ আদায় করা হত যা পরবর্তী আমলে বাড়তে থাকে। মোগল আমলে পণ্যদ্রব্যের দাম খুব কম ছিল। আকবরের আমলে টাকায় ১৫ মন গম এবং ১০ মন চাল বিক্রি হতো। সুবাহদার শায়েস্তা খানের সময় বাংলায় টাকায় ৭/৮ মন চাল বিক্রি হতো। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য, শাক-সবজি, জীব-জন্তুর দামও খুব সস্তা ছিল।

জনহিতকর কার্যক্রম ও বাণিজ্য-নীতি

মোগল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সময় ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। জল ও স্থল পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মোগল সম্রাটগণ রাস্তার দুই পাশে পথিক ও বণিকদের সুবিধার্থে কূপ খনন, বৃক্ষরোপণ ও সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। মোগল আমলে বিদেশ থেকে হাতির দাঁত, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধি, সিল্ক ও রেশম আমদানি করা হতো আর ভারতবর্ষ থেকে নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী যেমন সূতীবস্ত্র, মসলিন, চিনি, নীল, আফিম ইত্যাদি রপ্তানি করে প্রচুর অর্থ আয় করা হতো। সুরাট, মসলি পট্টম, বোম্বাই, চট্টগ্রাম, কালিকট প্রভৃতি মোগল আমলের বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর ছিল। মোগল আমলে মুদ্রার প্রচলন ছিল। তবে কিছু কিছু সুবাহতে মুদ্রার পাশাপাশি কড়ি নামক একধরনের বিনিময়ের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহৃত হত।

মোগল শাসনামলে সাম্রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। জনসাধারণ প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। মোগল বাদশাহগণ তাদের রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি জমিতে পানি দেয়ার জন্য খাল খনন, পুরানো খাল সংস্কার প্রভৃতি কৃষি সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বাংলা-বিহারে ধান ও ইক্ষু এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কার্পাস, পশম ও তামাক উৎপন্ন হতো। তাছাড়া গম, বার্লি, যব ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো।

মোগল আমলে মানুষের আর্থিক অবস্থা

মোগল যুগে সাম্রাজ্যের ধন-সম্পদ উচ্চশ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও জনসাধারণের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বণিক ও ব্যবসায়ী সমন্বয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এ আমলে রাজদরবার জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পের মধ্যে সুবাহ বাঙালার মসলিন বস্ত্র বিশ্বের সর্বত্র সমাদৃত হতো।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল আমলের কৃষি ও অর্থনীতির উপর একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সারাংশ

মোগল আমলে কৃষি রাষ্ট্রের প্রধান আয়ের উৎস ছিল। তখন কৃষিপণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর দাম কম ছিল। এ আমলে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। ফলে জনসাধারণের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গুলবদন বেগম রচিত গ্রন্থের নাম কী?
ক) *বাবর নামা* খ) *হুমায়ুন নামা* গ) *আইন-ই-আকবরী* ঘ) *তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী*

২। মোগল আমলে জনগণের প্রধান জীবিকা কী ছিল?
ক) কৃষি খ) ব্যবসা বাণিজ্য গ) শিল্প ঘ) খনিজ সম্পদ

৩। মোগল আমলে রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল–
ক) ব্যবসা-বাণিজ্য খ) শিল্প গ) কৃষি ঘ) খনিজ সম্পদ

৪। সুবাহ বাংলায় শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় কত মন চাল বিক্রয় হতো?
ক) ৫/৬ খ) ৬/৭ গ) ৭/৮ ঘ) ৮/৯

৫। আকবরের আমলে টাকায় গম বিক্রয় হতো–
ক) ১৫ মন খ) ১৭ মন গ) ১৮ মন ঘ) ২০ মন

৬। "মসলিন বস্ত্র" ভারত বর্ষের কোথায় উৎপাদিত হতো?
ক) মাদ্রাজে খ) বাংলায় গ) বিহারে ঘ) উড়িষ্যায়

৭। মোগল আমলের অর্থনীতির তথ্য পাওয়া যায়–
i. সমকালীন ফার্সি সাহিত্যে
ii. ইউরোপিয় পর্যটকদের বিবরণীতে
iii. *বাবর নামা*, *হুমায়ুন নামা*, *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৯ মোগল যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল যুগের সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিতে পারবেন।
- মোগল যুগের ধর্মীয় সম্প্রিতী ও সহঅবস্থানের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মোগল যুগের শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্পকলার উন্নতির উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আমীর উমরাহ, সামন্ত, কারিগর , শিল্পী

জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মধ্য এশিয়ার ফারগানা রাজ্য থেকে এসে ভারতবর্ষে মোগল শাসনের সূত্রপাত করেন। পরবর্তীতে তার উত্তরসূরীরা সময়ের পরিক্রমায় সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী একটি সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে তুলে। এ সময়ে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাহিত্য ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নতি সন্বিত হয়। নিম্নে মোগল যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় সম্প্রিতী, শিক্ষা ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

সামাজিক অবস্থা: মোগল যুগে ভারতীয় সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সমাজ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চবিত্ত অভিজাত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বা সাধারণ শ্রেণি। সম্রাট ছিলেন সমাজের প্রধান। সাম্রাজ্যের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন

অভিজাত শ্রেণিভুক্ত। সম্রাটের দরবারের আমীর, উমরাহ ও মন্ত্রীগণসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণির জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল। অভিজাত শ্রেণি সম্রাটের অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। তারা সম্রাটের নিকট থেকে জায়গীর লাভ করতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল ভারতে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এর প্রভাবে সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণীর মধ্যে ছিল ব্যবসায়ী, কারিগর, শিল্পী, দোকানদার, চিকিৎসকে লেখক প্রমূখ পেশাজীবী শ্রেণী। তারা অভিজাতদের ন্যায় জামজমকপূর্ণ জীবনযাপন করতেন না। তারা অভিজাত শ্রেণি বা ব্যবসায়ীদের স্তরে সমকক্ষ সামাজিক মর্যাদায় ছিল না। সমাজ জীবনের নিম্নস্তরে ছিল কৃষক ও মজুর শ্রেণি। এরা সংখ্যায় অধিক হলেও সামাজিক কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। কায়িক শ্রমই ছিল তাদের জীবিকার অন্যতম অবলম্বন অর্থ কষ্টে তাদের দিন অতিবাহিত হতো।

মোগল সম্রাটরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও এ সময়ে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে সমান মর্যাদায় দেখা হতো। মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুরাও এ সময় ভারতবর্ষে অন্যতম ধর্ম। কিন্তু মোগলদের উদার নীতির ফলে মোগলযুগে ভারতীয় সমাজে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে হিন্দুদের স্বাধীনতা ছিল। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল। তদানিন্তন হিন্দু সমাজে সতীদাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কারও প্রচলিত ছিল। মোগল আমলে সাধারণ নারীদের অবস্থা উন্নত ছিল না। সমাজে নারীদের অগ্রগতির পথে অনেক বাধা ছিল। অভিজাত শ্রেণি হারেম রাখত এবং হারেমে বহু দাসী ও পরিচারিকা নিয়োগ করা হতো। এ আমলে নারী পুরুষ উভয়ই স্বর্ণ ব্যবহার করত। চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত, দাবা, পাশা খেলা, পোলো, রথ দৌড়, সাঁতার ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষা: শিক্ষা ক্ষেত্রে মোগল শাসনামল ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মোগল সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, টোল, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট আকবর ছিলেন বিশেষ শিক্ষানুরাগী। তার সময়ে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হয়। জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙ্গজেবও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। মোঘল বাদশাহদের পাশাপাশি স্থানীয় শাসক ও জমিদারগণ শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ সময়ে আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দেয়া হতো। মোগল আমলে রাষ্ট্র ভাষা ছিল ফার্সি।

সাহিত্য: মোগল যুগ ছিল সাহিত্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গৌরবময়। মোগল সম্রাটগণ অনেকেই সুসাহিত্যিক ছিলেন। সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধশালী হয়। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও এ যুগ ছিল উল্লেখযোগ্য। মোগল সম্রাটদের প্রত্যেকে সাহিত্য অনুরাগী ছিরেন। তাদের অনেকেই সাহিত্য রচনাও করেছেন। মোগল আমলে ফার্সি সাহিত্যের পাশাপাশি স্থানীয় হিন্দুস্থানী সাহিত্য এবং বাংলা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। মোগল বাদশাহ ও সুবাহদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসিতে অনুবাদ করা হয়। এ সময়ে উর্দু সাহিত্যও উৎকর্ষ লাভ করে।

ধর্মীয় জীবন: মোগল আমলে ধর্মীয় উদারতা বিদ্যমান ছিল। মোগল সম্রাট আকবর দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত চালু করেন। সাময়িক সুফল পেলেও সুন্নী মুসলমানরা আকবরের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। সমাজে হিন্দু মুসলিম ছাড়া শিখ ধর্মাবলম্বীরা প্রধান ছিলেন। ষোড়শ শতকের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব সপ্তদশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত। এ সময় মুযাদ্দিদ-ই-আলফে সানী নামক ধর্মীয় নেতা ইসলাম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। মোগল আমলে অনেক বিখ্যাত মসজিদ নির্মিত হয়। দিল্লির মতি মসজিদ, জামে মসজিদ আজও মোগল কীর্তি বহন করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল যুগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন নিয়ে একটি আলোচনা সভা আয়োজন করবেন।

সারাংশ

মোগল সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। সম্রাট ছিলেন এ সমাজ ব্যবস্থার প্রধান। এ সমাজে তিন শ্রেণির লোক বাস করতেন এবং এদের মধ্যে সম্প্রীতি বিরাজমান ছিল। শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে মোগল যুগের অবদান অবিস্মরণীয়। ফার্সি সাহিত্যের পাশপাশি ভারতের স্থানীয় সাহিত্যও এ যুগে উৎকর্ষ লাভ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোগল যুগের সমাজ ব্যবস্থা কত শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২। সম্রাটের নিকট থেকে জায়গীর লাভ করত কোন শ্রেণির লোকেরা?
ক) মধ্যবিত্ত খ) নিম্নবিত্ত গ) অভিযাত ঘ) সাধারণ শ্রেণির

৩। কৃষক ও মজুরেরা কোন শ্রেণিভুক্ত ছিল?
ক) অভিযাত খ) নিম্নবিত্ত গ) মধ্যবিত্ত ঘ) সাধারণ শ্রেণি

৪। মোগল আমলের রাষ্ট্র ভাষা ছিল কী?
ক) ফার্সি খ) আরবি গ) উর্দু ঘ) বাংলা

৫। বৈষ্ণব সাহিত্য কোন ভাষায় রচিত?
ক) আরবি খ) ফার্সি গ) বাংলা ঘ) উর্দু

সৃজনশীল প্রশ্ন

কৃষ্ণপদ সনাতন ধর্মের অনুসারী। তার সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছাড়াও বহুবিধ ধর্মীয় কুসংস্কার প্রচলিত। তার বোন হরিদাসির বিয়ে হয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাথে। বিয়ের কিছুদিন পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরলোক গমন করলে হরিদাসির পিতা জীবনদাস একমাত্র কন্যাকে স্বামীর চিতায় দাহ না করায় তাদেরকে সমাজ চ্যুত করা হয় এবং এলাকা থেকেও বিতাড়িত করা হয়।

ক. কোন সম্রাটের সময় বৈষ্ণব সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করে? ১
খ. সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কাকে বলে? ২
গ. উদ্দীপকের সমাজ ব্যবস্থার সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোন আমলের সমাজ ব্যবস্থার সাদৃশ্য পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমাজে "জাতিভেদ প্রথা" প্রচলিত ছিল।" পাঠ্য পুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

পাঠ-৩.১০ মোগল আমলের স্থাপত্য কলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল সম্রাটের নির্মিত স্থাপত্য কর্মগুলোর পরিচয় দিতে পারবেন।
- মোগল স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মোগল সম্রাটদের স্থাপত্য শিল্পে অবদানের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দীন-পানাহ, ফতেহাবাদ, দুর্গ, সৌধ, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচ মহল

মোগল সম্রাটগণ স্থাপত্য শিল্পের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল স্থাপত্য ভারতবর্ষে মুসলিমদের আগমনের পর থেকে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে একটি নতুন স্থাপত্য ঘরানার জন্ম হয়। সুলতানী আমলের বিভিন্ন স্থাপত্যকর্মে এ ধারার স্থাপত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটিত হয়েছিল। পরবর্তীতে মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে এবং পূর্নাঙ্গ রুপ ধারণ করে। শুরুতে মোগল স্থাপত্য রীতিতে পারসিক প্রভাব লক্ষ করা গেলেও সম্রাট আকবরের স্থাপত্য কর্মগুলোতে ভারতীয় প্রভাব প্রাধান্য পায়। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সম্রাটদের সময় নির্মিত স্থাপত্যের বর্ণনা দেয়া হলো।

বাবরের সময়ের স্থাপত্যসমূহ: সম্রাট বাবর কেবলমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, তিনি স্থাপত্য শিল্পের ও একজন অগ্রপথিক ছিলেন। তাঁর সময়ে আগ্রায় পানিপথের কাবুলিবাগ নামক স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়।

হুমায়ুনের সময় স্থাপত্যসমূহ: হুমায়ুনের আমলে দিল্লিতে দীন-পানাহ ভবন, আগ্রায় ও ফতেহাবাদে নির্মিত মসজিদ তাঁর সময় কালের স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন।

আকবরের সময়ের স্থাপত্যসমূহ: শিল্প ও স্থাপত্যের বিশেষ অনুরাগী আকবরের আমলে পারসিক ও ভারতীয় স্থাপত্য রীতির সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর আমলের স্থাপত্য শিল্পে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত লাল পাথরের বিশেষ ব্যবহার এবং দ্বিতীয়ত ইমারতের বৃহদায়তন। আকবরের আমলে নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ ও সৌধগুলোর মধ্যে ফতেহপুর সিক্রি, হুমায়ুনের সমাধি, ইবাদতখানা, বুলন্দ দরওয়াজা, পাঁচ মহল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সিকান্দ্রায় নির্মিত অপূর্ব সমাধি সৌধটির পরিকল্পনা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হয়েছিল। ফতেহপুর সিক্রির জামে মসজিদ শেখ সেলিম চিশতির সমাধি ও বুলন্দ দরওয়াজা আজও সকলের বিস্ময় উদ্রেক করে।

জাহাঙ্গীরের ভূমিকা: সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে আকবরের সমাধি সৌধ, ইতমাতুদ্দৌলার সমাধি সৌধ এবং তাঁর নিজের জন্য নির্মিত সমাধি সৌধের নাম উল্লেখ করা যায়। শ্বেত পাথরের ব্যবহার এই সময়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শাহজাহানের সময় কালের স্থাপত্যসমূহ: স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে মোগল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহান ছিলেন অদ্বিতীয়। স্থাপত্য শিল্পে উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাঁর সময়কালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তিনি তাঁর স্ত্রী মমতাজ মহলের সমাধির উপর অবিনশ্বর প্রেমের এক অনিন্দ্য সুন্দর সৌধ তাজমহল নির্মাণ করেন। তাঁর আমলে আগ্রার মতি মসজিদ, দিল্লির জামে মসজিদ, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস নির্মিত হয়। দিওয়ান-ই-খাসের অপূর্ব নির্মাণ শৈলী এবং শিল্পকর্মের চমৎকারিত্যের জন্য এটি 'দুনিয়ার বেহেস্ত' বলে অভিহিত। ভুবন বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন মনি-মুক্তা, হীরা ও মূল্যবান পাথর দিয়ে তৈরি। ময়ূর সিংহাসন সম্রাট শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অন্যতম কীর্তি। তিনি 'শাহজাহানাবাদ' নামে একটি নতুন শহরও নির্মাণ করেন যা বর্তমানে নতুন দিল্লি নামে পরিচিত। লাহোরে অবস্থিত সালিমার উদ্যান সম্রাটের স্থাপত্য রুচির অপরূপ নিদর্শন।

আওরঙ্গজেবের সময়ের স্থাপত্যসমূহ: সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে নির্মিত লাহোরের বাদশাহী মসজিদ স্থাপত্য শিল্পের এক বিশেষ নিদর্শন। তিনি দিল্লির দুর্গের ভিতরও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি চিত্রকলার প্রতিও মোগলদের অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। পারসিক প্রভাবে উদ্ভূত মোগল মিনিয়েচার ছিল অনন্য চিত্ররীতি। মিনিয়েচারগুলোতে দৃশ্যকল্প চিত্রায়ন, জলরঙের ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কালক্রমে ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব এটিতে সংমিশ্রিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এটি ইউরোপিয় শিল্প রীতির সংমিশ্রণে উৎকর্ষ সাধন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল আমলের স্থাপত্য কলার উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

মোগল যুগে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়। প্রায় সব মোগল সম্রাট স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আকর্ষণীয় সৌধ, ইমারত, মসজিদ, উদ্যান এমনকি ময়ূর সিংহাসন মোগলদের কীর্তির অবিনশ্বর স্বাক্ষর বহন করে। মোগল যুগে চিত্রশিল্পও বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "দীন পানাহ" ভবন কোথায় অবস্থিত?

ক) দিল্লিতে খ) আগ্রায় গ) লাহোরে ঘ) ফতেহপুর সিক্রিতে

২। পানি পথের কাবুলিবাগে মসজিদ নির্মাণ করেন কে?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৩। "বুলন্দ দরওয়াজা" কে নির্মাণ করেন?
ক) বাবর খ) হুমায়ুন গ) আকবর ঘ) জাহাঙ্গীর

৪। কোন সম্রাটের শাসনকালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। "দুনিয়ার বেহেস্ত" নামে অভিহিত কোনটি?
ক) দিউয়ান-ই-খাস খ) দিউয়ান-ই-আম গ) আগ্রার মতি মসজিদ ঘ) দিল্লির জামে মসজিদ

৬। ভূবন বিখ্যাত ময়ুর সিংহাসন ছিল–
i. মনি, মুক্তা, হিরার তৈরি
ii. মূল্যবান পাথরের তৈরি
iii. শাহজাহানের শিল্পানুরাগের অন্যতম কীর্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১১ মোগল সাম্রাজ্যের পতন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোগল সাম্রাজ্য পতনের অভ্যন্তরীণ কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মোগল সাম্রাজ্য পতনে বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	পরারাষ্ট্রনীতি, কোন্দল, বিরোধ

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জহিরউদ্দিন বাবর কর্তৃক ভারতবর্ষে মোগল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে তার উত্তরসূরীরা এটিকে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে রুপান্তরিত করে। বাবর থেকে আওরঙ্গজেব অর্থাৎ ১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল শাসন ছিল স্বর্ণযুগের শাসন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল শাসনের পতনে প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর ইংরেজ কর্তৃক নির্বাসিত হলে মোগল শাসনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি হয়। তাই ১৭০৭ থেকে ১৮৫৭ সময় কালকে (প্রায় দেড়শ বছর) মোগল বংশের পতনের যুগ বলা হয়। সামগ্রিকভাবে মোগল সাম্রাজ্য পতনের জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বহিঃআক্রমন প্রভৃতি বিষয়কে দায়ী করা হয়।

১. **দুর্বল শাসন:** মোগল সাম্রাজ্য আকারে এবং আয়তনে বিশাল ছিল। তাই রাজ্য শাসনের জন্য ছিল যোগ্য শাসকের প্রয়োজন। কিন্তু আওরঙ্গজেব পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন অযোগ্য। তাই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করার মতো কোনো ক্ষমতা এবং যোগ্যতা তাদের ছিল না।

২. **সুনির্দিষ্ট উত্তরাধিকার নীতির অভাব:** মোগল সিংহাসনে আরোহণের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। কাজেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে মোগল যুবরাজদের নিজেদের আত্মঘাতী সংগ্রাম কেন্দ্রীয় শক্তি এবং ঐক্য নষ্ট করে। মোগল সাম্রাজ্য পতনের এটি অন্যতম প্রধান কারণ।

৩. **অভিজাতদের দুর্বলতা:** অভিজাত সম্প্রদায় এককালে মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজেদের জীবনকে বাজী রেখে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল। পরবর্তী কালে তারা বিলাসপ্রিয় এবং কোন্দল পরায়ণ হয়ে পড়লে সাম্রাজ্যের ভিত ও সংহতি বিনষ্ট হয়।

৪. **সামরিক শক্তির দুর্বলতা:** সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে সামরিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী মোগল শাসকদের সময়ে সামরিক শক্তি অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে মোগলদের বিশাল সামরিক বাহিনী গঠিত হয়েছিল। দুর্বল শাসকদের আমলে সেনাবাহিনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিলাসিতা ও চারিত্রিক অবনতির ফলে সেনাবাহিনীর সামরিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। মোগলদের নৌশক্তির দুর্বলতা সাম্রাজ্যের পতন অন্যতম কারন।

৫. **আর্থিক সংকট:** মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক ও সামরিক সেনাবাহিনী পোষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো। তাছাড়া আওরঙ্গজেবের দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ পরিচালনা করলে আর্থিক সংকট দেখা দেয়। পরবর্তী শাসকদের আমলে আয়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে যায়। তাই আর্থিক দুরবস্থা সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৬. **আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে অবস্থান:** আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ সময় অবস্থানের ফলে রাজধানী থেকে তাঁর অনুপস্থিতি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থাকে অনেক দিক থেকে দুর্বল করে দেয়। ফলে এ সময়ে উত্তর ভারতে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যা সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করে।

৭. **বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ:** আওরঙ্গজেবের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে মারাঠা, শিখ, জাঠ, রাজপুতদের বিরোধিতা ও বিদ্রোহ মোগল শক্তি ও সংহতি বিনষ্ট করে।

৮. **প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা:** কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগ দূরবর্তী প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের সংহতি হুমকির সম্মুখিন হয়।

৯. **জাতীয়তাবোধের অভাব:** মোগল সম্রাটগণ ভারতবর্ষের জনগণকে কোনো একক জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন নি। তাই অভিন্ন জাতীয়তাবোধের অভাবে বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখা দেয়।

১০. **বিদেশি শক্তির আক্রমণ:** পারস্য সম্রাট নাদিরশাহ এবং পরবর্তীকালে আফগান রাজা আহমদ শাহ আবদালীর দিল্লি আক্রমণ ও লুণ্ঠনে মোগল সাম্রাজ্য দুর্দশায় ও পতনুম্মুখ হয়ে পড়ে। এমনি মুমূর্ষ অবস্থায় ইংরেজ শক্তির ক্ষমতা দখল করার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়ার কারণে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে রেঙ্গুনে (বার্মা) নির্বাসিত করেন। বাহাদুর শাহের নির্বাসনের মধ্য দিয়ে ভারতে মোগল শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মোগল সাম্রাজ্যের পতন নিয়ে একটি বিতর্ক সভা আয়োজন করবেন।

সারাংশ

মোগল সাম্রাজ্য আকারে এবং আয়তনে বিশাল ছিল। এমনি সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যোগ্য শাসকের প্রয়োজন। অথচ সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ দুর্বল, বিলাস প্রিয় ছিলেন। এই কারণ ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মোগল বংশের শেষ সম্রাট কে?

ক) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ খ) শাহ আলম গ) মুহাম্মদ শাহ ঘ) ফররুখশিয়ার

২। কত খ্রিস্টাব্দে মোগল শাসনের চির অবসান ঘটে?
ক) ১৮৫৬ খ) ১৮৫৭ গ) ১৮৫৮ ঘ) ১৮৫৯

৩। নাদির শাহ সম্রাট ছিলেন–
ক) আফগানিস্তানের খ) তুরস্কের গ) পারস্যের ঘ) মিশরের

৪। কোন আফগান রাজা দিল্লি আক্রমন ও লুণ্ঠন করেন?
ক) রেজাশাহ খ) নাদির শাহ গ) দোস্ত মোহাম্মদ ঘ) আহমদ শাহ আবদালী

৫। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?
ক) রেঙ্গুন (বার্মা) খ) শ্রীলংকায় গ) মালদ্বীপে ঘ) অস্ট্রেলিয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিমখান পিতৃ সিংহাসন উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীতে অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে এক নতুন রাজ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তার মৃত্যুর পর উত্তরসুরীরা প্রায় দুইশত বছর শৌর্য-বীর্যের সাথে রাজ্য শাসন করলেও পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের দুর্বল শাসন, সামরিক বাহিনীর দুর্বলতা, আর্থিক সংকট, প্রাদেশিক শাসকদের স্বাধীনতা ঘোষণা, বিভিন্ন জাতির বিদ্রোহ সর্বোপরি বিদেশি শক্তির আক্রমনে করিমখানের প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশের শাসনের অবসান ঘটে।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১
খ. ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচয় দিন। ২
গ. উদ্দীপকের রাজবংশ পতনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে রাজ বংশের পতনের সাদৃশ্য পাওয়া যায় তার পতনের কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত রাজ বংশ পতনে দুর্বল উত্তরাধিকারীদের ভূমিকা নিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ক ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১। গ ২। গ ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ ঃ ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। গ ৬। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। গ ৪। খ ৫। খ ৬। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ক ৮। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। খ ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। ক ৬। খ ৭। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ ঃ ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। গ ৫। ক ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক

বাংলায় মোগল শাসন

ইউনিট ৪

ভূমিকা

সম্রাট আকবরের সময় মোগলরা বাংলায় তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। তাঁর রাজত্বকালে মোগলরা বাংলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সমগ্র বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন পরবর্তী সম্রাট জাহাঙ্গীর। বাংলায় মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার স্থানীয় স্বাধীন জমিদারগণ রুখে দাঁড়িয়েছিল। ইতিহাসে তাঁরা বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সামরিক দক্ষতা ও প্রচেষ্টায় মোগল বাহিনী এই স্বাধীনচেতা বার ভূঁইয়াদের দমন করতে সক্ষম হন। এরপর প্রায় দীর্ঘ একশ বছর বাংলা সর্বভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। যার প্রভাব বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মীয় জীবন, অর্থনীতি, স্থাপত্য সকল ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়। এই ইউনিটে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মোগল আমলে বাংলার প্রশাসন, সমাজ, স্থাপত্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ বাংলায় বার ভূঁইয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার বার ভূঁইয়াদের পরিচয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বার ভূঁইয়ারা কোনো কোনো এলাকায় স্বাধীন রাজত্ব করেছে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসাখান মসনদে আলার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মোগলদের বিরুদ্ধে বার ভূঁইয়াদের সংগ্রামের বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভাটি অঞ্চল, ত্রিপুরা রাজ্য, ভাওয়াল, কাত্রাবো, বাজিতপুর

কররানি বংশের শেষ শাসক দাউদ কররানির মৃত্যুর পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আফগান জমিদার, হিন্দু সামন্ত প্রধান, স্থানীয় জমিদার এবং ভূঁইয়ারা স্বাধীনভাবে শাসন করছিল। এই স্থানীয় শাসকবর্গ মোগল কেন্দ্রীয় শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সম্রাট আকবরের সময়ের ঐতিহাসিক আবুল ফযল বলেছিলেন ভাটির ভূঁইয়ারাই মোগলদের বাংলা জয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ইতিহাসে এই ভূঁইয়ারা বার ভূঁইয়া নামে পরিচিত। ভাটি বলতে যে অঞ্চল বোঝায় তার সীমানা হলো পশ্চিমে ইছামতি নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য এবং উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ উত্তর-পূর্বে সিলেটের বানিয়াচংগ। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিনটি বড় নদী ও তাদের শাখা প্রশাখা বেষ্টিত ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও ত্রিপুরার নিম্নাঞ্চল নিয়েই ভাটি অঞ্চল। সম্রাট আকবরের সময়ের বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন সোনারগাঁও এর জমিদার ঈসাখান মসনদে আলা। এ সময়ের অনান্য ভূইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদ রায় ও কেদার রায়; ভাওয়ালের গাজী পরিবার, যশোরের প্রতাপাদিত্য, বাকলার কন্দর্প নারায়ণ, ফতেহবাদের মুরাদ খান, বুকাইনগরে খাজা ওসমান ও ভুলুয়ার লক্ষণ মানিক্য এরা সকলেই সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় মোগল আগ্রাসনকে রুখে দিয়েছিলেন। ভাটির জমিদারদের মধ্যে ঈসাখান ও তার ছেলে মুসাখান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৫৭৬ এ রাজমহলের যুদ্ধের পর বাংলার আফগান শাসনের সমাপ্তি হলেও ঈসাখান ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একা সাম্রাজ্যবাদী মোগলদের বিরুদ্ধে জয় লাভ করতে পারবেন না। তাই তিনি পার্শ্ববর্তী অন্যান্য জমিদার ও আফগান দলপতিদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক ও সামরিক মৈত্রী তৈরি করেন। ঈসাখানের নেতৃত্বে এই সামরিক শক্তির প্রধান অবলম্বন ছিল তাদের যুদ্ধ রণতরী। ১৫৭৮ সালে বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কাস্তলে ঈসাখানের সাথে মোগলদের যুদ্ধ হয়। প্রাথমিক প্রর্যায়ে ঈসাখান হেরে গেলেও পরবর্তীতে সম্মিলিত শক্তির কাছে মোগলরা পরাজিত হয়। ১৫৮৩ ও ১৫৮৪ খিস্টাব্দেও ঈসাখান আগ্রাসী সৈন্যবাহিনীকে যথাক্রমে বাজিতপুরে ও কাত্রাবোতে পরাস্ত করেন। ১৫৮৬ সালেও মোগলরা ঈসাখানকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন। ঈসাখানের সাথে মোঘল বাহিনীর শেষ যুদ্ধ হয় রাজা মানসিংহের নেতৃত্বে। এই যুদ্ধেও মোগলরা তাঁর কাছে পরাজিত হন এবং অনেক মোগল সৈন্য বন্দি হন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈসাখান মৃত্যুবরণ করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে মির্জা নাথানের লেখা *বাহারীস্তান ই গায়েবী* গ্রন্থে সতের শতকের প্রথম দশকে ভাটি অঞ্চলে স্বাধীন জমিদারদের যে তালিকা পাওয়া যায় এ মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হিসেবে বলা হয় মুসা খান 'মসনদ-ই-আলা'কে। ১৫৯৯ সালে তিনি জমিদার হন। তার রাজ্যসীমা ছিল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ, ত্রিপুরার কিছু অংশ এবং সুসঙ্গ ছাড়া ময়মনসিংহের সম্পূর্ণ এলাকা। এসময়ের আরেকজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। তাঁর রাজ্যের পরিধি বর্তমান যশোর, খুলনা ও বাখেরগঞ্জ জেলা নিয়েছিল। তার রাজ্য পশ্চিম দিকে ভাগিরথী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ ছাড়াও সিলেট এলাকায় বায়জিদ কররানি ও তার অধীনস্থ আফগানদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। এ সময় ভুলুয়া রাজ্য ছিল রাজা অনন্ত মানিক্যের নিয়ন্ত্রণে। এই রাজ্যটির অবস্থান বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী। বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনোয়ার গাজীও ছিলেন স্বাধীন জমিদারদের মধ্যে একজন।

মোগল সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই জমিদারগণ ছিলেন স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক। যদিও তারা কোনো রাজবংশের সন্তান ছিলেন না তা সত্বেও তারা বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে প্রায় তিন দশক সময়কাল মোগল আক্রমণ সফল হতে দেন নি। ভাঁটি অঞ্চলের স্থানীয় জমিদারদের বশ্যতা স্বীকার করানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় মোগলদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায়। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে মোঘলদের জয়লাভের পর আকবরনগর (রাজমহল) এ মোগল সুবাহ বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বারো ভূঁইয়াদের স্বাধীন থাকার সংগ্রামকে মোগলরা নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়েছিল ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় সুবাহদার ইসলাম খান চিশতীর সামরিক দক্ষতা ও কুটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে মোগলরা বারো ভুঁইয়াদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং সমগ্র বাংলায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাহরিস্তান ই গায়েবী বইটির অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়ার চেষ্টা করবে।

সারাংশ

মোগল সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনচেতা জমিদারগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। তারা কোনো রাজবংশের সন্তান না হয়েও বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে প্রায় তিন দশক মোগল আক্রমণ সফল হয় নি তাদের কারণেই। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের ইসলাম খান চিশতীর সামরিক দক্ষতা ও কুটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে মোগলরা বারো ভুঁইয়াদের দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোগল সাম্রাজ্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা ও দেশপ্রেমিক ছিলেন কারা?
ক) জমিদারগণ খ) সৈনিকগণ গ) নেতাগণ ঘ) সাধারণ জনগণ

২। কোন যুদ্ধের পর বাংলার আফগান শাসনের সমাপ্তি ঘটে?
ক) রাজমহলের যুদ্ধ খ) বক্সারের যুদ্ধ গ) চৌসার যুদ্ধ ঘ) পানিপথের যুদ্ধ

৩। কিশোরগঞ্জ জেলার কাস্তলে ঈসা খানের সাথে কাদের যুদ্ধ হয়?
ক) পর্তুগিজদের খ) মোগলদের গ) ইংরেজদের ঘ) ফরাসিদের

৪। কররানি বংশের শেষ শাসক কে ছিলেন?
ক) দাউদ কররানি খ) ইসমাঈল কররানি গ) সুলেমান কররানি ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। *বাহারীস্তান ই গায়েবী কে লিখেছেন?*
ক) আবুল ফজল খ) মির্জা বুরহান গ) মির্জা কামরান ঘ) মির্জা নাথান

সৃজনশীল প্রশ্ন

সম্পদে পরিপূর্ণ একটি দেশে হঠাৎ রাজনৈতিক ক্ষমতার বদল হয়। দেশের শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজা অন্য রাজ্যের রাজার কাছে পরাজয় মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সম্পদে পরিপূর্ণ ঐ দেশের নানা স্থানে বিদ্রোহ করে বসেন ক্ষমতাধর কয়েকজন জমিদার। তারা বিজয়ী রাজ্যের রাজার পক্ষে দেশটির দখল নেয়া প্রায় অসম্ভব করে দেয়। উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

ক. বার ভূঁইয়া কারা? ১
খ. মোগলদের সঙ্গে বার ভূঁইয়াদের সংঘাতের কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশের সঙ্গে কিভাবে বার ভূঁইয়াদের সম্পৃক্ত করা যায়। ৩
ঘ. বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসাখান মসনদে আলা কতটুকু সফল ছিলেন? ৪

পাঠ-৪.২ বাংলায় মোগল সুবাহ প্রতিষ্ঠা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্রাট আকবরের সময় বাংলায় মোগলদের রাজ্য কতটুকু বিস্তার হলো তা বলতে পারবেন।
- সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় মোগলরা সম্পূর্ণ বাংলায় কীভাবে রাজ্য বিস্তার করেছিল বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবাহদার ইসলাম খান চিশতীর সামরিক সাফল্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	শাহবাজ খান, সাদিক খান, উজির খান, সাইদ খান, রাজা মানসিংহ

মোগল সম্রাট আকবর সর্বভারতীয় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় ১৫৭২ সালে আকবর সেনাপতি মুনিম খানের নেতৃত্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এই অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৭৫ সালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তুকারয়ে মোগল বাহিনীর সাথে বাংলার শাসক দাউদ কররানির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে এবং ১৫৭৫ এ কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও বিহারে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু বাংলায় কররানি শাসনের চুড়ান্ত অবসান হয় ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে মোগল বাহিনীর জয় লাভের মাধ্যমে। এ সময় বাংলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল মোগলদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আকবরের সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহবাজ খান, সাদিক খান, উজির খান, সাইদ খান এবং রাজা মানসিংহ। এরা সকলেই পূর্ব-বাংলার স্বাধীন জমিদারদের বিরুদ্ধে একাধিক যুদ্ধ পরিচালনা করেও ব্যর্থ হন। ফলে সম্রাট আকবরের সময় বাংলার পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তরাংশে মোগলরা আধিপত্য বিস্তার করলেও বাংলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্বাংশের বিশাল এলাকা স্বাধীন স্থানীয় শাসকদের হাতে ছিল। এ সময়ের সুবাহ বাঙলার বিস্তৃতি সমগ্র বাংলা ব্যাপী ছিল না; বাংলার পশ্চিম, উত্তর পশ্চিম ও উত্তরাংশ নিয়ে গঠিত সুবাহ শাসিত হত আকবরনগর (রাজমহল) রাজধানী থেকে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন কোকাকে বাংলার সুবাহদার নিয়োগ দেন। তিনি বর্ধমানে বিদ্রোহী ফৌজদার আলী কুলীকে দমন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এর পর জাহাঙ্গীর বিহারের সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। ১৬০৮ সালে সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খানের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীর বিখ্যাত সুফি সেলিম চিশতীর দৌহিত্র ইসলাম খান চিশতী বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেন। ইসলাম খান তখন বিহারের সুবাদার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তিনি পূর্ববাংলার ভুঁইয়াদের দমন করার জন্য কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তার পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ:

ক. সমগ্র বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার।
খ. মোগল আধিপত্যের প্রধান শত্রু ভাটি অঞ্চলের বার ভূঁইয়াদের নিয়ন্ত্রণ করা।
গ. ভাটি অঞ্চলে যুদ্ধের সহায়ক নওয়ারা বা নৌবহরকে শাক্তিশালী করা।
ঘ. রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করা। কেননা রাজমহল সুবাহ বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এটি ভাটি অঞ্চল থেকে অনেক দূরে। এখান থেকে অভিযান পরিচালনা করলে সাফল্যর সম্ভাবনা কম। তাই তিনি বাংলার কেন্দ্রস্থলে এবং যেখান নদী পথে ভাটি অঞ্চলে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন।
ঙ. পূর্ববর্তী দুর্নীতি পরায়ণ বিশ্বাসঘাতক কর্মকর্তাদের পরিবর্তে সৎ যোগ্য সাহসী কর্মকর্তাদের বাংলার প্রশাসনে নিয়োগের জন্য সম্রাটের কাছে প্রস্তাব প্রদান।

ইসলাম খান ১৬০৮ সালে রাজমহল থেকে নদী পথে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন। ১৬১০ সালে তিনি মোগল বাহিনী সহকারে ঢাকায় প্রবেশ করেন এবং ঢাকার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরনগর।

ঢাকায় আসার আগেই সামরিক অভিযান ও কূটনৈতিক পদক্ষেপে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলাকে তিনি শত্রুমুক্ত করেছিলেন। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদার যুদ্ধে পরাস্থ হয়ে সুবাহদারের সাথে সাক্ষাত করে মোগল শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। ভূষনার রাজা শত্রুজিত ও যুদ্ধে পরাস্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

ইসলাম খান ঢাকায় পৌছে ঢাকা দুর্গে অবস্থান নেন। নৌবাহিনীকে মোতায়েন করা হয় 'চাঁদনী ঘাটে' এলাকায়। এ সময় মুসা খানের নেতৃত্বে বার ভুঁইয়ারা শীতলক্ষ্যা নদীকে কেন্দ্র করে মোঘল বাহিনীকে প্রতিহত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। দুই দলের ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ হতে থাকে। ১৬১১ সালে মোগলরা ভূলুয়া জয় করলে বার ভুঁইয়ার মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় মুসা খান উপলব্ধি করেন মোগলদের আধিপত্য মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি সুবাহদারের দরবারে আত্মসমর্পণের জন্য উপস্থিত হলে ইসলাম খান তাকে স সম্মানে গ্রহণ করেন। মুসা খানের পর বাহিনী সিলেটের খাজা উসমান, বায়জীদ কররানি, বাকলার রামচন্দ্র প্রমুখদের পরাজিত করেন এবং বার ভূঁইয়াদেরকে সুবাহদার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ইসলাম খানের প্রচেষ্টায় উত্তরে ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, পাচেট, হিজলী, পশ্চিমে রাজমহল থেকে উত্তর-পূর্বে সিলেট এবং দক্ষিণ পূর্বে ফেনী নদী পর্যন্ত মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও তিনি বাংলার উত্তর, উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী কোচবিহার, কামরুপ ও কাছাড় অঞ্চলে মোগল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

সুবাহদার ইসলাম খানের প্রতিষ্ঠিত সুবাহ বাংলায় পরবর্তী এক শহক মোগল আধিপত্য বজায় ছিল। বাংলার মোগল সুবাহদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাশিম খান জুয়ুনী, শাহ সুজা, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, ইব্রাহীম খান ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ আজিমউদ্দিন। সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় মোঘলরা চট্টগ্রাম বিজয় করে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া শায়েস্তা খানের সময় বাংলায় ইউরোপীয় আধিপত্য ও প্রভাব বলয় বিস্তৃত হয়। তাঁর সময় ঢাকায় প্রচুর স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয় লালবাগ কেল্লা, পরিবিবির সমাধি, ছোট কাটরা, বড় কাটরা ও একাধিক মসজিদ তার সময়ে নির্মিত। শায়েস্তা খানের সময় বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতির শিখরে উঠে। *রিয়াজুস সালাতীন* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী তার সময় টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুবাহ বাংলার উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।

সারাংশ

মোগল সম্রাট আকবর সর্বভারতীয় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা পূর্ণতা পায় জাহাঙ্গীরের আমলে। ১৫৭২ সালে আকবর সেনাপতি মুনিম খানের নেতৃত্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এই অঞ্চলে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ১৫৭৫ সালে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তুকারয়ে মোগল বাহিনীর সাথে বাংলার শাসক দাউদ কররানির যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে এবং ১৫৭৫ এ কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলা ও বিহারে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। তবে বাংলায় মোগলদের আধিপত্য বিস্তারের মূল কৃতিত্ব সুবাদার ইসলাম খানের। সুবাদার ইসলাম খানের প্রতিষ্ঠিত সুবাহ বাংলায় পরবর্তী এক শতক মোগল আধিপত্য বজায় ছিল। বাংলার মোগল সুবাহদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাশিম খান জুয়ুনী, শাহ সুজা, মীর জুমলা, শায়েস্তা খান, ইব্রাহীম খান ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ আজিমউদ্দিন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৫৭২ সালে আকবর তার নেতৃত্বে বাংলা বিহার উড়িষ্যায় অভিযান পরিচালনা করেন?
ক) মুমিন খান খ) সাইদ খান গ) উজির খান ঘ) সাদিক খান

২। বাংলায় মুঘল আধিপত্য বিস্তারের মূল কৃতিত্ব কার?
ক) শাহ সুজা খ) ইসলাম খান গ) ইব্রাহীম খান ঘ) শায়েস্তা খান

৩। পূর্ব বাংলার ভূঁইয়াদের দমনে ইসলাম খানের পরিকল্পনা ছিল–
i. ভাটি অঞ্চলের ভূঁইয়াদের নিয়ন্ত্রন করা
ii. রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তর করা
iii. ভাটি অঞ্চলের নৌবহরকে শক্তিশালী করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ বাংলায় সুবাদারি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার সুবাদারদের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবাদারগণ কীভাবে বাংলায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করেছিলেন তা লিখতে পারবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ সুবাদারদের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব সংস্কার উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দারার খান, মহব্বত খান, মুকাররম খান, ফিতাই খান, কাশিম খান জুয়িনী

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে বার ভুঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৬১৩ সালে ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন সুবাদার বাংলার শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। তবে ১৬৬০ সালে সুবাদার মীর জুমলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোনো সুবাদারই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে ১৬১৩ সাল থেকে ১৬১৭ সাল পর্যন্ত ইসলাম খান চিশতি এবং ১৬১৭ সাল থেকে ১৬২৪ সাল পর্যন্ত দিল্লির সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গ বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর খুব অল্প সময়ের জন্য সুবাদার নিযুক্ত হন দারার খান, মহব্বত খান, মুকাররম খান এবং ফিতাই খান। সম্রাট শাহজাহান মোগল সিংহাসনে আরোহন করার পর বাংলার সুবাদার হিসেবে ১৬২৮ সালে নিয়োগ দেন কাসিম খান জুয়িনিকে। সুলতানি শাসনপর্বে হুসাইন শাহী যুগ থেকে বাংলায় পর্তুগিজরা বাণিজ্য করতো। এ সময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাশিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন।

কাসিম খানের পর সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদি (১৯৩৫-১৬৩৯) চার বছর শাসন করেন। অতঃপর সম্রাট শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুজা কুড়ি বছর দায়িত্বে ছিলেন। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল সুজার শাসনকাল। বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজরা এ সময় সুবাদারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ করেছিল। এতে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ১৬৫৭ সালে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেকেই মোগল সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে। এসময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে ১৬৫৯ সালে শাহসুজা পরাজিত হন।

আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা সুজাকে দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) পর্যন্ত এসেছিলেন। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব মীরজুমলাকে (১৬৬০-১৬৬৩) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। দক্ষ সুবাদার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। মীরজুমলা আসাম ও কুচবিহার মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। মীরজুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলির খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। এরপর আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৮৮) বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। মাঝখানে ১৬৭৮ সালে সম্রাট তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এরপর ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার সুবাদার হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও দূরদর্শী শাসক।

বাংলার জনজীবনের ওপর মারাত্মক হুমকি জলদস্যুদের বিতাড়িত করে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করেন। তিনি ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাত থেকেও বাংলার মানুষদের রক্ষা করেছিলেন। সুবাদারির শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাঁধে। ইংরেজদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে, তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা সুবা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের পর একে একে বাংলার সুবাদার হন খানজাহান বাহাদুর, ইব্রাহীম খান ও আজিমুদ্দিন। তাঁদের সময় বাংলার ইতিহাস তেমন ঘটনাবহুল ছিল না।

দক্ষ সুবাদার হিসেবে এবার বাংলার শাসন ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদকুলী খান (১৭০০-১৭২৭)। প্রথমে তাঁকে বাংলার দিউয়ান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। দিউয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাট ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে মুর্শিদকুলী খান বাংলার সুবাদার পদ দেয়া হয়। এদেশের রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য তিনি খ্যাতিমান হয়ে আছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মোগল সম্রাটগণ দূরবর্তী সুবাগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নি। ফলে এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদকুলী খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পরেন। তিনি নামেমাত্র সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন এবং সম্রাটকে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। মুর্শিদকুলী খানের পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারী বংশগত হয়ে পরে। আর এরই পথ ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন শাসন।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুবাদারগণ কীভাবে বাংলায় পর্তুগিজ জলদস্যুদের দমন করেছিলেন তার উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

বাংলায় মোগল সুবাহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক একে বেশ কয়েকজন সুবাদার দায়িত্ব পালন করেন। তারা সাধারণ শাসন কার্য ছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এর মধ্যে পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ থেকে ঢাকা নগরি রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। দস্যু বিতাড়নেও ভূমিকা রেখেছিলেন। রাজস্ব সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও সুবাদার মীরজুমলা দক্ষতার সাথে করতে পেরেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলাকে প্রেরণ করেন কাকে দমন করার জন্য?
ক) সুজা খ) মুরাদ গ) দারা ঘ) দারাশুকোহ

২। ফররুখ শিয়ারের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার পদ দেয়া হয়–
ক) মুর্শিদকুলী খানকে খ) রুকনউদ্দিনকে গ) ইকবালকে ঘ) সুজাউদ্দিনকে

৩। বাংলার সুবাদারদের কৃতিত্ব হলো–
i. সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গ বাংলার সুবাদার ছিলেন
ii. জলদস্যুদের বিতাড়িত করে শায়েস্তাখান চট্টগ্রাম দখল করেন
iii. কাশিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলায় কীভাবে মুসলিম সমাজের বিস্তার ঘটেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কেন বাংলার সাধারণ মানুষের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মধ্যযুগে বাংলার সাধারণ হিন্দু সমাজ কেমন করে শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মোগলদের প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আরব, সমরখন্দ, গজনী, ফকিরি, দরবেশিয়া, বাউল

আট শতকে আরবের বণিক মোসলমানরা বাংলার সমুদ্র উপকূলীয় কোনো কোনো অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। কিন্তু সে পর্যায়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা তেমন বাড়ে নি। মুসলিম সমাজ বিস্তারের ঘটনাও তেমন ঘটে নি। এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় এগার শতক থেকে। এ সময় আরব, সমরখন্দ, গজনী, আফগানিস্তান থেকে উত্তর ভারত ঘুরে সুফি সাধকদের কেউ কেউ বাংলায় আসতে থাকেন। গ্রাম-গঞ্জে খানকাহ স্থাপন করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। এ পর্যায়ে তাঁরা অনেকটা সফল হন। হিন্দু-বৌদ্ধ ও অন্তঃজ শ্রেণির অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজ বিস্তার লাভ করে। এই গতি ধারা আরও বৃদ্ধি পায় তের শতকের শুরু থেকে। এ সময় বাংলার শাসন ক্ষমতা চলে আসে মুসলমানদের হাতে। রাজ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ধর্ম প্রচারের গতি বৃদ্ধি পায়। ইসলামের সাম্যনীতি, সেই সঙ্গে রাজ অনুগ্রহ লাভের আশা-আশ্বাসে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর অনেকে ধর্মান্তরিত হয়। এভাবে মুসলিম সমাজ ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলমান সুফি সাধকদের এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমনের ফলে ইসলামের সাম্যের বাণী তৎকালীন সাধারণ মানুষ বিশেষত ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার বঞ্চিত নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাই বর্ণ-বৈষম্যের শিকার সাধারণ বাঙালির এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। দিল্লির সুলতানদের প্রেরিত গভর্নর ও বাংলা স্বাধীন সুলতানদের নেতৃত্বে ও অঞ্চলে রাজ্য সম্প্রসারণের মধ্যদিয়ে মুসলিম সমাজ বিস্তার প্রক্রিয়াও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে।

মুসলমানরা আসার পর প্রথম বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা গেল সমাজে দীর্ঘদিন সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এরই পথ ধরে মধ্যযুগের শুরু থেকেই হিন্দু সমাজের অবহেলিত শ্রেণির মধ্যে শিক্ষার প্রসারতা দেখা যেতে পারে। এ যুগে এতকালের বঞ্চিত ও অবহেলিতরা লেখাপড়া করার সমান সুযোগ পায়। শুধু তাই নয় নিম্নশ্রেণির অনেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ধারণা করা যায় রাজ আনুকূল্যের কারণে হিন্দু সমাজ তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা কাটিয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার মতো সামর্থ অর্জন করতে পেরেছিল। এটা সমাজ গঠনের জন্য নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

সুফিবাদ প্রসারে শংকিত এদেশের হিন্দুদের এক বিরাট অংশ নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। তার প্রকাশ বলা চলে শ্রী চৈতন্যের নব্য বৈষ্ণব আন্দোলন। মুসলমানদের ধর্ম ও জীবনের আলোকে হিন্দু সমাজ সংস্কার করে হিন্দু সমাজে ইসলাম প্রচারের পথ বন্ধ করার জন্য বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব হয়। ভক্তিধর্মের অনুসারীরা হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী মূল্যবোধের অনেক কিছু গ্রহণ করে।

প্রজারঞ্জক হিসেবে মোগল সম্রাটদের সুনাম ছিল। তাঁরা প্রজা মঙ্গলের কথা ভাবতেন। প্রদেশের শাসনকর্তা বা সুবাদারদের মনোভাবও ছিল একই ধরনের। এর ফলে মোগল যুগে বাংলার সমাজ আরও সুগঠিত ও সমৃদ্ধ হয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলোতে মানুষের উন্নতির পথ সুগম হয়। এ পর্যায়ে তাই বাঙালির সমাজজীবনে মোগল প্রভাব লক্ষ করা যায়। হিন্দু ধনী ও জমিদার শ্রেণির পোশাক-পরিচ্ছদ বিশেষভাবে পাল্টে যেতে থাকে। তাঁরা পছন্দ করতে থাকেন মোগল পোশাক। জরিদার মুক্তা বসান ঝলমলে পোশাক, সালোয়ার কামিজ শোভা পেতে থাকে এদেশের হিন্দু-মুসলমানের গায়ে। খাওয়া-দাওয়ায়ও কিছুটা পরিবর্তন আসে। বাঙালির মাছ, ভাত আর ব্যাঞ্জনের পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোর্মা, আর

ঘিয়ের রান্না যাবতীয় মোগলাই খাবার জায়গা করে নেয়। মোগলযুগে বাংলার ধনী এবং মধ্যবিত্ত মহিলারাও আকর্ষণীয় পোশাক পরত। কখনো কখনো তাদের বাহন ছিল পালকি। গ্রামের মানুষ সাধারণ পোশাক পরত। পায়ে ব্যবহার করত কাঠের খড়ম। সুলতানি যুগের মতো মোগল আমলের বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক মধুর ছিল। মোগলযুগের শেষ দিকে নবাব মুর্শিদ কুলী খান ও আলীবর্দী খানের সময়ে উত্তর ভারত ও মধ্য এশিয়া থেকে ব্যবসায়ী, কর্মচারী, কবি, চিকিৎসক অনেকেই এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এদের অনেকেই ছিলেন শিয়া মুসলমান। তাদের প্রভাবে বাংলার সমাজে শিয়া আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করে। মহররমের নানা অনুষ্ঠান এসময় জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

মোগল যুগে বাঙালি সমাজে সকল ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারত। তবে ইসলামের প্রভাবে অমুসলিম সমাজের একেশ্বরবাদী ধারণার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। এর আলোকে বাংলার হিন্দু সমাজে কিছুটা পরিবর্তনের ধারা দেখা যায়। সুলতানি যুগ থেকেই শ্রী চৈতন্যের নব্য বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাব হিন্দুদের সামাজিক ধর্মীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। এই প্রভাব মোগল যুগে আরও বৃদ্ধি পায়। ভক্তিবাদ ও সাম্যবাণী মানুষ গ্রহণ করতে থাকে। ফলে ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামীর মূলে আঘাত আসে। সাধারণ হিন্দুরা গোঁড়া হিন্দুদের দেখানো ধর্মের বদলে মনসা, চণ্ডী ও শক্তির পূজায় মনোনিবেশ করে। মোগল যুগে পারস্যের সুফিবাদের সঙ্গে বাংলার ভক্তিবাদ মিশে একটি মিশ্র সুফিবাদের সৃষ্টি করে। এভাবে বাঙালি সমাজে ফকিরি, দরবেশিয়া ও বাউল প্রভৃতি মরমী মতবাদের উৎপত্তি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন

সারাংশ

মধ্যযুগে বাংলায় বিদেশি মুসলমান সুলতান ও মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্বে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও পরিবর্তন আসে। সেনযুগের অবহেলিত নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এতে নতুন মুসলমান সমাজের বিকাশ ঘটে। এই পর্বে হিন্দু সমাজেও শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে রূপান্তর ঘটে। মোগল যুগে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। সকল ক্ষেত্রে মোগল প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। উত্তর ভারত ঘুরে সুফি সাধকরা কোথায় এসেছিলেন?

ক) বাংলা খ) নেপাল

গ) বিহার ঘ) উড়িষ্যা

২। সুলতানি যুগের মতো মোগল আমলের বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক কেমন ছিল?

ক) অস্বাভাবিক খ) কলুষিত

গ) মধুর ঘ) দ্বন্দ্বে ভরা

৩। মধ্যযুগে বাংলার মানুষের বৈশিষ্ট্য ছিল–

i. বাংলার মানুষ অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাস করত

ii. পালকি ছিল গণমানুষের বাহন

iii. বাংলার মানুষের প্রিয় খাবার ছিল কাবাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্প

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সুলতানি যুগের বাংলায় স্থাপত্য কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলায় মধ্যযুগে নির্মিত স্থাপত্যের বিভিন্ন শৈলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সুলতানি বাংলার মসজিদ স্থাপত্য সম্পর্কে উপস্থাপন করতে পারবেন।
- মোগলযুগে নির্মিত নানা বৈচিত্রপূর্ণ স্থাপত্যের বর্ণনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দমালা	মসজিদ, খানকাহ, বেলেপাথর, গ্রানাইট

মধ্যযুগ পর্বে বাংলার স্থাপত্য শিল্পে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছিল। কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যের অধিকাংশই যেমন আমরা খুঁজে পাই না, মধ্যযুগের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় নি। এযুগের স্থাপত্যকলায় গুণগত যে পরিবর্তন এসেছিল তাতে প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেশকিছু সংখ্যক স্থাপত্য টিকে আছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার সংরক্ষণের মধ্যদিয়েও টিকিয়ে রাখা গিয়েছে কিছু সংখ্যক স্থাপত্য।

সুলতানি যুগের প্রতিনিধিত্বশীল স্থাপত্যগুলোর প্রধান উপকরণ ছিল ইট। ইট তৈরির উপযোগী কাদামাটি ছিল এদেশে। ইমারত তৈরির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথরের যোগান কোথাও ছিল না। মালদহ জেলার রাজমহল পাহাড়ে কালো ব্যাসল্ট পাথর পাওয়া গেলেও তা দিয়ে সমগ্র দেশের স্থাপত্য নির্মাণের চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এই পাথর পরিবহনের সহজ সুযোগও ছিল না। কচিৎ কখনো বিহার থেকে বেলেপাথর ও গ্রানাইট পাথর আমদানি করা হতো। তাই বাংলার ইমারতে এ ধরনের নির্মাণ উপকরণের ব্যবহার ছিল সীমিত। ইটের ইমারতে পিলার, সিঁড়ি, মসজিদের মিম্বর, মিহরাব প্রভৃতিতে কখনো কালো ব্যাসল্ট বা বেলেপাথর ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

সুলতানি যুগের ইমারতে ইটের গাঁথুনিতে চুন সুরকির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। মুসলিম যুগের স্থাপত্যের বিশেষ দিক ছিল যে, এসময় ছাদ-গম্বুজ প্রভৃতির পলেস্তরা দেয়ার জন্য চুনের বিশেষ ব্যবহার ছিল। তবে দেয়াল পলেস্তরা দিয়ে ঢেকে দেয়ার পদ্ধতি মোগল যুগের পূর্বে দেখা যায় নি। পনের শতক থেকে বাংলার স্থাপত্যে উজ্জ্বল টালির ব্যবহার বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছিল।

মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্যে ইটের ব্যবহার বাংলার স্থাপত্যকলার মৌলিক ও সর্বজনীন রূপ নয়। প্রধানত শহরাঞ্চলেই ইটের ব্যবহার দৃশ্যমান ছিল। বাংলার অধিকাংশ মানুষের বাস ছিল বাঁশ আর খড়ের তৈরি ঘরে। বাঁশ ও কাঠের তৈরি ঘরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণির মানুষেরা বাস করত। বাংলায় দীর্ঘ দিনের প্রচলিত বাঁশের ঘরের গঠন রীতি ইটের তৈরি স্থাপত্য রীতিকে প্রভাবিত করেছিল। এভাবে বহিরাগত মুসলমানদের স্থাপত্যরীতির নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্থানীয় নির্মাণ শৈলীর মিশ্রণ ঘটে। যে কারণে ইটের তৈরি ইমারতে গ্রাম বাংলার প্রচলিত দোচালা বা চারচালা ঘরের আদল লক্ষ করা যায়। সুলতানি যুগের স্থাপত্য নির্মাণে নির্মাতাগণ স্থানীয় নির্মাণ শিল্পীদেরও নিয়োগ করতেন। ফলে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কারণে মুসলিম স্থাপত্যে বাঙালির স্থাপত্য শৈলীর ধারণা সহজেই প্রবেশ করেছিল। তাই এ যুগের ইটের তৈরি ইমারতে চৌচালার মতো ঢালু ও বাঁকা আকৃতির ছাদ নির্মিত হয়। এ ধারার প্রাচীনতম নিদর্শন ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। চৌচালা আকৃতির ছাদ নির্মাণের উদাহরণ এখানে দেখা যায়। এর প্রায় দুশো বৎসর পর মোগল যুগে গৌড়ে নির্মিত হয়েছিল ফতেহ খানের সমাধি। এই সমাধি গৃহের ছাদটি ছিল দোচালা আকৃতির।

মুসলমান বসতির আবশ্যিক অঙ্গ ছিল মসজিদ, কারণ প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া মুসলমানদের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় বিধান। মসজিদ ছিল মুসলমানদের নামাজ বা প্রার্থনা গৃহ। একারণেই মধ্যযুগের সূচনা থেকে মুসলিম স্থাপত্য বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। মসজিদের পরই মুসলমানদের দ্বিতীয় আবশ্যিক স্থাপনা হচ্ছে মাদ্রাসা। মুসলিম সাধক ও শাসকদের সমাধিও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে বিবেচিত।

সুলতানি যুগের ইমারতে মুসলমানদের নির্মাণ শৈলীর বিশেষত্ব লক্ষ করা যায়। এগুলো হচ্ছে খিলান, মিনার ও মিহরাব। স্থাপত্য নির্মাণে এদেশের জলবায়ুর ওপর দৃষ্টি রাখা হয়েছে। আর্দ্র জলবায়ুর দেশ বলে মসজিদের ভেতর প্রশস্ত নামাজ কক্ষে

পর্যাপ্ত আলো বাতাসের প্রয়োজন ছিল। তাই কিবলা বা পশ্চিম দিক ছাড়া অন্য তিন দিকের দেয়ালে পর্যাপ্ত দরজা ও জানালা কাটা হতো। বৃষ্টির পানি যাতে সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তাই দরজাগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট করে বানানো হতো। মসজিদে বড় আকৃতির প্রবেশ দ্বার নির্মিত হয় মোগল আমলে।

সুলতানি যুগের মসজিদে গম্বুজ ও খিলান ব্যবহারে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যেমন কোথাও দেখা যায় এক গম্বুজ বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদ, কোথাও এক গম্বুজ মসজিদের সামনে বারান্দা বা বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। সমাধিগুলো সাধারণত এক গম্বুজ রীতিতে তৈরি হতো। পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত সুলতান সিকান্দার শাহের (১৩৫৭-১৩৮৯ খ্রি.) সমাধি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ত্রিবেণীর সাতগাঁও ও হুগলী জেলার ছোট পাণ্ডুয়াতে এ ধরণের অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছে। চমৎকার খিলানে শোভিত এ সকল মসজিদে একাধিক গম্বুজ থাকতো। পোড়ামাটির অলংকরণ শোভিত ছিল মিহরাবগুলো, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ এ রীতির সর্বোত্তম উদাহরণ। এটি মধ্যযুগে বাংলার সর্ববৃহৎ মসজিদ স্থাপত্য। ইটের পাশাপাশি এখানে পাথরেরও ব্যবহার লক্ষণীয় ছিল।

ষোল শতকের প্রথমার্ধে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটলে স্থাপত্য শিল্পের ক্ষেত্রে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। মোগল যুগে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশ বা সুবায় পরিণত হয়। দিল্লির মোগল সম্রাট এবং তাদের নিয়োজিত সুবাদার ও আমীর ওমরাহদের তত্ত্বাবধানে এ সময় ইমারত নির্মিত হতে থাকে। ফলে এই নির্মাতাদের উপর স্থানীয় রীতি তেমন প্রভাব ফেলতে পারে নি। দিল্লির আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রিতে যে ধারায় মোগল স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে তারই অনুকৃতি দেখা যেতে থাকে বাংলার মোগল স্থাপত্যে। শুধু ব্যতিক্রম ছিল উত্তর ভারতের স্থাপত্যে ব্যবহৃত মর্মরপাথর ও লাল বেলেপাথরের বদলে ইটের ব্যবহার। সুলতানি যুগে দেয়ালকে আবৃত করতে পোড়ামাটির অলংকরণ বা টেরাকোটার যথেচ্ছ ব্যবহার ছিল। কিন্তু টেরাকোটা বিলুপ্ত হয়ে যায় মোগল যুগে। কারণ এ সময়ে চুন-সুরকিতে প্লাস্টার করার পদ্ধতি আয়ত্ব করে ফেলে নির্মাণ শিল্পীরা। খিলানগুলো এসময় নানা বর্ণের চিত্র ও কারুকার্যে সজ্জিত করা হতে থাকে। মোগল যুগের ইমারতগুলোর প্রবেশ মুখে বিশাল ও জমকালো তোরণ নির্মিত হতে থাকে। মোগল যুগের মসজিদের খিলান ও গম্বুজে আসে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যা দেখে সুলতানি যুগের মসজিদ থেকে সহজেই একে আলাদা করা যায়। ঢাকায় নির্মিত বাংলা একাডেমির কাছে হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদ, লালবাগ দুর্গের ভেতর ফররুখশিয়ার মসজিদ (লালবাগ শাহী মসজিদ) মোগল মসজিদের উদাহরণ।

ধর্মীয় ইমারতের বাইরেও মোগল যুগে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাধারণ ইমারত তৈরি হতে থাকে। এর মধ্যে কাটরা এর অন্যতম উদাহরণ। মোগল যুগের বাংলায় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে এবং বিশেষ করে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কয়েকটি জলদুর্গ তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে মুন্সিগঞ্জের ইদ্রাকপুর দুর্গ, নারায়ণগঞ্জের হাজিগঞ্জ ও সোনকান্দা দুর্গ। লালবাগ প্রাসাদ দুর্গও মোগল বাংলার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন। মোগল যুগে বিশেষ করে নবাবী আমলে বেশ কয়েকটি প্রাসাদও নির্মিত হয়েছিল। এরমধ্যে মুর্শিদাবাদে নবাবদের ইমারতসমূহ বিশেষ স্থাপত্য সৌকর্যের প্রমাণ বহন করছে। এসব ছাড়াও মোগল যুগে অনেক সেতু, খানকাহ ও ইমামবাড়া তৈরি হয়েছে।

মোগল শাসনযুগের শেষ দিকে হিন্দু জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে মন্দির নির্মিত হতে থাকে। মন্দিরগুলোতে ধর্মীয় কাহিনী উপজীব্য করে নানা অলঙ্করণে শোভিত করা হতো। দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির ও পুঠিয়ায় নির্মিত কয়েকটি মন্দিরের অলংকরণে কৃষ্ণ কাহিনীর নানা চিত্র এবং পৌরাণিক ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যত্র এ ধারার অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	মোগল বাংলার স্থাপত্যের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

মধ্যযুগের বাংলার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এসময়ের নানা স্থাপত্য কলার বিকাশ। সুলতানি ও মোগল পর্বে নির্মিত স্থাপত্য কলায় অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতা ছিল। সুলতানি যুগের স্থাপত্যসমূহের বড় জায়গা জুড়ে আছে মসজিদ স্থাপত্য। এ পর্বে পলেস্তারা করার ধারণা না থাকায় দেয়ালের গায়ে কারুকার্য খচিত পোড়ামাটির ফলক ব্যবহার করা হতো। সুলতানি যুগের ইমারত-শৈলীতে দেশীয় রীতির প্রভাব স্পষ্ট ছিল। মোগল পর্বে ধর্মীয় ইমারতের পাশাপাশি নানা লৌকিক ইমারতও নির্মিত হয়। উত্তর ভারতের নির্মাণ শৈলীর প্রভাব এসব স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুলতান সিকান্দার শাহের সমাধি কোথায় অবস্থিত?
ক) সোনারগাঁও খ) পাণ্ডুয়া
গ) গৌড় ঘ) বাগেরহাট

২। সুলতানি স্থাপত্য নির্মাণের প্রধান উপকরণ কী ছিল?
ক) কাঠ খ) পাথর
গ) ইট ঘ) সুড়কি

৩। মধ্যযুগে বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন–
i. লালবাগ প্রাসাদ দুর্গ মোগল বাংলার অন্যতম স্থাপত্য নিদর্শন
ii. মোগল যুগে অনেক সেতু, খানকাহ ও ইমামবাড়া তৈরি হয়েছে
iii. পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ মধ্যযুগে বাংলার সর্ববৃহৎ মসজিদ স্থাপত্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

ক একটি জনপদের শাসক। তার প্রতিনিধি খ তার অধীনে অন্য একটি জনপদের দায়িত্ব লাভ করেছে। সেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল দেখে হঠাৎ খ বিদ্রোহ করে বসে। তারপর অনেকটা স্বাধীন দেশ হিসেবে সে স্বাধীন করতে থাকে। তার দীর্ঘদিনের শাসনে সেখানে অনেক উন্নয়ন সাধিত হয়। উদ্দীপকের এ অংশের আলোকে উত্তর দিন–

ক. সুলতানি আমলে বাংলায় কী ধরণের স্থাপত্য তৈরি হয়েছিল? ১
খ. সুলতানি ও মোগল আমলে নির্মিত মসজিদগুলোর মূল নির্মাণ উপকরণ কী ছিল? ২
গ. সুলতানি ও মোগল আমলে নির্মিত মসজিদগুলোর কোনো পার্থক্য আছে কী? ৩
ঘ. ধর্মীয় স্থাপত্যের বাইরে মোগল আমলে আর কী কী তৈরি হয়েছিল? ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১। ক ২। ক ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক

উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমন ও ইংরেজ শাসনের সূচনা

ইউনিট ৫

ভূমিকা

যুগযুগ ধরে উপমহাদেশের সাথে স্থল ও জলপথে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগ ছিল। কারণ উপমহাদেশের ধন-সম্পদের আকর্ষণ বিদেশিদের এ অঞ্চলে আসতে আগ্রহী করে তোলে। ফলে বিদেশি বণিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু তখন জলপথের বাণিজ্য শুধু আরব বণিকদের হাতেই ছিল। পনের শতকের শেষের দিকে পাশ্চাত্য থেকে উপমহাদেশে পৌঁছবার নতুন জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরসমূহ হতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরাসরি ইউরোপীয় বন্দরে পৌঁছাতো। এভাবে উপমহাদেশের সাথে ইউরোপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে; যা পরবর্তীকালে উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারাকে পরিবর্তন করে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিল। এ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে ইউরোপীয়দের আগমন, পলাশীর যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ, দিউয়ানি লাভ ও দ্বৈতশাসন প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৫.১ ইউরোপীয়দের আগমন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উপমহাদেশের সাথে ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইউরোপীয় বণিকদের আগমন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- উপমহাদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	পর্তুগিজ, বার্থলমিউ দিয়াজ, আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল, ভাস্কো-দ্য-গামা, কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ, হুগলি, বাণিজ্য কুঠি।

পর্তুগিজ

বাণিজ্যকে মূলধন করে পর্তুগাল থেকে পর্তুগিজরা এ উপমহাদেশে আসলেও ক্রমে তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দ্য-গামার উপমহাদেশে আসার পরপরই পর্তুগিজরা এ দেশে আসতে শুরু করে। এরপর ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে বার্থলমিউ দিয়াজ, আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল ও ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্ক গোয়াতে আগমন করেন। আলবুকার্ক উপমহাদেশে পর্তুগিজ-শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। কলম্বাস এবং ম্যাজিলানও বিখ্যাত পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন। উপমহাদেশে আসার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা এদেশের পশ্চিম উপকূলের কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি বন্দরে, সিংহলের নানাস্থানে এবং বাংলার হুগলী বন্দরে তাঁদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। তাঁদের নৌ ও সেনাবাহিনী খুব শক্তিশালী ছিল।

পর্তুগিজরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামেও বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং কুঠিগুলোকে দুর্গে পরিণত করে। পর্তুগিজরাই প্রথম ইউরোপীয় যাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজে এদেশে সুদূরপ্রসারী ও স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। সুস্বাদু ফল আনারস, পেপে, পেয়ারা, জলপাই, কামরাঙ্গা প্রভৃতি তাঁরাই এদেশে প্রচলন করে। পর্তুগিজরা চীন, ব্রুনাই, মালাক্কা, হরমুজ, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশ থেকে মূল্যবান কাপড়, বাদাম, মসলা, রং, কড়ি, কর্পূর এনে উপমহাদেশে বিক্রি করতো আর বাংলাদেশ থেকে সূতি ও রেশমী কাপড়, পাট, তামাক, চামড়া, চাল, ডাল, ঘি, তেল, মধু মোম অন্যান্য দেশে নিয়ে যেত।

ভাস্কো-দ্য-গামা

আলবুর্কাক

পর্তুগিজরা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যই করত না, তারা এদেশের জমিদার ও প্রতাপশালী বার ভূঁইয়াদের সেনাবাহিনীতে চাকরী করত। আবার সুযোগ পেলেই জুলুম, অত্যাচার ও লুণ্ঠন করতো। অনেক সময় সম্রাট বা নবাবের আইন অমান্য করে বিনা শুল্কে স্বাধীনভাবে ব্যবসা চালাত। এতে তাঁরা মোগল সম্রাটের বিরাগভাজন হন।

পর্তুগিজরা আরও নানা প্রকার অপরাধমূলক কাজ করত। তাঁরা জোর করে এদেশেরই অসহায় বালক-বালিকাদের খ্রিস্টান বানাত। এদেশের মানুষকে ধরে নিয়ে দাসদাসীরূপে বিক্রি করতো বিদেশের বাজারে। পর্তুগিজ সৈন্যরা জোর করে এদেশের মেয়ে বিয়ে করত। তাদের এ অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেলে সম্রাট শাহজাহান পর্তুগিজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। সম্রাটের নির্দেশে কাসিম খান তাদের হুগলী কুঠি থেকে বিতাড়িত করেন। সর্বশেষ বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান তাদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ ঘাঁটি দখল করে চিরতরে এ দেশ থেকে উচ্ছেদ করেন।

ওলন্দাজ বা ডাচ

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা জলপথে উপমহাদেশে আসে। প্রাচ্য বাণিজ্যে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে হল্যান্ডের একদল বণিক 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। তারা কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুঁড়া ও বাঁকুড়ায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া বালেশ্বর, কাশিমবাজার এবং বরানগরেও তাদের কুঠি ছিল। প্রথমে ওলন্দাজগণ ইংরেজদের সাথে রেশমী সূতা, সুতি কাপড় চাল, ডাল সোরা ও তামাক এদেশ থেকে রপ্তানি করত এবং অন্যদেশ থেকে এদেশে মসলা আমদানি করত। ইংরেজদের সাথে তাদের যে বাণিজ্য চুক্তি হয় তা দু'বছরের মধ্যে ভেঙ্গে গিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। অন্যদিকে বাংলার শাসনকর্তাদের সাথেও তাদের প্রবল বিরোধ দেখা দেয়। এ বিরোধ বেশি বেড়ে গেলে ইংরেজগণ ওলন্দাজ কুঠিগুলো দখল করে ফেলে। আর এভাবে ওলন্দাজদের বাণিজ্যিক সুবিধা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁরা উপমহাদেশ ছেড়ে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চলে যায়। সেখানে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করে। ফলে এদেশে ইংরেজদের শক্তি বেড়ে যায়। বর্তমান ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের কাছ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে।

দিনেমার

ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে দিনেমারগণ উপমহাদেশে বাণিজ্য করার জন্য 'দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে এবং দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুরে ও কলকাতার শ্রীরামপুরে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। অবশেষে দিনেমারগণ কোনো প্রকার বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই এদেশ থেকে চিরতরে বিদায় নেয়।

ইংরেজদের আগমন ও ক্ষমতা বিস্তার

পর্তুগিজ ও ওলন্দাজ বণিকদের বাণিজ্যিক সাফল্য ও এদেশের বিপুল ধন-সম্পদের বর্ণনা ইংরেজ বণিকদের মনে এদেশে বাণিজ্য করার আগ্রহ সৃষ্টি করে। উপমহাদেশে তখন মোগল-সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ সময়। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদী সনদ নিয়ে এদেশে বাণিজ্য করতে আসে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে তারা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ের নিকট সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রাজদূত স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে ইংরেজদের বাণিজ্যের জন্য কিছু সুবিধা আদায় করেন। এরপর মস্‌লিপট্টমে ইংরেজদের দ্বিতীয় বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। পর্তুগিজরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হলে ইংরেজগণ বালেশ্বরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে এবং করমণ্ডল উপকূলে কিছু জমি নিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এবং এ দুর্গই পরে মাদ্রাজ শহরে পরিণত হয়। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে জলপথে ইংরেজগণ হুগলিতে আসে এবং বাংলার সুবেদার শাহ সুজার অনুমতি নিয়ে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে সেখানে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তারা কাশিমবাজারে আরও একটি কুঠি স্থাপন করে। এরপর ধীরে ধীরে তারা ঢাকা ও মালদহে কুঠি নির্মাণ করে শক্তি বাড়াতে থাকে।

এদিকে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজার বোনকে বিয়ে করে মুম্বাই যৌতুক হিসাবে পান। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে চার্লস বার্ষিক দশ পাউন্ডের বিনিময়ে কোম্পানিকে মুম্বাই ইজারা দেন। বর্তমান মুম্বাই নগর ও বন্দর এখানেই গড়ে উঠে। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জব চার্নক ভাগীরথী নদীর তীরে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সূতানটি ও গোবিন্দপুর এ তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেন। পরবর্তীকালে উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ধারণকারী দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম এখানেই নির্মিত হয়। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ফররুখশিয়ারের অনুমতি নিয়ে ইংরেজগণ বাংলা, মাদ্রাজ ও মুম্বাইয়ে বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করতে থাকে।

ফরাসি

ফ্রান্সের অধিবাসী ফরাসিরা ইউরোপের একটি সুসভ্য জাতি। প্রাচীনকাল থেকেই ফরাসিদের সাথে ইংরেজদের বিরোধ ছিল এবং বর্তমানেও আছে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য ফরাসি বিপ্লব একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

উপমহাদেশে ফরাসিদের আগমন সবার শেষে। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি মন্ত্রী কোলবার্টের পৃষ্ঠপোষকতায় 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয় এবং ভারতবর্ষে বাণিজ্য শুরু করে। প্রথমে তারা মুম্বাইয়ের সুরাটে ও পরে পন্ডিচেরীতে কুঠি স্থাপন করে। অল্পদিনের মধ্যেই তারা বাংলার চন্দননগরে আরও একটি কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া কারিকল, মসলিপট্টম, কাশিমবাজার এবং বালেশ্বরেও তাদের কুঠি ছিল। ফরাসিরা উপমহাদেশে প্রায় একশ বছর বাণিজ্য করে। ইংরেজগণ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের চন্দননগর এবং ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরী কুঠি দখল করে নেয়। স্বদেশে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে বিবাদের জের হিসেবে এখানেও বিবাদ চলতে থাকে। কিন্তু ইংরেজগণ উন্নততর সামরিক শক্তি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়। পরপর তিনটি কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসিরা পরাজিত হলে ফরাসিদের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তারের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। ফলে তাদের উপমহাদেশ থেকে বিদায় নিতে হয়।

অন্যান্য কোম্পানি

বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক সাফল্যে উৎসাহিত হয় ফান্ডার্সের বণিকগণ 'The Ostend Company', সুইডেনের বণিকগণ 'The Swedish East India Company', অস্ট্রিয়ার বণিকগণ 'The Austrian East India Company' প্রভৃতি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান উপমহাদেশে বাণিজ্য করতে আসে। কিন্তু তারা তেমন সুবিধা করতে পারে নি।

ভাস্কো-দ্য-গামার পাক-ভারত আগমনের পথা

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ক্লাসে উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্বের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

প্রাচীনকাল থেকেই স্থল ও জলপথে ইউরোপের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল। উপমহাদেশে উৎপাদিত সামগ্রী ইউরোপে সমাদৃত হতো। মধ্যযুগে আরব বণিকগণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে এদেশীয় পণ্য ইউরোপের ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বন্দরে নিয়ে যেত। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করে ভাস্কো-দ্য-গামা যখন উপমহাদেশের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হলেন, তখন উপমহাদেশের সাথে ইউরোপীয় দেশগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে এই জলপথ দিয়েই পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসি, সুইডিশ, অস্ট্রিয়ান ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশে এসে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কে?
ক) ভাস্কো-দ্য-গামা খ) বার্থলমিউ দিয়াজ
গ) আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল ঘ) আল বুকার্ক

২। উপমহাদেশে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) বার্থলমিউ দিয়াজ খ) আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল
গ) আলবুকার্ক ঘ) ভাস্কো-দ্য-গামা

৩। এ দেশের অসহায় বালক বালিকাদের জোর করে খ্রিস্টান বানোতা কারা?
ক) পর্তুগিজরা খ) ওলন্দাজরা
গ) ইংরেজরা ঘ) ফরাসিরা

৪। কোন মোগল সম্রাট পর্তুগিজদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করেন?
ক) আকবর খ) জাহাঙ্গীর
গ) শাহজাহান ঘ) আওরঙ্গজেব

৫। বাংলার চুচুড়া ও বাকুঁড়ায় বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে কারা?
ক) পর্তুগিজরা খ) ওলন্দাজরা
গ) ইংরেজরা ঘ) ফরাসিরা

সৃজনশীল প্রশ্ন

রবার্ট ফ্রান্সিস নামক এক নাবিক সমুদ্র পথে তার দেশ থেকে ধন সম্পদে পরিপূর্ণ একটা দেশে আসার জলপথ আবিষ্কার করার পর তার দেশের ব্যবসায়ীরা উক্ত দেশে ব্যবসা করতে এসে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুকে পড়ে। তাদের অনুসরণ করে অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরাও উক্ত দেশে বাণিজ্য করতে আসে। অন্যান্য দেশ থেকে আগত ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রবার্ট ফ্রান্সিসের দেশের ব্যবসায়ীরা পরাজিত হয়ে এক সময় দেশটি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ক. কোন দেশের অধিবাসীদের পর্তুগিজ বলা হয়? ১
খ. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচয় দিন। ২
গ. উদ্দীপকের দেশের ব্যবসায়ীদের মতো কোন দেশের ব্যবসায়ীরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুকে পড়ে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত দেশের যে নাবিক ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন, তার আগমনের কাহিনী বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৫.২ সিরাজউদ্দৌলা ও পলাশীর যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- পলাশীর যুদ্ধের কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- পলাশীর যুদ্ধের ফলাফলগুলো বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	আলীবর্দী খান, গিরিয়ার যুদ্ধ, আমেনা, ময়মুনা, ঘষেটি

উপমহাদেশের ইতিহাসে আলীবর্দী খান বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকৃত নাম মির্জা মুহম্মদ আলী এবং তিনি ছিলেন তুর্কি বংশের।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

প্রথমে তিনি বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন এবং পরে স্বীয় যোগ্যতা বলে গিরিয়ার যুদ্ধে বাংলার নবাব সরফরাজ খানকে হত্যা করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী (১৭৪০ খ্রি.) লাভ করেন। তাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মারাঠা ও বর্গীদের দমন করা। তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে সচেতন ও সজাগ ছিলেন।

আলীবর্দী খানের কোনো পুত্র ছিল না; ছিল আমেনা, ময়মুনা ও ঘষেটি নামে তিন কন্যা। ময়মুনা ও আমেনার দুই পুত্র ছিল; কিন্তু ঘষেটি বেগমের কোনো পুত্র ছিল না। আলীবর্দী খান আমেনার পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এ কারণে তাঁকেই তাঁর জীবিতকালে বাংলার নবাব পদে মনোনীত করে যান। সিরাজ ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর পিতার নাম মির্জা মুহম্মদ হাসিম মইনুদ্দীন খান। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে সিরাজউদ্দৌলা বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন।

পলাশীর যুদ্ধের কারণ

পলাশীর যুদ্ধের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল নিচে তা আলোচনা করা হলো

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহনকে আলীবর্দী খানের অপর দুই কন্যা সহজে মেনে নিতে না পেরে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করেন। এতে ইন্ধন যোগান ঘষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। সিরাজউদ্দৌলা কৌশলে তাঁর খালা ঘষেটি বেগমকে প্রাসাদে নজরবন্দি করেন ও খালাত ভাই শওকত জঙ্গকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করেন।

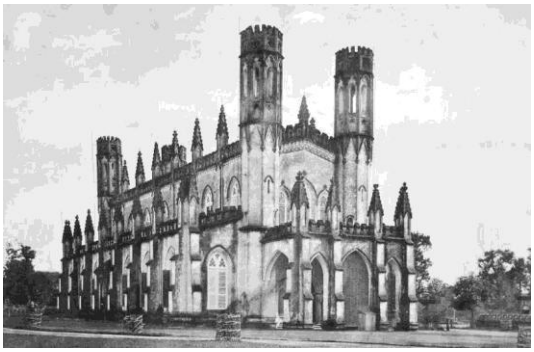

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ

সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলেও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র নতুনভাবে শুরু হলো। একদিকে রাজদরবারের প্রভাবশালী দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অপরদিকে ইংরেজ বেনিয়ারা। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক জড়িত ছিল। এরা সিরাজের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও ইংরেজদের অবাধ্যতা: বাংলায় বাণিজ্যরত ইংরেজ বণিক সম্প্রদায় সিরাজের সিংহাসনে আরোহনের পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী উপঢৌকন প্রদান কিংবা সৌজন্য সাক্ষাৎ পর্যন্ত করে নি; এতে নবাবের প্রতি ইংরেজের অবাধ্যতাই প্রকাশ পায়। ফলে সিরাজ অপমানবোধ করেন।

নবাবের আদেশ অমান্য: নবাব আলীবর্দী খানের সময়ে ইংরেজগণ বাণিজ্য করার অনুমতি পেলেও দুর্গ নির্মাণ করার অনুমতি পায় নি। কিন্তু সিরাজের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা কলকাতায় এবং ফরাসিরা চন্দনগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করলে সিরাজ তাদের দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করতে আদেশ দেন। ফরাসিরা এ আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা তা অমান্য করে। ফলে নবাব তাদের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

ইংরেজ কর্তৃক শওকত জঙ্গকে সাহায্য: নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে খালা ঘষেটি বেগম ও পূর্ণিয়ার শাসক শওকত জঙ্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে তাদের সমর্থন করেন। এতে নবাব ইংরেজদের উপর অসন্তুষ্ট হন।

বাণিজ্যিক সুবিধার অপব্যবহার: ইংরেজরা বাণিজ্য শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে অবাধে 'দস্তক' ব্যবহার শুরু করলে এদেশীয় ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাণিজ্য শর্ত মেনে চলার নির্দেশ প্রদান করলে ইংরেজরা তা অমান্য করে। ফলে নবাব ইংরেজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন।

সন্ধির শর্ত ভঙ্গ: নবাব সিরাজউদৌলার সাথে সন্ধির যাবতীয় শর্ত ভঙ্গ করে ইংরাজরা জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু করে ও নবাবকে কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।

ইংরেজ কর্তৃক কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান: ঘষেটি বেগমের পক্ষ অবলম্বনকারী রাজা রাজাবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস ও তাঁর পরিবার প্রচুর ধনদৌলতসহ কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। নবাব সরাসরি কৃষ্ণদাসকে তাঁর নিকট সমর্পণের জন্য নারায়ণসিংহকে দূত হিসেবে ইংরেজদের কাছে পাঠান। কিন্তু, ইংরেজ গভর্নর নবাবের দূতকে অপমানিত করে বের করে দেন ও কৃষ্ণদাসকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। ফলে নবাবের ধৈর্যের বাধন ছিঁড়ে যায়।

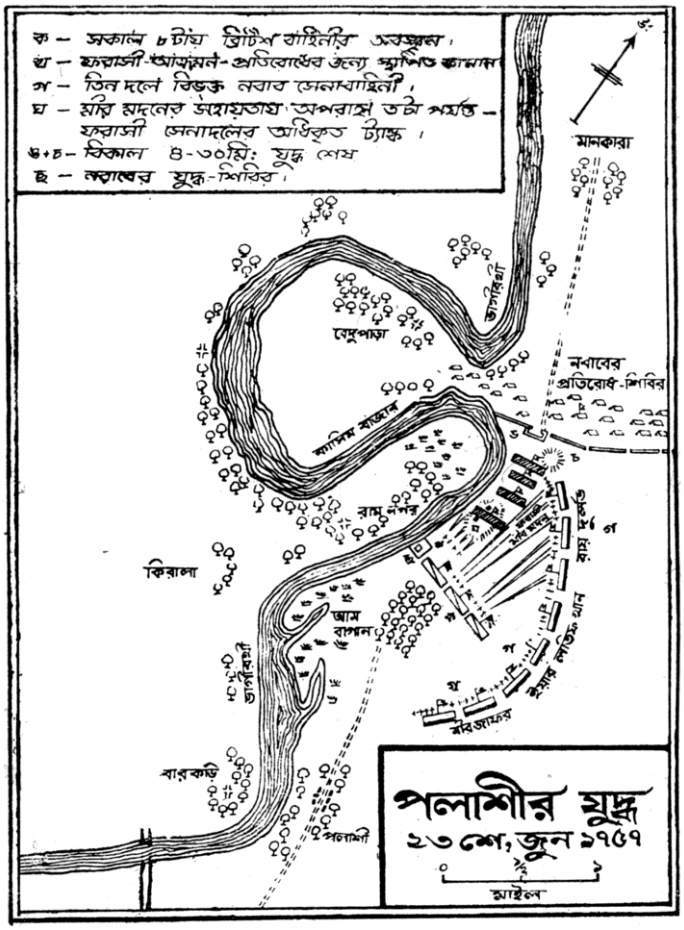

পলাশীর যুদ্ধ

পলাশীর যুদ্ধ

কলকাতা দখল: নবাব ইংরেজদের ধৃষ্টতায় অতিষ্ঠ হয়ে তাদের শাস্তি দেয়ার জন্য ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে কোলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে নবাব কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি দখল করেন। নবাবের এ অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে গভর্নর ড্রেক ও তাঁর সাথীরা ফোর্ট উইলিয়াম ছেড়ে 'ফুলতা' নামক স্থানে আশ্রয় নেয়। ফলে সহজেই সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করেন ও আলীবর্দী খানের নামানুসারে এর নাম রাখেন 'আলী নগর'। মি. হলওয়েল ও তাঁর সাথীরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হন (২০ জুন ১৭৫৬ খ্রি.) আত্মসমর্পণের পর কোনো ইংরেজের উপর অত্যাচার করা হয় নি।

কথিত আছে নবাবের আদেশে ১৪৬ জন ইংরেজ বন্দিকে ১৮×১৪ চওড়া বিশিষ্ট ছোট কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুন মাসের প্রচণ্ড গরমে এদের মধ্যে

১২৩ জন শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। বাকী ২৩ জন কোনো রকমে বেঁচে যায়। হলওয়েল কর্তৃক প্রচারিত এ কাহিনী 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। 'অন্ধকূপ-হত্যা' কাহিনীর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এটি একটি কল্পিত-কাহিনী মাত্র।

আলীনগরের সন্ধি

কলকাতা অধিকার করার পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা সেনাপতি মানিক চাঁদকে কলকাতা রক্ষার দায়িত্বে রেখে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ফিরে যান। ইতোমধ্যে অন্ধকূপ-হত্যা কাহিনী এবং নবাব কর্তৃক কলকাতা দখলের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছলে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও রবার্ট ক্লাইভ মানিক চাঁদের নামমাত্র প্রতিরোধ ভেঙ্গে কলকাতা পুনরায় দখল করে নেন।

এ অবস্থায় নবাব চারদিকে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল লক্ষ করে ইংরেজদের সাথে এক অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। এ সন্ধিই বিখ্যাত 'আলী নগরের সন্ধি' নামে খ্যাত। এ সন্ধির শর্তানুসারে নবাব দিল্লির সম্রাট কর্তৃক ইংরেজদের প্রদত্ত সকল বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা, যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি প্রদান, টাকশাল নির্মাণ এবং দুর্গ সংস্কার করার অনুমতি প্রদান করেন।

উচ্চাভিলাষী ক্লাইভ এতেও নবাবের প্রতি খুশী হতে পারলেন না। তিনি বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার লক্ষ্যে কতিপয় স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতা লোভী কুচক্রী, দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী দলের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন।

ক্লাইভ ও মীর জাফরের ষড়যন্ত্র

ইতোমধ্যে ইউরোপে বৃটিশ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে সে সূত্র ধরে নবাবের নিষেধ সত্বেও ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ ফরাসি বাণিজ্য কেন্দ্র চন্দনগর অধিকার করেন। ফলে আত্মরক্ষার্থে ফরাসিরা মুর্শিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরেজদের এ অশোভন উদ্ধত আচরণের জবাব দেয়ার জন্য সিরাজ দাক্ষিণাত্যের ফরাসি সেনাপতি বুসীর সাথে পত্রালাপ করেন। নবাবের এ কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে সিরাজের পরিবর্তে তার মনোনীত প্রার্থী প্রধান সেনাপতি (আলীবর্দী খানের ভগ্নিপতি) মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানোর জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এসব ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন ধনকুবের জগৎশেঠ, নবাবের সেনাপতি মীর জাফর ও রায়দুর্লভ, আস্থাভাজন উমিচাঁদ, দেওয়ান রাজবল্লব প্রমুখ। মীর জাফর আলী খান নবাবীর বিনিময়ে ইংরেজদের পৌনে দুই কোটি টাকা প্রদানের অঙ্গীকারে ক্লাইভের সাথে এক গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেন। উমিচাঁদ এ গোপন চুক্তির কথা ফাঁস করার ভয় দেখালে ক্লাইভ তাঁকে প্রচুর অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারসহ একটি জাল চুক্তি পত্র তৈরি করেন। ওয়াটসন এ জাল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে ক্লাইভ নিজেই তাতে স্বাক্ষর করেন।

লর্ড ক্লাইভ

ক্লাইভের যুদ্ধ ঘোষণা

ষড়যন্ত্র যখন একেবারে পাকা, তখন ক্লাইভ নবাবের বিরুদ্ধে সন্ধি ভঙ্গের মিথ্যা অজুহাতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নবাব ইংরেজদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ৫০টি কামানসহ ৫০ হাজার পদাতিক ও ১৮ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর তীরে মোতায়েনের আদেশ দিলেন। অন্যদিকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন ক্লাইভ ৮টি কামানসহ ১,০০০ জন ইউরোপীয় ও ২,০০০ জন দেশীয় সৈন্যসহ পলাশীর আম্রকাননে অবস্থান গ্রহণ করলেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আম্রকাননে বাংলার ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যায়। নবাবের সৈন্যবাহিনী যখন দেশপ্রেমিক মীরমদন ও মোহন লালের আক্রমণে প্রায় পর্যুদস্ত তখন মীর জাফর যুদ্ধক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। এ সময় হঠাৎ মীরমদন গোলার আঘাতে নিহত হলে মোহন লাল ও ফরাসি সেনাপতি সিনফ্রে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। মীরমদনের মৃত্যু সংবাদে নবাব বিচলিত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধান সেনাপতি মীর জাফরকে ডেকে পাঠান এবং বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মীর জাফরকে অনুরোধ করেন। বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর কুরআন স্পর্শ করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার মিথ্যা শপথ করেন। এদিকে মোহনলাল ও সিনফ্রের বাহিনী যখন নবাবের বিজয়কে সুনিশ্চিতের পথে নিয়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তে মীর জাফরের পরামর্শে নবাব যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিয়ে বিরাট ভুল করেন।

রণক্লান্ত নবাব বাহিনী যখন রাত্রিতে বিশ্রামরত তখন মীর জাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ বাহিনী নবাব শিবির আক্রমণ করে সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ফলে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে নবাব পরাজিত হয়ে পুনরায় মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

অবশেষে নবাব স্ত্রী লুৎফুননেসা ও কন্যাকে নিয়ে নৌকাযোগে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজমহলের পথে ভগবান গোলায় ধৃত ও বন্দি হন। তাঁদের মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হয়। পরে মীর জাফরের পুত্র মীরনের আদেশে মোহাম্মদী বেগ নবাবকে হত্যা করে।

এভাবেই পলাশীর প্রান্তরে দেশ প্রেমের পরাজয় হলো, আর বিশ্বাসঘাতকদের জয় হলো। এর ফল হিসেবে ইংরেজদের সমগ্র উপমহাদেশের বিজয়ের পথ প্রশস্ত হলো।

মীর জাফর কর্তৃক যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা

নবাবের পতনের কারণ

পলাশীর যুদ্ধকে একটি বিরাট ও ভয়াবহ যুদ্ধ না বলে একটি খণ্ড যুদ্ধ বলা যায়। কারণ এ যুদ্ধের পরিস্থিতি ও গুরুত্ব বিচার করলে এ যুদ্ধকে কখনই বিরাট যুদ্ধ রূপে চিহ্নিত করা যায় না। পলাশীর যুদ্ধে নবাব বাহিনীর পরাজয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল ঃ

প্রথমত: মীর জাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল নবাবের পতনের প্রধান কারণ। বিজয়ের মুহূর্তে প্রধান সেনাপতি হিসাবে তিনি নবাবকে ভুল পরামর্শ দেন ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয়ত: তরুণ নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব এবং মাতামহের অত্যাধিক স্নেহ প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ায় সিরাজের চরিত্রে কঠোরতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। ফলে তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির মুখে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং ষড়যন্ত্রের খবর পাওয়া সত্বেও তিনি দুর্বলতার কারণে কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহসী হন নাই।

তৃতীয়ত: যুদ্ধক্ষেত্রে সুনিশ্চিত বিজয়কে উপেক্ষা করে নবাবের যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা তাঁর সমরনীতির অপরিপক্কতার ও পরনির্ভরশীলতার পরিচয় বহন করে যা তাঁর পতনকে তরান্বিত করে।

চতুর্থত: এ সময় মানুষের মধ্যে চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব দেখা দিয়েছিল। ফরাসিরা তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেয়ার পরেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেন নি। নবাব আলীবর্দী খানও মৃত্যুর আগে সিরাজকে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করে যান।

পঞ্চমত: কর্মচারী, সভাসদ, সেনাপতি, ব্যবসায়ী, ধনকুবের ও সৈন্যরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করে নি।

ষষ্ঠত: সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক রবার্ট ক্লাইভ সূক্ষ্ম কূটনীতি, উন্নত রণকৌশল এবং রণসম্ভারে নবাব অপেক্ষা অনেক বেশি পারদর্শী ছিলেন। ফলে ক্লাইভের নিকট নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় অবধারিত ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল

উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি বেদনাবহুল খণ্ড যুদ্ধ হলেও এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল সদূরপ্রসারী। বিশেষ করে, এ যুদ্ধের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রথমত: পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার অকাল মৃত্যু হলে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য দীর্ঘদিনের জন্য অস্তমিত হয়।

দ্বিতীয়ত: এ যুদ্ধের ফলে মীর জাফর নামে মাত্র নবাব হলেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা রইলো ক্লাইভের হাতে।

তৃতীয়ত: পলাশীর যুদ্ধের পর উপমহাদেশে ইংরেজদের সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও তারা নতুন নবাবের কাছ থেকে নগদ এক কোটি টাকা এবং চব্বিশ পরগনার বিশাল জমিদারী লাভ করেন। ফলে বাংলার রাজনীতিতে ইংরেজদের যখন তখন হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত হয়।

চতুর্থত: এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলায় একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করেন আর এদেশীয় বণিকদের সমাধি রচিত হয়।

পঞ্চমত: এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ইংরেজরা বাংলাসহ দাক্ষিণাত্যে প্রভাববিস্তার করে ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে এবং একচেটিয়াভাবে উপমহাদেশের সম্পদ আহরণ ও ইংল্যান্ডে প্রেরণের ফলে এদেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

ষষ্ঠত: ঐতিহাসিক আর.সি. মজুমদার বলেন, "পলাশীর যুদ্ধ বাংলা তথা সমগ্র উপমহাদেশে ইংরেজদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল। কালক্রমে বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি.) তারা নবাব মীর কাসিম ও মুগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে পরাজিত করে সমগ্র উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে।

সপ্তমত: এ যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জনগণের মনে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়।

অষ্টমত: পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে উপমহাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হয়। "১৭৫৭ সালের ২৩ জুন তারিখে উপমহাদেশের মধ্যযুগ শেষ আধুনিক যুগের পত্তন হয়েছিল।"

শিক্ষার্থীর কাজ	পলাশী যুদ্ধের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করবেন।

সারাংশ

উপমহাদেশে ইংরেজদের আগমন, বাণিজ্য, সাম্রাজ্য স্থাপন, শাসন-শোষণ এদেশবাসীর জন্য এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। এ অধ্যায় ষড়যন্ত্রের, বিশ্বাসঘাতকতার, শঠতার ও শাসন শোষণের অধ্যায়। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজগণ কোনো রণ দক্ষতার দরুন নয় বরং এদেশীয় কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের দরুনই তাদের কর্তৃত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজ কর্মকর্তারা বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হন যা তাঁদের উপমহাদেশব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়ক হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কত খ্রিস্টাব্দে মসনদে বসেন?
ক) ১৭৫৫ খ) ১৭৫৬ গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৫৮

২। 'অন্ধকুপ হত্যা' নামক কল্প কাহিনীর জনক কে?
ক) হলওয়েল খ) ড্রেক গ) রবার্ট ক্লাইভ ঘ) ওয়াটসন

৩। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন–
ক) ওয়াটসন খ) ক্লাইড গ) সিনফ্রে ঘ) কর্নওয়ালিস

৪। উপমহাদেশে মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের পত্তন হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৭৫৫ খ) ১৭৫৬ গ) ১৭৫৭ ঘ) ১৭৫৮

৫। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণ ছিল–
i. মীর জাফর ও তার সহযোগীদের বিশ্বাস ঘাতকতা
ii. নবাবের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাব
iii. নবাবের অপরিপক্ক সমরজ্ঞান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ রবার্ট ক্লাইভ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রবার্ট ক্লাইভের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের বিবরণ দিতে পারবেন।
- সেনাপতি, শাসক ও এদেশে ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে রবার্ট ক্লাইভের কৃতিত্বের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	কোর্ট অব ডাইরেকটরস, এলাহাবাদ চুক্তি,

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে রবার্ট ক্লাইভের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তরুণ বয়সে মাদ্রাজে (বর্তমান চেন্নাই) ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরী গ্রহণ করে স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টার দ্বারা উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। বস্তুত তাঁর অসাধারণ সাহস, সংকল্প ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ফলেই এদেশে বাণিজ্যরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শেষ পর্যন্ত শাসকের মর্যাদা লাভ করে।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে শাসন সংস্কার

বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানির হাতে ক্ষমতা চলে আসে। ধীরে ধীরে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে বিশৃংখলা ও দুর্নীতি চরমে উঠে। এ অবস্থায় ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ পুনরায় লর্ড ক্লাইভকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে দ্বিতীয়বার বাংলায় প্রেরণ করে। (১৭৬৫-৬৭ খ্রি.)। কাজেই এদেশে এসে তাঁর প্রধান কাজ হলো 'আভ্যন্তরীণ সংস্কার' সাধন করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

প্রথমত: তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের পক্ষে সকল প্রকার উপহার বা উৎকোচ গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ করেন।

দ্বিতীয়ত: তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেন। পাশাপাশি কোম্পানির ক্ষতিগ্রস্থ অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের লবণ, সুপারী এবং তামাকের একচেটিয়া ব্যবসা করার জন্য একটি 'বাণিজ্য সমিতি' গঠন করেন। এ প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে পর্যায় অনুযায়ী ভাগ করে দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়। একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে জনসাধারণেরও দুঃখ দুর্দশা বাড়ে। অবশেষে এ বাণিজ্য সমিতির কাজকর্ম পছন্দ না হওয়ায় 'কোর্ট অব ডাইরেকটরস্' ক্লাইভকে তা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন।

তৃতীয়ত: পলাশীর যুদ্ধের পর হতে সৈন্যদের শান্তির সময়েও দ্বিগুণ ভাতা দেয়া হতো। সেনা-বিভাগের খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে লর্ড ক্লাইভ এ ভাতা বন্ধ করে দিলে সেনাবিদ্রোহ দেখা দেয়। তবে তা তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। এতে তিনি বহুল প্রশংসিত হন।

ইংরেজ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর উপমহাদেশে ইংরেজ শক্তি এক বিশেষ দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। এ দুর্দিনে ক্লাইভ আর্কট দখল করে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের সম্মান রক্ষা করেন। (১৭৫৯ খ্রি.) ইংরেজের এ বিজয় উপমহাদেশে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভের কূটনীতির জন্যই পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ পতাকা উত্তোলন সম্ভব হয়েছিল। এ বিজয় ইংরেজ শাসনের ভিত্তিকে সুনিশ্চিতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরবর্তীকালে বাংলার এ অর্থ-সম্পদ ও জনবল চিরশত্রু ফরাসিদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যা বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংরেজদের সহায়ক হয়েছিল।

লর্ড ক্লাইভের দিওয়ানি লাভ

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে এলাহাবাদ চুক্তি স্বাক্ষর করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করে। মধ্যবর্তী রাজ্য হিসেবে কোম্পানি ও মারাঠাদের মধ্যে অযোধ্যা রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করে ক্লাইভ ইংরেজ বিরোধী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও এক শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। উপরন্তু ভাতা প্রদান করে সম্রাট ও নবাবকে নিয়ন্ত্রণে আনার ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হতে একক-ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে। লর্ড ক্লাইভ উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা পেলেও বাংলায় জালিয়াতি এবং উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে স্বদেশবাসী তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে বহু অভিযোগ উত্থাপন করেন। অবশেষে পার্লামেন্টে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও ইংল্যান্ডবাসীর ধিক্কারে অতিষ্ঠ হয়ে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে স্বগৃহে ক্লাইভ আত্মহত্যা করেন।

কৃতিত্ব

রবার্ট ক্লাইভের চারিত্রিক দোষ থাকা সত্বেও উপমহাদেশে ইংরেজ শক্তির গোড়াপত্তনে তাঁর অবদান অস্বীকার করা যায় না। কোম্পানির অধীনে সামান্য কেরানী হিসেবে ক্লাইভ এদেশে তাঁর কর্ম জীবন শুরু করলেও নিজ মেধা ও প্রতিভাবলে লর্ড উপাধীতে ভূষিত হন এবং বাংলার গর্ভনরের পদটি লাভ করেন। তিনি অসীম সাহসিকতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের সংকটময় মুহূর্তে আর্কট অভিযান করে তাঁদের রক্ষা করেন। তাঁর কূটনৈতিক বুদ্ধির ফলে পলাশীতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য ডুবে যায়। ফলে, এদেশে বনিকের মানদণ্ড রাজদন্ডে পরিণত হয়। দ্বিতীয়বার গভর্নর হিসেবে তিনি সামরিক ও বে-সামরিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করে কোম্পানির আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও দুর্নীতি দূর করেন। কিন্তু শাসনকাজে তাঁর দূরদর্শিতা না থাকার ফলে তাঁরই প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন এদেশের জন্য চরম দুর্ভোগ ও মৃত্যু ডেকে আনে। নবাব ও সম্রাটের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক মৈত্রী স্থাপন তাঁর কূটনৈতিক জ্ঞানের অন্যতম পরিচায়ক।

চরিত্র

রবার্ট ক্লাইভ একজন সাহসী, স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ় ও কর্মকুশল সম্পন্ন চরিত্রের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত অর্থলোলুপ ছিলেন এবং নিজ ও স্বদেশের স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর কোনো সততাবোধ, বিচারবোধ ও নীতিবোধ ছিল না। যেমন ঃ নবাবের নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ, উমিচাঁদের সাথে জাল-সন্ধি স্বাক্ষর, দস্তক ব্যবহারে বাংলার সম্পদ অপহরণ এবং জনসাধারণের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রভৃতি কাজগুলো তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক এঁকে দিয়েছে। এ প্রসংগে পার্সিভাল স্পিয়ার বলেন, "অরণ্যের পশু-পক্ষীর চোরাই শিকারীকে অরণ্যের প্রাণী সম্পদের রক্ষক করা হয়।" জনস্টন বলেন, "উপঢৌকন গ্রহণের ব্যাপারে আমাদের সামনে স্বয়ং ক্লাইভের সম্মানিত দৃষ্টান্ত আছে।"এ সকল দোষ-ত্রুটি থাকা সত্বেও এ কথা স্বীকার করতে হয় রবার্ট ক্লাইভই উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেছিলেন। তাই উপমহাদেশের ইতিহাসে রবার্ট ক্লাইভের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	রবার্ট ক্লাইভের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের বিবরণ দিতে চেষ্টা করবেন।

সারাংশ

উপমহাদেশের ইতিহাসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে লর্ড ক্লাইভের নাম অবিস্মরণীয়। কেননা প্রথম পর্যায়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে কোম্পানিকে রক্ষা করেন; দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বাংলা জয় করেন। তৃতীয় পর্যায়ে তিনি নবাব ও সম্রাটকে নিয়ন্ত্রণ করে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হন এবং ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ক্লাইভের কৃতিত্বের মূলে তাঁর তেজস্বীতা, সাহসিকতা, কূটবুদ্ধিতা, কর্মকুশলতা বিশেষভাবে কাজ করেছিল। কিন্তু তা সত্বেও তিনি সম্মান পান নি তাঁর নিজ দেশে। কারণ তিনি ছিলেন অতিশয় অর্থলোলুপ, নীতিবোধ বিবর্জিত এক মানুষ। শাসন কাজেও তাঁর দূরদর্শিতা দেখা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) রবার্ট ক্লাইভ খ) কার্টিয়ার গ) ওয়াটসন ঘ) কর্নওয়ালিস

২। কত খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ দ্বিতীয় বার বাংলায় আসেন?
ক) ১৭৬৪ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৬ ঘ) ১৭৬৭

৩। "অরণ্যের পশু পক্ষীর চোরাই শিকারীকে অরণ্যের প্রাণী সম্পদের রক্ষক করা হয়।" উক্তিটি করেন কে?
ক) পার্সিভাল স্পিয়ার খ) জনস্টন গ) কর্নওয়ালিস ঘ) হোস্টিংস

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে শান্তির সময়েও সৈন্যদের দ্বিগুণ ভাতা দেয়া হতো। সেনা বিভাগের খরচ কমানোর জন্য সৈন্যদের এ ভাতা বন্ধ করে দিলে সেনা বিদ্রোহ দেখা দেয়।

৪। উদ্দীপকের সেনা বিদ্রোহ দমন করেন কে?
ক) কার্টিয়ার খ) মনরো গ) ক্লাইড ঘ) ওয়াটসন

৫। উক্ত নেতার কুট কৌশলের কারণেই–
i. পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ পতাকা উত্তোলন সম্ভব হয়
ii. ইংরেজ শাসনের ভিত্তি সুনিশ্চিত হয়
iii. কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ মীর কাশিম ও বক্সারের যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার শেষ প্রচেষ্টাকারী হিসেবে নবাব মীর কাশিম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বক্সার-যুদ্ধের পটভূমি বা কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বক্সার যুদ্ধের গুরুত্ব বা ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	মীর কাশিম, বক্সারের যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, মসনদ

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর বাংলার মসনদ লাভ করেন। কিন্তু রাজকোষ শূন্য থাকায় মীর জাফর তাঁর ব্যক্তিগত স্বর্ণালঙ্কার, হীরা, জহরত ও মূল্যবান আসবাবপত্র বিক্রি করে প্রতিশ্রুত দেড়কোটি টাকা দিতে ও দরবারে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার অনুমতি দিতে বাধ্য হন। ফলে তিনি দেউলিয়া হয়ে ইংরেজ নির্ভর হয়ে পড়েন। এদিকে ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় সেনাবিদ্রোহ দেখা দেয়, ক্লাইভের সাহায্যে ঢাকার বিদ্রোহ দমন করা হয়। তবে বকেয়া বেতনের দাবিতে সংঘটিত পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয় নি। মীর জাফর নবাবী পেলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ কিংবা ভোগ করার ভাগ্য তার জোটে নি। এ কারণে মীর জাফর উদ্ধত ইংরেজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করতে খানিকটা প্রয়াস নেন। কিন্তু তার অযোগ্যতা, ওলন্দাজদের সঙ্গে পত্রালাপ এবং প্রতিশ্রুত অতিরিক্ত অর্থ না দেয়ার অজুহাতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অস্থায়ী গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্টের প্রস্তাবক্রমে মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করা হয় (১৭৬০ খ্রি.)।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তিনিও কোম্পানিকে অনেক সুবিধাদানের শর্ত সাপেক্ষে ক্ষমতা লাভ করেন। মীর কাশিম মীর জাফরের মতো অপদার্থ, অযোগ্য ও হীন চরিত্রের ছিলেন না। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ইংরেজদের সাথে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, যা হীন চরিত্রের অধিকারী মীর জাফরের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত নানাবিধ কারণে নবাব মীর কাশিমও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তাই বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজ আধিপত্য উপমহাদেশের গভীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বাংলার স্বাধীন হওয়ার শেষ আশাটুকু নিভে যায়।

বক্সার যুদ্ধের কারণ

মীর কাশিম বাংলার মসনদে আরোহণ করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরেজদের সাথে ভবিষ্যতে তাঁর সংঘর্ষ সুনিশ্চিত। কারণ মীর কাশিম ছিলেন- মীর জাফরের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ইংরেজদের সাথে ঝগড়া করার ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও ইংরেজদের হাতে ক্রীড়নক হয়ে থাকার মতো হীন মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। তাই তিনি প্রকৃত নবাব হিসেবে দেশ শাসন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি দেশ, জাতি ও স্বীয় স্বার্থে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যা বক্সারের যুদ্ধের কারণে পরিণত হয়।

১. সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ

রাজধানী স্থানান্তর

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন বলে সিংহাসনে বসেই মীর কাশিম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক-হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে তারাই যে এদেশের ভাগ্য বিধাতা হয়ে দাঁড়াবে। রাজধানীতে ইংরেজ রেসিডেন্টের শাসনকার্যে অবৈধ হস্তক্ষেপ স্বাধীনচেতা মীর কাশিমের নিকট অসহনীয় ছিল। তাই প্রশাসনকে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং চারপাশে পরিখা-খনন করে ও দুর্গ নির্মাণ করে রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।

মীর কাশিমের মনে হয়েছিল যে ইংরেজরা পুনরায় মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাতে পারে। সুতরাং তাঁকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য মীর কাশিম সামরু ও মার্কার নামে দু'জন ইউরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ বাহিনীকে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে তিনি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ হতে স্বাধীন থাকার জন্য মুঙ্গেরে কামান, বন্দুক ও গোলাবারুদ নির্মাণের ব্যবস্থাও করেন।

বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরেজ প্রীতি ও দুর্নীতি লক্ষ করে মীর কাশিম তাঁকে পদচ্যুত ও তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে মীর কাশিমের এ সমস্ত কার্যাবলি ইংরেজদের মনে অসন্তোষ ও সন্দেহের সৃষ্টি করে। ফলে তা যুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দেয়।

২. বাদশাহী ফরমানের অবমাননা

১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুগল সম্রাট ফররুখ শিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত ফরমান বলে কোম্পানি বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। কিন্তু এ ফরমান অমান্য করে কোম্পানির অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী 'দস্তক' নামক ছাড়পত্রে মাল আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত কথাটি লিখিয়ে বিনা শুল্কে কোম্পানির মাল একস্থান থেকে অন্যস্থানে আনা নেয়া করতো। এ সমস্ত 'দস্তক' স্বাক্ষরের ভার নবাব কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারির উপর দেন। ফলে দেশীয় বণিকগণ ব্যবসা ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং নবাব নিজেও প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক হতে বঞ্চিত হতে থাকেন।

৩. অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন

অবৈধভাবে এ আন্তঃবাণিজ্য চলতে থাকায় দেশীয় বণিকরা ইংরেজ বণিকদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অসমর্থ হয়। মীর কাশিম এ বিষয়ে গভর্নরের কাছে প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু নবাব প্রতিকার না পেয়ে ইংরেজ ও দেশীয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীদের উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেন। এতে নবাবের রাজস্ব আয় কমে গেলেও দেশীয় বণিকদের সাথে বিদেশি বণিকদের অন্যায় প্রতিযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এ নতুন ব্যবস্থার ফলে ইংরেজদের স্বার্থে আঘাত লাগে।

বক্সারের যুদ্ধ

প্রথমেই কলকাতা ইংরেজ কুঠিরের অধ্যক্ষ এলিসের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষ শুরু হয়। অধ্যক্ষ এলিস হঠাৎ পাটনা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। ফলে বাধ্য হয়ে নবাবকে এলিসের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়। মীরকাশিম পাটনা হতে এলিসকে বিতাড়িত করে পাটনা পুনরুদ্ধার করলে কোলকাতা-কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু নবাব তাঁর সৈন্য সংখ্যা বেশি থাকা সত্বেও গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে (১৭৬৩ খ্রি.) শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইংরেজগণ আবার মীর জাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে বাংলার সিংহাসনে বসালেন। নতুন নবাব মীর জাফর মীর কাশিম কর্তৃক জারীকৃত সকল ঘোষণা ও বিধি প্রত্যাহার করে নিলেন। এতে ইংরেজরা আবার প্রমাণ করলো যে তারাই বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস এবং নবাব বানানোর ও নামানোর মালিক।

মীর কাশিম পরাজিত হওয়া সত্বেও হাল ছাড়েন নি। অতঃপর মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুগল সম্রাট শাহ আলমের সহায়তায় ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু বিহারের বক্সার নামক স্থানে মিলিত বাহিনী মেজর মনরোর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

ফলাফল বা গুরুত্ব

বক্সারের যুদ্ধ বাংলা তথা উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূরপ্রসারী ফল এনে দিয়েছিল। এ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে।

১. এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে দিল্লির মোগল সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করেন।
২. অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে গেলেন।
৩. মীর কাশিম আত্মগোপন করলেন। অবশেষে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সন্নিকটে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।
৪. এ যুদ্ধের ফলে মীর কাশিমের ইংরেজ বিতারণ ও স্বাধীনতা রক্ষার শেষ আশা-ভরসাটুকুও ধূলিসাৎ হয় এবং উপমহাদেশে ইংরেজ প্রভাব ও মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়।
৫. এ যুদ্ধের ফলে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও বিনা বাধায় ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পথ উন্মোচিত হয়।
৬. কোম্পানি অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দু'টি কেড়ে নেয়।
৭. এ যুদ্ধে কেবল মীর কাশিম পরাজিত হন নি; স্বয়ং সম্রাট শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হয়েছিলেন। ফলে দিল্লি থেকে বাংলা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত ইংরেজদের অধীনে চলে যায়।
৮. এ যুদ্ধের ফলে ক্লাইভ দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্রাটের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিওয়ানী (রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব) লাভ করেন। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় ও কোম্পানি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়।
৯. ঐতিহাসিক জেম্‌স স্টিফেন্স বলেন, "বৃটিশ শক্তির উৎপত্তি হিসেবে উপমহাদেশে পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।" কারণ- মীর কাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার নবাবী আমল শেষ হয়ে যায় এবং পরবর্তী ঘটনাবলি ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনের যুগ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বক্সারের যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে লিখবেন।

সারাংশ

পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের সাহায্য করার পুরস্কার স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর বাংলার সিংহাসন লাভ করেও প্রকৃত নবাব হতে পারেন নি। ইংরেজদের ক্রমাগত চাহিদা মেটাতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে শর্ত সাপেক্ষে বাংলার সিংহাসনে বসান। স্বাধীনচেতা মীর কাশিম ইংরেজদের বাংলার স্বার্থ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে ইংরেজরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে এবং ভেতরে ভেতরে নিজেরাও প্রস্তুত হতে থাকে। এ সময় গভর্নর এলিস হঠাৎ করে পাটনা দখল করলে মীর কাশিম তা পুনরুদ্ধার করেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা কাউন্সিল যুদ্ধ ঘোষণা করলে মীর কাশিম গিরিয়া, উদয়নালা ও কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি এডামসের হাতে পরাজিত হন। পরবর্তী সময়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্য লাভ করেও বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রি.) পুনরায় তিনি ইংরেজ সেনাপতি মেজর মনরোর হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে বাংলার নবাবের অবশিষ্ট মর্যাদাটুকুও অবলুপ্ত হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হলে ইংরেজগণ তাঁর পুত্র নজমুউদ্দৌলাকে নাম মাত্র নবাবী দিলেন বটে, তবে প্রকৃত ক্ষমতা থাকলো কোম্পানির হাতে। পরবর্তী সময়ে সম্রাট ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে কোম্পানিকে বাংলার বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানীর দায়িত্ব দেন। এভাবে বক্সারের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজরা গ্রাস করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মীর কাশিম কত খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন?
ক) ১৭৬০ খ) ১৭৬১ গ) ১৭৬২ ঘ) ১৭৬৩

২। কত খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়?
ক) ১৭৬২ খ) ১৭৬৩ গ) ১৭৬৪ ঘ) ১৭৬৫

৩। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজদের সেনাপতি ছিলেন–
ক) এলিস খ) মনরো গ) এডামস ঘ) হলওয়েল

৪। মীর কাশিম রাজধানী স্থানান্তর করেন কোথায়?
ক) মুঙ্গেরে খ) পাটনায় গ) কলকাতায় ঘ) উদয়নালায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ইংরেজদের একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে ইংরেজ ও এ দেশিয় ব্যবসায়ী নির্বিশেষে সকল ব্যবসায়ীর উপর থেকে বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেয়া হয়।

৫। উদ্দীপকের বাণিজ্য শুল্ক উঠিয়ে দেন কে?
ক) মীর কাশিম খ) মীর জাফর গ) নজুমদ্দৌলা ঘ) রামনারায়ন

৬। উক্ত নবাব রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন–
i. রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করে
ii. রাজধানীর চারদিকে পরিখা খনন করে
iii. দুর্গ নির্মাণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ও এর ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দিউয়ানি বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্লাইভ কী ভাবে দিউয়ানি লাভ করলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্লাইভের দিউয়ানি লাভের ফলাফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	খাজনা, বিচার, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন

পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এবং বক্সারের যুদ্ধে নবাব মীরকাশিম পরাজিত হওয়ার পর ইংরেজদের গতিরোধ করার মতো শক্তি ও সাহস এদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আর তখন থেকেই বাংলার শাসন ব্যবস্থায় ইংরেজরা সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে কিভাবে ইংরেজগণ এই সরাসরি হস্তক্ষেপের ক্ষমতা লাভ করে? এ প্রসংগে বলা দরকার যে, মুগল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ শাসনের জন্য দু'টি সমপর্যায়ের পদের বিধান ছিল। একটি সুবাদারী, আরেকটি দিউয়ানি। সুবাদার ও দিউয়ান উভয় ব্যক্তিই সরাসরি দিল্লির সম্রাটের নিকট ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। তাঁরা একে অপরকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেন, কিন্তু একে অন্যকে তাঁর অধীন করতে পারতেন না। সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার, প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা, আর দিউয়ানের দায়িত্ব ছিল মূলত রাজস্ব (খাজনা) শাসন। তাই দিওয়ানী লাভের

অর্থ রাজস্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করা। কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেন স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতাকামী হয়ে না পড়ে সে উদ্দেশ্যেই এ ক্ষমতা বিভাজনের ব্যবস্থা ছিল। প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনও ছিল এই ব্যবস্থার আর এক লক্ষ্য।

মুর্শিদকুলী খানের (১৭১৭ খ্রি.) সুবাদারী লাভ পর্যন্ত সুবাদারী ও দিউয়ানের পদ পৃথক পৃথক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদকুলী খানই প্রথম যিনি মুগল শাসনতান্ত্রিক প্রথা ভঙ্গ করে দিউয়ানের পদটিও নিজে দখল করে নেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খানের পরবর্তী সব সুবাদারগণই সুবাদারী ও দিউয়ানীর পদ একত্রীভূত রাখেন। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সুবে বাংলা প্রায় স্বাধীনভাবে শাসিত হতে থাকে।

মারাঠা উৎপাতের কারণে আলীবর্দ্দী খান কেন্দ্রকে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ করে দেন। সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের আমলে কেন্দ্রকে রাজস্ব দেয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পলাশীর যুদ্ধের পর হতে কোম্পানি ছিল দেশের হর্তাকর্তা। কেন্দ্রীয় রাজনীতি তথা সমগ্র উপমহাদেশের রাজনীতি এমনভাবে পরিবর্তিত হচ্ছিল যে, সুবে বাংলা আবার আগের মতো বেশি করে রাজস্ব কেন্দ্রে (দিল্লিতে) পাঠাবে— এমন আশা সম্রাট শাহ আলম ছেড়েই দিয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে সম্রাট কয়েকবার কোম্পানিকে বাৎসরিক কিছু উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলে কোম্পানি তা প্রত্যাখ্যান করে।

এদিকে বক্সার যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা চরমে উঠলে এবং বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হলে, ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে পড়লেন। ফলে ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ কোম্পানির দুর্নীতি দমন ও স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য পুনরায় ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দান করে বাংলায় দ্বিতীয়বার প্রেরণ করেন (১৭৬৫-১৭৬৭ খ্রি.)। এদেশে এসেই তিনি মীর কাশিমের মিত্রশক্তি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লির সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের প্রতি নজর দেন। বক্সার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি পেয়ে অযোধ্যার নবাবের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। তারপর তিনি দিল্লির দুর্বল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। ক্লাইভ কারা ও এলাহাবাদ জেলা দু'টি ও বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের বিনিময়ে সম্রাটের নিকট হতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করলেন (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ১২ আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিউয়ানি সনদ লাভ করে)।

ফলাফল ও গুরুত্ব

কোম্পানির দিক থেকে বাংলার দিউয়ানি লাভ ছিল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

প্রথমত: দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য একটি বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। এর ফলে সম্রাট ও নবাব একেবারে ক্ষমতাহীন হয়ে ইংরেজদের হাতের পুতুল বনে যায়। নবাবের না ছিল রাজস্ব আদায়ের অধিকার, না ছিল সেনাদল রাখার মতো অর্থবল। নবাবকে নামমাত্র সিংহাসনে বসিয়ে রেখে কোম্পানিই সকল ক্ষমতা অধিকার করে নেয়। ফলে বাংলায় আইনত ও কার্যত ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত: কোম্পানির দিউয়ানি লাভ ছিল কোম্পানির জন্য আরও একটি বিরাট অর্থনৈতিক বিজয়। এর ফলে কোম্পানি নিজের দেউলিয়া অবস্থা হতে রক্ষা পায়। দিউয়ানি লাভের সুযোগ সুবিধা Court of Directors-কে অবহিত করতে গিয়ে লর্ড ক্লাইভ বলেন যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা থেকে যে রাজস্ব পাওয়া যাবে তা এত বেশি যে, সম্রাট ও নবাবের নির্ধারিত ভাতা ও অন্যান্য সামরিক ও বেসামরিক খাতে সমস্ত ব্যায় বাদ দিলেও কোম্পানির হাতে নেট আয় থাকবে ১২ কোটি টাকারও উপর (১৭৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব হিসেব থেকে)।

তৃতীয়ত: লর্ড ক্লাইভ Court of Directors-কে আরও জানান যে, ঐ উদ্বৃত্ত রাজস্ব কোম্পানির গোটা বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য যথেষ্ট। ফলে দিউয়ানি লাভের আগে এ দেশে বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপ হতে কোম্পানি যে বিপুল পুঁজি নিয়ে আসতো তা দিউয়ানি লাভের পর বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব হতেই সংগ্রহ করা হয়।

চতুর্থত: দিউয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির কর্মচারীরা বাংলায় শুল্কহীন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পায়। এতে কোম্পানির কর্মচারীদের অর্থের লোভ দিন দিন বাড়তে থাকে। অসুদুপায়ে রাজস্ব আদায় ও আত্মসাৎ করলেও কোম্পানির কর্তারা কোনো পদক্ষেপ নিতেন না। এভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে এদেশের মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়।

পঞ্চমত: দিউয়ানি লাভের পর বাংলা থেকে ব্যাপকভাবে অর্থ ও সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। তাই ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দিউয়ানি প্রকৃত অর্থে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোম্পানির দিউয়ানী লাভের উপর একটি নিবন্ধ লিখবেন।

সারাংশ

বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলা তথা উপমহাদেশে ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মীর কাশিমের নবাবী লাভের আগেই ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এদেশে কোম্পানির দুর্নীতি দমনের ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য আবার তাঁকে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করে দ্বিতীয় বার এদেশে প্রেরণ করে। ক্লাইভ বাংলায় এসে দেখেন যে বক্সারের যুদ্ধে ত্রি-পক্ষীয় শক্তিকে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত করার ফলে কোম্পানির একশ্রেণীর কর্মকর্তারা বাংলা ছাড়া অযোধ্যা ও দিল্লিতে আধিপত্য স্থাপনের কথা ভাবছে। ক্লাইভ অত্যন্ত বাস্তববোধ সম্পন্ন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। অবশেষে তিনি দিউয়ানি লাভের মাধ্যমে ব্রিটিশ শক্তিকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংরেজদের এই দিউয়ানি লাভ করাকে বাংলার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং এর সূত্র ধরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'হস্তক্ষেপের সনদ' বলা যেতে পারে। ইংরেজরা উপমহাদেশ প্রায় দু'শো বছর শাসন করে। অনেক ঐতিহাসিক তাই, ইংরেজদের এই দিউয়ানি লাভ করাকে ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানি লাভ করে?
ক) ১৭৬৪ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৬ ঘ) ১৭৬৭

২। বাৎসরিক কত টাকার বিনিময়ে কোম্পানী দিউয়ানি লাভ করে?
ক) ২৪ লক্ষ খ) ২৫ লক্ষ গ) ২৬ লক্ষ ঘ) ২৭ লক্ষ

৩। কোন নবাবের সময় থেকে দিল্লিতে রাজস্ব পাঠানো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়?
ক) আলীবদ্দী খাঁ খ) সিরাজদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মীর কাশিম

৪। মোগল শাসনতান্ত্রিক প্রথা ভঙ্গ করে কে প্রথম দিউয়ানির পদটিও নিজে দখল করেন?
ক) আলীবর্দ্দী খাঁ খ) সিরাজউদ্দৌলা গ) মীর জাফর ঘ) মুর্শিদকুলী খাঁন

৫। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দিউয়ানি লাভের ফলে–
i. বাংলায় আইনত ও কার্যত ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়
ii. ব্যবসার সমস্ত পুঁজি প্রদেশের রাজস্ব থেকেই সংগ্রহ করা হয়
iii. ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুন একজন প্রাদেশিক সুবাদার। মোগল শাসনতন্ত্রে প্রদেশ প্রশাসনে দুটি সমপর্যায়ের পদ ছিল। একটি সুবাদার অন্যটি দিউয়ান। সুবাদার ও দিউয়ান উভয়ই সরাসরি সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকতেন। তারা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারতেন; কিন্তু একে অন্যকে তার অধীন করতে পারতেন না। সুবাদারের দায়িত্ব ছিল বিচার প্রতিরক্ষা ও সাধারণ প্রশাসন পরিচালনা, অন্যদিকে দিউয়ানের দায়িত্ব ছিল রাজস্ব প্রশাসন। দিউয়ানের অর্থই হলো– রাজত্ব আদায়ের কর্তৃত্ব লাভ করা। কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা যেন সেচ্ছাচারী ও স্বাধীন হতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই ক্ষমতা বিভাজনের এই ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু মামুনই প্রথম সুবাদার যিনি মোগল শাসনতান্ত্রিক এই প্রথা ভঙ্গ করে দিউয়ানের পদটিও নিজে দখল করেন।

ক. ক্লাইভকে কখন লর্ড উপাধী প্রদান করা হয়? ১
খ. "হয় খ্রিস্টাধর্ম গ্রহণ কর অথবা মৃত্যুবরণ কর"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মামুনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে সুবাদারের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তার শাসন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "ইংরেজদের দিউয়ানি লাভ ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা"– বিশ্লেষন করুন। ৪

পাঠ-৫.৬ দ্বৈতশাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- দ্বৈত শাসন বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- দ্বৈত শাসনের ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরে মন্বন্তর, নাযিম, দিউয়ান

পূর্ববর্তী পাঠে আপনারা জেনেছেন ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা এলাহাবাদ চুক্তি বলে দিউয়ানি লাভ করে। এ সময় লর্ড ক্লাইভ বাংলার গভর্নর হয়ে আসেন এবং এদেশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এক নতুন দ্বৈত শাসন নীতি প্রর্বতন করেন। দিউয়ানি এবং নিযামত-এই দ্বিবিধ শাসন কার্যের দায়-দায়িত্বের ভাগাভাগিকে দ্বৈত শাসন বলে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজস্ব আদায় ও দেশ রক্ষার ভার থাকে কোম্পানির হাতে; আর নিযামত বা বিচার ও প্রশাসন বিভাগের দায়িত্ব থাকে নবাবের উপর। কোম্পানির সরাসরি দিউয়ানির দায়িত্ব গ্রহণে বেশকিছু অসুবিধা ছিল। সরাসরি দিউয়ানি শাসনের জন্য কোম্পানির যে অর্থ ও লোক বল প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। উপরন্তু এদেশীয় ভাষা, আইন কানুন সম্পর্কে কোম্পানির কর্মচারীদের জ্ঞান না থাকায় রাজস্ব শাসন সরাসরি গ্রহণ করা ছিল কোম্পানির জন্য বিপদজনক। তা ছাড়া কোম্পানি সরাসরি রাজস্ব গ্রহণ করলে বাংলায় বাণিজ্যরত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের সাথে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। কেননা, বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় ছিল দিউয়ানির অন্তর্গত। অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো দেশীয় সরকারকে শুল্ক দিতে রাজী থাকলেও ইংরেজদের শুল্ক দিতে রাজী ছিল না। অতএব ক্লাইভ বুদ্ধি করে দিউয়ানির সমস্ত শাসনভার দেন নবাবের উপর এবং কোম্পানির কাছে রাখেন শুধু কেন্দ্রীয়ভাবে তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা। কোম্পানি ইচ্ছামত রাজস্ব সংগ্রহ করে সম্রাট ও নবাবের ভাতা এবং শাসনকার্যের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রেখে উদ্বৃত্ত অর্থ নিজেরা গ্রহণ করতো। এ ব্যবস্থার ফলে দায়দায়িত্ব ছাড়াই প্রকৃত ক্ষমতা থাকে কোম্পানির হাতে। তাই অন্যভাবে, অতি সহজেই বলা যেতে পারে যে, নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন-দায়-দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

এতকাল ধরে বাংলার নবাবগণ ছিলেন একাধারে নাযিম ও দিউয়ান। নাযিম হিসেবে তাঁরা শাসন, বিচার ও প্রতিরক্ষার কাজ চালাতেন। আর দিউয়ান হিসেবে তাঁরা রাজস্ব সংগ্রহ করে ব্যয় করতেন। কিন্তু দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের ক্ষমতা কমিয়ে তাঁর উপর অনেক দায়িত্ব দেয়া হয়; অথচ অর্থ ও ক্ষমতা ছাড়া দায়িত্ব অর্থহীন। অধিকন্তু, রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে ফৌজদারী ও দিউয়ানি বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রকৃত কর্তৃত্ব কোম্পানির হাতেই থেকে যায়। নবাব অনেক দায়িত্ব বহন করে শুধু বৃত্তিভোগী হিসেবে রয়ে গেলেন।

নবাব নাবালক হওয়ার অজুহাতে ক্লাইভ তাঁর অভিভাবক হিসেবে রাজস্ব বিশারদ সৈয়দ মুহম্মদ রেজা খানকে নিযুক্ত করে নায়েব নাজিম উপাধি দান করেন এবং তাঁর উপর বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেন। অন্যদিকে বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেয়া হয় রাজা সেতাব রায়কে। তাঁরা ছিলেন কোম্পানির প্রতিনিধি দিউয়ান। তাঁদের উপাধি দেয়া হয় নায়েব দিউয়ান। কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁরা রাজস্ব আদায় করতেন এবং কোম্পানির আদেশ মেনে চলতেন। অন্যদিকে কোম্পানির পক্ষ থেকে তাঁদের উপর নজর রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি অবস্থান করতেন। ফলে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় জটিলতার সৃষ্টি হয়। কারণ আদায়কৃত রাজস্ব থেকে শাসনকার্যের সকল ব্যায় মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ রেজা খানকে কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হতো; অথচ রাজস্ব বৃদ্ধির হার বাড়ানো বা কমানোর ক্ষমতা থেকে যেতো কোম্পানির হাতে। ফলে রেজা খানকে এমনি এক উদ্ভুত অবস্থা মোকাবেলা করতে হয় এবং জনসাধারণও এক অমানুষিক দুঃখ-দুর্দশার শিকারে পরিণত হয়। এরই ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রি.) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

ফলাফল

লর্ড ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থায় সুফলের পরিবর্তে কুফলই দেখা যায় বেশি। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার কুফল বাংলার শান্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয় এবং বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় এক চরম দুর্যোগ শুরু হয়।

প্রথমত: এ ব্যবস্থায় নবাবের দেশ শাসনের দায়িত্ব ছিল বটে; কিন্তু তাঁর কোনো ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে, কোম্পানির ক্ষমতা ছিল বটে; কিন্তু কোনো দায়িত্ব ছিল না। কর্তৃত্বের এরূপ বিভাগ বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে না। ফলে দেশে আইন শৃঙ্খলায় অবহেলার দরুন ডাকাতরা গ্রাম-বাংলায় লুঠ-পাট চালাতে থাকে। নবাব ও কোম্পানি কোনো পক্ষই এদের শায়েস্তা করার চেষ্টা করেন নি। ফলে গ্রাম-বাংলা জনশূন্য হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত: দ্বৈত-শাসনের ফলে বাণিজ্য কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলে বহু বিদেশি ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি এদেশের পণ্য কিনে নিয়ে যেত। কিন্তু কোম্পানির নতুন বাণিজ্য নীতির ফলে এদেশের ব্যবসা ক্ষেত্রে ইংরেজদের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দেশীয় ও অন্যান্য বিদেশি ব্যবসায়ীরা বাণিজ্যে মার খান এবং দেশের রপ্তানি আয় সর্ব নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। কেননা ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডে কমদামী মুর্শিদাবাদী রেশম আমদানি বন্ধ করে দেয় ইংল্যান্ডের বেশি দামী রেশম শিল্পকে বাঁচাতে। ফলে এদেশীয় কারিগররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তৃতীয়ত: দ্বৈত শাসন-প্রবর্তনের ফলে, বাংলায় 'আমিলদারী'-প্রথার উদ্ভব হয়। রেজা খান বিভিন্ন জেলার আমিলদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতেন। যেহেতু আমিলদের চাকুরীর মেয়াদ ছিল স্বল্প মেয়াদী সেহেতু তাঁরা যেভাবেই হউক রাজস্ব বেশি করে আদায় করতো। কারণ জেলার যে জমিদার যত বেশি রাজস্ব দিতে পারতো আমিলরা তাঁদেরকেই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিত। এতে করে জমিদাররা ইজারাদারে পরিণত হয়। ফলে বাংলার জনজীবন আমিলদারী ব্যবস্থায় ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চতুর্থত: কোম্পানির কর্মচারী গোমস্তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা ও অত্যাচারের ফলে দেশের সম্পদ কমতে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে; অথচ রাজস্বের হার প্রতিবছর বাড়তে থাকে। দেখা যায় যে পূর্ণিয়া জেলার বাৎসরিক রাজস্ব যেখানে মাত্র চার লক্ষ টাকা ছিল, সেখানে তা বেড়ে গিয়ে পঁচিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এমনিভাবে দিনাজপুর জেলার রাজস্ব বার লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে সত্তর লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। সম্পদের অতিরিক্ত এই রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানের উপর চাপ আসে। ফলে রাজস্ব সংগ্রহ করতে রেজা খানকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। ফলে অনেক পরগনা হতে রায়তরা আমিলদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অন্য জায়গায় পালিয়ে যায় বা পেশা পরিবর্তন করে।

পঞ্চমত: দিউয়ানি ও দ্বৈত শাসনের চূড়ান্ত পরিণাম ছিল বাংলায় 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' ধ্বংসলীলা (১৭৭০ খ্রি. ১১৭৬ বঙ্গাব্দ)। একদিকে দ্বৈত শাসনের দায়িত্বহীনতার ফলে বাংলার জনজীবনে অরাজকতা নেমে আসে, অন্যদিকে অবাধ লুণ্ঠন ও যথেচ্ছভাবে রাজস্ব আদায়ের ফলে গ্রাম্যজীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তদুপরি পরপর দু'বছর অনাবৃষ্টি ও খরার ফলে ১১৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। টাকায় একমণ হতে চাউলের মূল্য বাড়তে বাড়তে টাকায় তিন সেরে এসে দাঁড়ালো। খোলাবাজারের খাদ্যশস্য বেশি লাভের আশায় কোম্পানির কর্মচারীরা মজুদ করা শুরু করে। ফলে খাদ্যের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দলে দলে লোক খাদ্যের আশায় কলকাতা, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের দিকে ছুটে আসে। এই সময়েও খাজনা মওকুফ করা হয় নি।

ইংল্যান্ডের কৃষ্ণ মড়কের মতো ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ছিল ভয়ঙ্কর সর্বনাশা। ফলে গ্রাম-বাংলা জনশূন্য হয়। এই দুর্ভিক্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ জেলাগুলো ছিল নদীয়া, রাজশাহী, বীরভূম, বর্ধমান, যশোহর, মালদহ, পূর্ণিয়া ও চব্বিশ পরগণা। বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে বিশেষ ফসলহানি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তেমন একটা ছিল না। তাছাড়া 'নাজাই' প্রথার প্রকোপ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য কৃষকেরা ভিটে মাটি ছেড়ে পালায়। 'নাজাই' প্রথার অর্থ ছিল, কোনো একজন রাজস্ব বাকী ফেললে সেই গ্রামের অন্য কৃষকদের সেই রাজস্ব দিতে হতো। মন্বন্তরের ফলে বহু কৃষক মারা পড়ায় তাদের বকেয়া রাজস্বের দায়িত্ব জীবিত কৃষকদের উপর বর্তায়। এই দায়িত্ব বইতে না পেরে বহু কৃষক জমির স্বত্ব ছেড়ে পাইকে পরিণত হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি ও অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এ দুর্ভিক্ষের চিহ্ন বাংলায় প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

দুর্ভিক্ষের এক পরোক্ষ ফল দিউয়ানি শাসনের অবসান ঘটে। কোম্পানির রাজস্বের আয়-কমে যায়। বাণিজ্যেরও মন্দা দেখা দেয়। তাই কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য ও বাংলার কৃষি শিল্পকে রক্ষার জন্য বিলাতের পরিচালক সভা দ্বৈত শাসন লোপ

করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ওয়ারেন হেস্টিংসকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এখন থেকে কোম্পানি যেন বাংলার রাজস্ব ও শাসনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করে।

ক্লাইভের এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় একটি ভাল দিক ছিল এই যে, এটা মোগল শাসন ব্যবস্থাকে অটটু রাখে। প্রথমে কোম্পানির কর্মচারীরা রাজস্ব ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করে নি। অন্তত ক্লাইভ যতদিন কোলকাতা ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর ছিলেন ততদিন রেজা খান কৃতিত্বের সাথে মুগলী প্রথায় শাসনকার্য পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে গেলে তাঁর দ্বৈত ব্যবস্থায় ফাটল ধরে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোম্পানির দ্বৈত শাসনের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ের পর ইংরেজ বেনিয়ারা এদেশে আধিপত্য বিস্তারের যে প্রয়াস শুরু করেছিল, তাদের দিউয়ানি ও দ্বৈত-শাসন লাভের মধ্য দিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে। লর্ড ক্লাইভ এদেশে এক অভিনব শাসন ব্যবস্থা চালু করেন যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোম্পানিকে শক্তিশালী করে সম্রাট ও নবাবকে ক্ষমতাহীন করে তোলা। এতে দিউয়ানি ও দেশরক্ষার ব্যবস্থা থাকে কোম্পানির হাতে এবং বিচার ও শাসনভার থাকে নবাবের হাতে। এরই নাম দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কোম্পানি পেলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা আর নবাব পেলো ক্ষমতাহীন দায়িত্ব।

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা এদেশের জন্য কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে এনেছে বেশি। ক্ষমতা পেয়েই কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের মানুষের উপর রাজস্বের জন্য নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে। কিন্তু নবাবের হাতে কোনো ক্ষমতা না থাকায় এর বিচার সম্ভব হয় নি। ফলে দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের দারুন ক্ষতি হয়। সামগ্রিকভাবে কৃষির অবনতি, উপরন্তু অনাবৃষ্টির ফলে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা ১১৭৬ সনে) দেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যা ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। অবশেষে এর কুফলের প্রেক্ষিতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কত খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়?

ক) ১৭৫৭ খ) ১৭৬৫ গ) ১৭৬৭ ঘ) ১৭৭০

২। বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় কাকে?

ক) রেজা খাঁন খ) সেতাব রায় গ) নজমুদ্দৌলা ঘ) রামনারায়ণ

৩। কত খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়?

ক) ১৭৭০ খ) ১৭৭১ গ) ১৭৭২ ঘ) ১৭৭৩

৪। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলায় কত লোক মারা যায়?

ক) এক ষষ্ঠাংশ খ) এক পঞ্চমাংশ গ) এক চতুর্থাংশ ঘ) এক তৃতীয়াংশ

৫। কত খ্রিস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যান।

ক) ১৭৭৫ খ) ১৭৭৬ গ) ১৭৭৭ ঘ) ১৭৭৮

সৃজনশীল প্রশ্ন

জুলির নানা ব্রিটিশদের রাজকর্মচারী ছিলেন। মায়ের কাছে জুলি ব্রিটিশ শাসনের গল্প শুনছিল। মা বললেন– তখন বাংলা ১১৭৬ সাল। লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনে মানুষ জর্জরিত। কোম্পানির হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা। রাজস্বের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়া হলো। উপরিউক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরপর দুই বছর মাঠে কোনো ফসল ফলে নি। না খেয়ে মারা যায় বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ। যারা বেঁচে ছিলেন তাদেরকে পরিশোধ করতে হলো মৃত মানুষের খাজনা। ফলে উজাড় হয়ে যায় গ্রাম-বাংলার জনপদ। মায়ের চোখ-ঝাপসা হয়ে আসে। জুলি মাকে থামিয়ে দেয়।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়? ১

খ. নাজাই প্রথা কী? ২

গ. উদ্দীপকের জুলির মায়ের গল্পের সাথে পাঠ্য পুস্তকের সে দুর্ভিক্ষের সাদৃশ্য আছে তা বর্ণনা করুন। ৩

ঘ. "দ্বৈত শাসন বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল"– বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। ক ৬। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ ঃ ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন : কোম্পানি আমল (১৭৬৫-১৮৫৭ খ্রি.)

ইউনিট ৬

ভূমিকা

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজ কর্তৃত্বের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দিউয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম অধ্যায়ের সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটে। এরপর ক্রমে কর্ণাটকে ফরাসি কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাণিজ্যের প্রতিযোগিতা সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা এবং বাংলায় নবাবদের হাত হতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা। এভাবে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমেই দিন দিন বাড়তে থাকে। বাংলার বিপুল ধন-সম্পদ একদিকে যেমন কোম্পানির উন্নতি ও অগ্রগতিতে সাহায্য করে, অন্যদিকে তেমনি বাংলাকে কেন্দ্র করে উপমহাদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের এক সুবর্ণ সুযোগ আসে। সুযোগের সঠিক সদ্ব্যবহার করতে ইংরেজদের জুড়ি মেলা ভার। দেশীয় রাজশক্তিগুলোর অবক্ষয় এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ও অনৈক্য ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত করে। উপমহাদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে ইংরেজদের এ সময় তিনটি প্রধান বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। আঠরো শতকের একেবারে শেষভাগে মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিয়ে সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ওয়েলেসলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিষ্কন্টক করেন। এরপর মারাঠা নেতাদের কলহ ও অনৈক্যের সুযোগে ইংরেজরা মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নকে ভেঙ্গে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের পথে আরও একটি বিরাট বাধা অতিক্রম করে। শেষ যে শক্তিটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরাট চ্যালেঞ্জ স্বরূপ ছিল তা হলো রণজিত সিংহের নেতৃত্বে শিখ শক্তি। কিন্তু শিখ শক্তিও ইংরেজদের উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসার থামাতে পারে নি। ফলে উপমহাদেশে ইংরেজগণ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে সক্ষম হয়। এ ইউনিটের সংশ্লিষ্ট পাঠে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেস্‌লি ও লর্ড ডালহৌসির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৬.১ ওয়ারেন হেস্টিংস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ওয়ারেন হেস্টিংসের ক্ষমতা লাভের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়ারেন হেস্টিংসের সীমান্ত নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- হেস্টিংসের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- হেস্টিংসের অর্থ সংগ্রহ নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হেস্টিংসের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	'সালবই-এর সন্ধি', ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ, ওয়াড়গাঁও এর সন্ধি, ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ক্ষমতা লাভ

উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তি সুসংহত করণে হেস্টিংসের অবদান অপরিসীম। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি কলকাতায় কোম্পানির একজন লেখক বা কেরাণী হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং নিজ কর্মদক্ষতা গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কাশিম বাজারের 'রেসিডেন্ট' পদে উন্নীত হন। তিনি ফরাসি ও বাংলা ভাষা ভাল করে জানতেন, উর্দু ও আরবির সঙ্গে ও তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁর শাসন কালকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমপর্ব: ১৭৭২-১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর হিসেবে আর দ্বিতীয় পর্ব, ১৭৭৪-১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গভর্নর জেনালের হিসেবে।

ওয়ারেন হেস্টিংস

সীমান্ত নীতি

গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে হেস্টিংস সর্ব প্রথমেই সীমান্ত নীতি বিষয়ে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি লক্ষ করেন যে ইতোমধ্যে কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়েছে। সুতরাং উপমহাদেশে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করতে হলে দেশীয় রাজাদের যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলা প্রয়োজন। এজন্য তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সূচনা করেন যা পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস ইংরেজদের শত্রু মারাঠাদের আশ্রয়ে বাস করার অজুহাতে সম্রাট শাহ আলমকে দেয় বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বন্ধ করে দেন এবং সম্রাটের নিকট হতে 'বারানসীর সন্ধি' দ্বারা এলাহাবাদ ও কারা জেলা দু'টি অযোধ্যার নবাবকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রদান করেন। এভাবে হেস্টিংস অযোধ্যার শক্তি বৃদ্ধি করে একে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে একটি শক্তিশালী বাফার স্টেট হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

রোহিলা যুদ্ধ

বর্তমান যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ রোহিলা আফগান নামে পরিচিত ছিল। রোহিলাদের সাথে আগে থেকেই অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার তেমন সদ্ভাব ছিল না। তিনি রোহিলাখণ্ড জয়ের জন্য ৪০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে লর্ড হেস্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ বাহিনীর সাহায্যে নবাব সুজাউদ্দোলা মিরণ কাটরার যুদ্ধে রোহিলাদের পরাজিত করে রোহিলাখণ্ড দখল করে নেন। যুদ্ধে রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমত খান নিহত হন। রোহিলাখণ্ড নবাবের রাজ্যভুক্ত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে তাঁর সীমান্ত বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এক প্রধান ঘটনা হলো ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫ খ্রি:)। মারাঠাদের উত্তরাধিকার সংঘর্ষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপের ফলেই ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের শুরু হয়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ শুরু হলে হেস্টিংস ডাইরেক্টর সভার নির্দেশে মারাঠা সর্দার রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষে যান। তেলেগাঁও এর যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়াড়গাঁও এর সন্ধি মোতাবেক তাঁরা রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করতে এবং বিজিত রাজ্যগুলো মারাঠাদের নিকট ফেরত দিতে রাজী হয়। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস এ সন্ধি অস্বীকার করে সেনাপতি গর্ডাডের সহায়তায় আহমেদ নগর ও বেসিন দখল করেন। পুনার যুদ্ধে মারাঠাদের নিকট গর্ডাড পরাজিত হলেও সেনাপতি পপহামের নেতৃত্বে ইংরেজগণ গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করেন। অবশেষে, সিন্ধিয়ার প্রচেষ্টায় ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে 'সালবই-এর সন্ধি' (১৭৮২ খ্রি:) স্বাক্ষরিত হয়।

ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ওয়ারেন হেস্টিংসের পররাষ্ট্র নীতির অপর প্রধান ঘটনা ছিল ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। মহীশূরের রাজা কৃষ্ণ রায়কে নামে মাত্র ক্ষমতায় রেখে তাঁর অত্যাচারী মন্ত্রী নানরাজ ও ভাই দেবরাজ প্রকৃত ক্ষমতা দখল করেন। অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান হায়দর আলী নানরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং মহীশূরকে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। হায়দর আলীর অভ্যুত্থানকে ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম এ তিন শক্তি সন্দেহের চোখে দেখেন। এ তিন শক্তি মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে হায়দর আলী তাঁর কূটবুদ্ধির দ্বারা মারাঠা ও নিজামকে ইংরেজপক্ষ ত্যাগ করিয়ে নিজ পক্ষে আনতে সক্ষম হন। ফলে হায়দরের নিকট বোম্বাই ও মাদ্রাজের ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয়। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'মাদ্রাজের সন্ধির' দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-

মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে। উভয়পক্ষ একে অন্যের দখলকৃত রাজ্য ও যুদ্ধবন্দী ফেরত দিতে রাজী হয়। তদুপরি হায়দর আলী অন্যকোনো শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হলে ইংরেজ বাহিনী তাঁকে সাহায্য করবে বলে ইংরেজদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে।

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় হায়দর আলী ও ইংরেজদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি পরবর্তীকালে ইংরেজগণ অমান্য করে। এ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য হায়দর আলী ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্র ধরে উপমহাদেশে ইংরেজগণ ফরাসি কর্তৃত্বাধীন মাহে বন্দরটি দখল করে নেয় যা মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হায়দর আলী এর প্রতিবাদ করে ব্যর্থ হন। অগত্যা তিনি নিজামের সংগঠনে যোগদান করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে হায়দর আলীর মৃত্যু ঘটলে তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং বেদনোর ও ব্যাঙ্গলোর অধিকার করেন। অবশেষে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ও টিপু সুলতানের মধ্যে সম্পাদিত 'ব্যাঙ্গলোরের সন্ধির' মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর দ্বন্দ্বের সমাপ্তি ঘটে নি।

অর্থনৈতিক সংস্কার

উপমহাদেশের ইতিহাসে নানাবিধ সংস্কারমূলক কাজের জন্য হেস্টিংসের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর ক্ষমতা লাভের আগে এদেশে কোম্পানির শাসনব্যবস্থা নানান সমস্যা ও দুর্নীতিগ্রস্থ ছিল। গভর্নর হিসেবে তিনি এ সকল সমস্যা ও দুর্নীতির সমাধানে আত্মোনিয়োগ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস যে প্রশাসনিক স্থাপত্যের ভিত্তি স্থাপন করেন তার উপর অপর প্রশাসকগণ একটি বিশাল সৌধ নির্মাণ করতে সক্ষম হন।

রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং দিউয়ানী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ শাসন নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করে শাসন ও রাজস্ব বিভাগ কোম্পানির অধীনে স্থাপন করেন এবং অত্যাচারের অভিযোগে রেজা খান ও সেতাব রায়কে পদচ্যুত করেন। নায়েব দিওয়ানের পদ বিলোপ করা হয়। রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি দূর করতে ও এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতায় স্থানান্তর করে একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধির জন্য তিনি পাঁচ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারী ইজারা দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। যা 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদারগণ প্রজাদের উপর জোর জুলুম করে অর্থ আদায় করতো। ফলে প্রজাদের দু:খ দুর্দশার সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি পরে একাসালা বন্দোবস্তও প্রবর্তন করেন।

বাণিজ্য সংস্কার

হেস্টিংস কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগে কিছু সংস্কার চালু করেন। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। দস্তক প্রথা আইনত লোপ পায়। তিনি মাল চলাচলের সুবিধার জন্য কলকাতা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা ছাড়া সমস্ত শুল্ক চৌকি বন্ধ করে দেন। ফলে জমিদারগণ ইচ্ছামত শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা হারায়। কোম্পানির স্বার্থে কাপড় তৈরির জন্য তাঁতিদের উপর তিনি জুলুম নিষিদ্ধ করেন। তিনি ভূটান ও তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।

বিচার সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগের সংস্কার ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মোগল বিচার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে তাকে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও ন্যায়বিচারমূলক করার নীতি গ্রহণ করেন। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় আইন চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন যাতে শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তিনি বিচার বিভাগকে রাজস্ব বিভাগ হতে পৃথক করে প্রত্যেক জেলায় একটি করে দিওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। ইংরেজ কালেক্টর ও দেশীয় বিচারকগণ যথাক্রমে দিওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের বিচারক ছিলেন। তিনি দিওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীলের জন্য 'সদর দিওয়ানী আদালত' ও 'সদর নেজামত আদালত' নামে দু'টি উচ্চ আদালত স্থাপন করে বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। দিওয়ানী আদালত গভর্নর ও তাঁর পরিষদের দু'জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। ফৌজদারী আদালতের প্রধান ছিলেন নবাব বা নাজিম। তিনি দেশীয় কাজী বা মুফতীর সাহায্যে বিচার কাজ পরিচালনা করতেন এবং হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে বিচারের ব্যাখ্যা ও কাজ চালাতেন।

অর্থ সংগ্রহের নীতি

হেস্টিংস এক চরম দুর্যোগময় মুহূর্তে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি এদেশের দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণকে বাঁচাতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট হতে দশ লক্ষ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। আর, এ কারণে তিনি ঋণ পরিশোধ ও আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যয়-সংকোচন নীতি গ্রহণ করে গর্হিত ও নীতি বিরুদ্ধ কাজে হাত দেন।

তিনি বাংলার বৃত্তি প্রাপ্ত নবাবের বার্ষিক ভাতা অর্ধেক কমিয়ে দেন। আগেই জেনেছেন, তিনি সম্রাট শাহ্ আলমের বার্ষিক ভাতা বন্ধ করে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে কারা ও এলাহাবাদ জেলাদ্বয় জোরপূর্বক দখল নেন এবং ৫০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবকে প্রদান করেন। উপরন্তু হেস্টিংস ৫০ লক্ষ টাকা এবং ইংরেজ সৈন্যদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের বিনিময়ে নিরাপরাধ রোহিলাদের বিরুদ্ধে অযোধ্যার নবাবের পক্ষাবলম্বন করেন। এমনকি তাঁর অর্থ উপার্জনের লালসা হতে বারানসীর রাজা চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমগণও রেহাই পায় নি।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট (১৭৭৩ খ্রিঃ)

এতদিন উপমহাদেশে কোম্পানির যাবতীয় কাজ প্রথমে ইংল্যান্ডের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস পরিচালনা করত। কালক্রমে এদেশে রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শাসন কাজেও নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ বিশৃংখলা দূর করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সর্বপ্রথম উপমহাদেশের শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করে। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে শাসন আইন নামে একটি আইন পাস করেন যা 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। রেগুলেটিং এ্যাক্ট এর দ্বারা বোর্ড অব ডাইরেকট্রসকে ব্রিটিশ সরকারের নিকট কোম্পানির শাসন ও রাজস্ব সম্পর্কে সকল তথ্য পাঠাতে হতো। বাংলার গভর্নরকে গভর্নর জেনারেল আখ্যা দেয়া হয়। গভর্নর জেনারেলকে সাহায্য করার জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট একটি 'কাউন্সিল' গঠিত হয় এবং সবার সমান অধিকার দেয়া হয়। এই রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। এ রেগুলেটিং এ্যাক্ট এর দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অবশ্য কালক্রমে এই এ্যাক্টের খারাপ দিকগুলো ১৭৮১-১৭৮৪ ও ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে আইন দ্বারা সংশোধিত হয়।

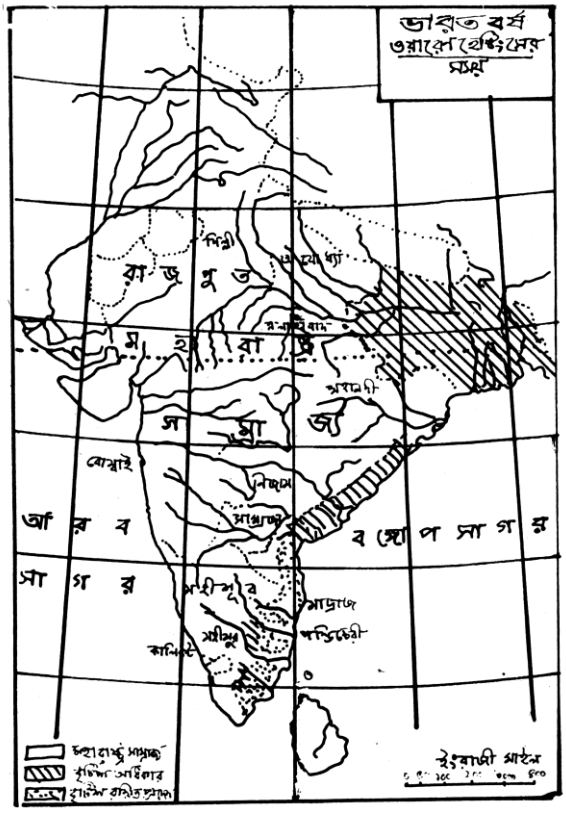

ভারতবর্ষ, ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়

চার্টার এ্যাক্ট (১৭৮৪ খ্রিঃ)

গভর্নর জেনালের হেস্টিংস ও প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থের উদ্যোগে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট পাস হয়। এ আইনে সুপ্রীম কোর্ট এবং গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছিল।

পিটের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট (১৭৮৪ খ্রিঃ)

রেগুলেটিং এ্যাক্ট-এর ভুলত্রুটি সংশোধনের জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট একটি আইন পাস করেন যা ইতিহাসে 'পিট এর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট' নামে পরিচিত। এ আইন দ্বারা পার্লামেন্ট উপমহাদেশ শাসনের সকল ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ আইনের বলে ব্রিটিশ সরকারের নিযুক্ত ৬ জন এবং ইংল্যান্ডের মন্ত্রী সভার ১ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল' এর উপর উপমহাদেশ শাসন ও পর্যবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বাড়ানো হয়। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। এছাড়া, কোম্পানির তিনজন ডাইরেক্টর নিয়ে একটি 'সিক্রেট কমিটি'ও গঠিত হয়।

পদত্যাগ ও ইমপীচমেন্ট

হেস্টিংসের কার্যকালের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ ও অপবাদ প্রকাশ পেতে থাকে। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যান। উইলিয়াম পিট ও লর্ড জান্ডাসের চেষ্টার ফলে হেস্টিংসকে বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়। বিশেষ করে চৈৎ সিংহ, অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অসদাচারণ ও অত্যাচারের অভিযোগ ছিল গুরুতর। সাত বৎসর ধরে বিচারের পর হেস্টিংস অভিযোগ হতে মুক্ত হলেন বটে, কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয় সংকুলান করতে গিয়ে তিনি একেবারে সর্বস্বান্ত হলেন। পিট ও ডান্ডাসের বিরোধিতার ফলে তাঁর ভাতাও বন্ধ করে দেয়া হয়।

শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক

ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় শিক্ষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তার আমলে মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় (১৭৮১)। গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল। হেস্টিংস এর পৃষ্ঠপোষকতায় চার্লস উইলকিন্স বাংলায় ছাপাখানা (প্রেস) স্থাপন করে।

কৃতিত্ব

হেস্টিংসের জীবনের শেষ পরিণতি দু:খজনক হলেও এ কথা মানতে হবে যে বাংলা যখন দ্বৈত শাসনের ফলে জর্জরিত, আমেরিকা যখন ব্রিটিশ শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন, পররাষ্ট্র নীতিতে ইংল্যান্ডের গৌরব যখন ক্ষুণ্ন, ভোঁসলে, নিজাম, হায়দর-এর আক্রমণে যখন ইংরেজ প্রভুত্বের ভিত্তি প্রকম্পিত, মন্বন্তরে জনপদ যখন বিরান, কোম্পানির কোষাগার যখন শূন্য প্রায়, তখন হেস্টিংস ইংরেজ কোম্পানির মর্যাদা ও শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ধৈর্য্য, সাহস ও দৃঢ় মনোবল দ্বারা তিনি শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	ওয়ারেন হেস্টিংসের ক্ষমতা লাভের পটভূমি নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

উপমহাদেশে বৃটিশ শক্তিকে সুদৃঢ় করার পেছনে হেস্টিংসের অবদান অনস্বীকার্য। ক্লাইভের শাসন ব্যবস্থার ফলে যখন বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ, ঠিক সে মুহূর্তে হেস্টিংস এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। হেস্টিংসের সীমান্ত নীতির মূল উদ্দেশ্যই ছিল কোম্পানির অধীনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও বিস্তার। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হেস্টিংসের নীতি ছিল রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করা। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও ব্যক্তিগতভাবে হেস্টিংস ছিলেন অসচ্চরিত্র, বিশ্বাসঘাতক, অর্থলোভী ও প্রতিহিংসাপরায়ন। তবে এ উপমহাদেশে যে সমস্ত শাসক এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হেস্টিংসের অবদানই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। হেস্টিংস যখন ক্ষমতায় আসেন তখন কোম্পানি ছিল রাজস্ব আদায়কারী একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। তিনি যখন কর্মভার ত্যাগ করে দেশে যাত্রা করেন তখন কোম্পানি এ উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তাই হেস্টিংসকে উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। অধীমতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন কে?
- ক) হেস্টিংস
- খ) কর্নওয়ালিস
- গ) ওয়েলেসলি
- ঘ) বেন্টিংক

২। কত খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়?
- ক) ১৭৬৮
- খ) ১৭৬৯
- গ) ১৭৭০
- ঘ) ১৭৭১

৩। টিপু সুলতান কত খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেন?
- ক) ১৭৮০
- খ) ১৭৮১
- গ) ১৭৮২
- ঘ) ১৭৮৩

৪। "ইন্ডিয়া এ্যাক্ট" আইন পাস করেন কে?
ক) লর্ড নর্থ খ) উইলিয়াম পিট
গ) ওয়ারেন হেস্টিংস ঘ) লর্ড কর্নওয়ালিস

৫। কত খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যান?
ক) ১৭৮২ খ) ১৭৮৩
গ) ১৭৮৪ ঘ) ১৭৮৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

উইলিয়াম জুনিয়র অল্প বয়সে কেরানী হিসেবে জীবন শুরু করে নিজ কর্মদক্ষতায় অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানীর রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে তিনিই কোম্পানীর সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু তার জীবনের শেষ পরিণতি দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, বিভিন্ন নীতির ফলে কোম্পাণীর গৌরব যখন ক্ষুণ্ন, দেশীয় রাজাদের আক্রমনে কোম্পাণীর ভীত যখন প্রকম্পিত, জনপদ যখন বিরান, কোষাগার যখন শূন্য প্রায়, ঠিক তখন উইলিয়াম জুনিয়রই কোম্পাণীর মর্যাদা ও শক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই তাকে কোম্পাণীর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

ক. দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন কে? ১
খ. "রেগুলেটিং এ্যাক্ট" কী? ২
গ. উদ্দীপকের উইলিয়াম জুনিয়রের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোম্পাণীর আমলের যে কর্মকর্তার সাদৃশ্য আছে তার বাণিজ্য সংস্কারের বিবরণ দিন। ৩
ঘ. উক্ত কর্মকর্তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়– বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৬.২ লর্ড কর্নওয়ালিস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- লর্ড কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগের সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লর্ড কর্নওয়ালিসের পুলিশ বিভাগের সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- লর্ড কর্নওয়ালিসের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- লর্ড কর্নওয়ালিসের ভূমি রাজস্ব সংস্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- লর্ড কর্নওয়ালিসের পররাষ্ট্রনীতি বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	প্রশাসনিক সংস্কার, বিচার সংস্কার, ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা, কর্নওয়ালিস কোড

দায়িত্ব গ্রহণ

ওয়ারেন হেস্টিংস পদত্যাগ করে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে স্যার জন ম্যাকফারসন এক বৎসর অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হিসেবে কাজ করেন। হেস্টিংস এর কার্যকলাপ সে সময় ইংল্যান্ডের জনমনে এ ধারণার জন্ম দিয়েছিল যে, কোম্পানির দুর্নীতিপূর্ণ আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবিত কোনো ব্যক্তিকে আর গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা সমীচীন নয়। আর এ কারণেই বোর্ড অব কন্ট্রোল এর সভাপতি হেনরী ডান্ডাস ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট-এর ঘনিষ্ট বন্ধু লর্ড কর্ণওয়ালিস তাদের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে গভর্নর জেনারেল হিসাবে উপমহাদেশে আসেন ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংল্যান্ডের এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সৎচরিত্রের অধিকারী। তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাপতি হিসেবে সততা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করার জন্য তাঁকে স্থায়ী গভর্নর জেনারেল করে এদেশে প্রেরণ করেন। তাই প্রয়োজনে তিনি শাসন পরিষদের মতামত উপেক্ষা করে নিজ সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। একাধারে তিনি গভর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা লাভ করেন। পিট-এর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট অনুসারে কর্নওয়ালিসকে

এদেশে রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধনীতি হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। তাই লর্ড কর্নওয়ালিস রাজ্য বিস্তরের চেয়ে বিজিত রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সংস্কারের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

প্রশাসনিক সংস্কার

সংস্কারমূলক কাজের জন্য কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল এদেশের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হেস্টিংস প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে এ উপমহাদেশীয় শাসন ব্যবস্থার মূল কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তাই লর্ড কর্ণওয়ালিস সর্বপ্রথম কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত বাণিজ্য কিংবা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ঠিক একই সময় তিনি কর্মচারী কার্য নীতি ব্যাখ্যা করে "কর্নওয়ালিস কোড" নামে কতগুলো নিয়ম কানুন চালু করেন। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের আনুগত্য, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার উপর জোর দিয়ে শাসন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করেন এবং সার্বক্ষণিক কাজ করার নির্দেশ দেন। এভাবে তিনি কোম্পানির কমচারীদের কার্য নীতি ও কার্য পদ্ধতির পরিবর্তন করে 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের' ঐতিহ্য গঠনে সাহায্য করেন।

বিচার সংস্কার

লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। পি.ই. রবার্টস এর মতে দিওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিচার সম্পর্কে হেস্টিংস যে শাসন ব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, কর্ণওয়ালিস তা সম্পন্ন করেন। কর্ণওয়ালিস রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করে পৃথক কর্মচারীদের উপর এর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। আগে কালেক্টরগণ রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। কর্ণওয়ালিসের নতুন ব্যবস্থায় তাঁদের কার্য শুধু রাজস্ব সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

তিনি দিওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন আদালত দেশীয় মুনসেফ ও সদর আমিনের অধীনে স্থাপন করেন। সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয়ের উপরে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা-কোর্ট স্থাপন করা হয়। জেলা কোর্টগুলো এক একজন ইংরেজ জজের অধীনে ছিল এবং তাঁরা এদেশীয় আইনজ্ঞদের সাহায্যে বিচার করতেন। নিম্ন আদালত হতে আপীলের জন্য কর্ণওয়ালিস কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকায় চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করে তাতে ইংরেজ জজ নিযুক্ত করেন। দিওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ বিচারালয় সদর দিওয়ানী আদালত নামে পরিচিত ছিল। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল এই বিচারালয়ের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন।

ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা

ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য সর্বোচ্চ আদালত 'সদর নিজামত আদালত' নামে পরিচিত ছিল। হেস্টিংস এই আদালত মুর্শিদাবাদে স্থাপন করেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের সদস্য এ আদালতের বিচারক ছিলেন। ফৌজদারী বিচারের জন্য কর্ণওয়ালিস চারটি 'সেসন আদালত' স্থাপন করেন। প্রত্যেক আদালতে দু'জন করে ইংরেজ জজ ও কতিপয় এদেশীয় মুসলমান ও হিন্দু আইনজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্যে বিচারকার্য চলতো। এ আদালত নিজ নিজ এলাকার জেলাগুলোতে ঘুরে ঘুরে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করতো বলে এ আদালতগুলোকে 'ভ্রাম্যমান আদালত' বলা হতো। ভ্রাম্যমান বিচারালয়ের বিচারকগণ বছরে দু'বার করে বিভিন্ন জেলায় যেতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারি বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। পূর্বে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সকল নিষ্ঠুর দন্ড দানের রীতি ছিল কর্ণওয়ালিস তা উঠিয়ে দেন। কর্ণওয়ালিস হত্যার অপরাধকে সমাজ বিরোধী বলে ঘোষণা করেন এবং সকল বৈষম্যমূলক ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে আইনের চোখে সকলকে সমান অধিকার দান করেন।

বাণিজ্য ব্যবস্থা

লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কারের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রথম হতেই কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারিগণ কোম্পানির স্বার্থ না দেখে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত হয়। পূর্বে এ দেশ হতে যে সমস্ত পণ্য ইংল্যান্ডে রফতানি করা হতো তা ইংরেজ কর্মচারিগণ ঠিকাদার হিসেবে দেশীয় বণিকদের নিকট থেকে ক্রয় করত। ফলে কর্মচারিদের লাভ হতো বটে, কিন্তু কোম্পানি বিরাট লভ্যাংশ হতে বঞ্চিত হতো। তাই কর্ণওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থে সরাসরি দেশীয় বণিকদের নিকট থেকে মালামাল সংগ্রহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। কোম্পানির কর্মচারিরা দেশীয়

বণিকদের উপর অত্যাচার করত। তাই কর্ণওয়ালিস দেশীয় বণিকদের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য কোম্পানির কর্মচারিদের নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা কোম্পানি ও দেশীয় বণিকদের উপকার সাধন করেছিল।

পুলিশ ব্যবস্থা

কর্ণওয়ালিস এদেশীয় শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য প্রদেশগুলোকে জেলায় এবং জেলাগুলোকে থানায় বিভক্ত করেন। প্রতি থানায় একজন করে এদেশীয় দারোগা নিযুক্ত করা হয়। জেলার সর্বময় কর্তা ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁর উপর পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট জেলার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। পূর্বে জমিদারগণের উপর নিজ এলাকায় শান্তি রক্ষার জন্য যে দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয় এবং তাদের রক্ষি বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়। পুলিশ বাহিনীর জন্য নিয়মিত বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একজন পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট নিযুক্ত করা হয়। এভাবে পুলিশ ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনায়ন করা হয়।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনামলের ভূমি রাজস্ব সংস্কার একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রবর্তিত জমির পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্তের ভুলত্রুটি নিরসনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস জমির দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই সংস্কার ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে জমিদাররা জমির স্থায়ী মালিক হন এবং তাঁদের দেয় করের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা নিয়মিত কর প্রদান সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে জমির মালিক হয়ে যান। তবে এ ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের দুর্দশা বেড়ে যায় ও জমির উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ ব্যবস্থায় সূর্যাস্ত আইনের বলে বহু জমিদারী নিলামে উঠে এবং বহু নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয় যা এদেশে বিদেশি শাসকদের হাতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।

পররাষ্ট্রনীতি

পিট এর ইন্ডিয়া এ্যাক্ট এর শর্তানুযায়ী কর্ণওয়ালিসকে উপমহাদেশে রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি ক্ষেত্র বিশেষে তা পালন করেন নি। মারাঠারা অযোধ্যায় গোলযোগ সৃষ্টি করলে কর্ণওয়ালিস সিন্ধিয়াকে সাহায্য করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের প্রবল শত্রু মহীশূরের টিপু সুলতানকে দমন করার জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস নিজামের সাথে মিত্রতা করেন। ফলে টিপু ব্যাঙ্গালোরের সন্ধির (১৭৮৪ খ্রি:) শর্তাবাল ভঙ্গ করে ইংরেজদের মিত্র রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন। এভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয় (১৭৮৯ খ্রি:)।

লর্ড কর্নওয়ালিস মারাঠা এবং নিজামের সাথে এক হয়ে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তম অবরুদ্ধ করলে, টিপু ইংরেজদের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির শর্তানুসারে টিপু মহীশূর রাজ্যের একাংশ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্থ ইংরেজদের প্রদান করতে বাধ্য হলেন। ভবিষ্যত আচরণের জামিন হিসেবে টিপু তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হলেন। এভাবে কর্ণওয়ালিস উপমহাদেশের দক্ষিণ ভাগে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সক্ষম হন।

১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানির উপমহাদেশে বিশ বৎসর বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় কোম্পানিকে এদেশে বাণিজ্যের অধিকার দেয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে এক তীব্র আন্দোলন হয়। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের বাণিজ্য সকল ইংরেজ বণিক এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া। কিন্তু সে দাবী অনুযায়ী কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার উঠিয়ে দিলে অন্যান্য ইংরেজ বণিকদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের এদেশীয় বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটবে, এ যুক্তি দেখিয়ে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট দ্বারা আরও বিশ বৎসরের জন্য কোম্পানিকে এদেশে বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার দেয়া হলো।

শিক্ষার্থীর কাজ	কর্নওয়ালিসের শাসনকালের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।

সারাংশ

বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ এর সভাপতি লর্ড ডান্ডাস এবং প্রধানমন্ত্রী পিট এর অন্তরঙ্গ বন্ধু লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হিসেবে ক্ষমতায় বসেন। উপমহাদেশের ইতিহাসে তাঁর শাসনকাল রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা সংস্কারমূলক কার্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিচার ও ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন আনেন। 'কর্নওয়ালিস কোড' দ্বারা কার্য নীতির পরিবর্তন সাধন কোম্পানির কর্মচারীদের ঐতিহ্য গঠনে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া ইংরেজ যুগে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস নামে যে উচ্চ পদস্থ কর্মচারীরা প্রসিদ্ধ হয়েছিল তার প্রথম পত্তন কর্ণওয়ালিস করেছিলেন। তাঁর সময়েই পুলিশ ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনায়ন করা হয়। তাই লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকাল উপমহাদেশের ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কর্নওয়ালিস কত খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে আসেন?
ক) ১৭৭৫ খ) ১৭৭৬ গ) ১৭৭৮ ঘ) ১৭৭৯

২। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের গোড়া পত্তন করেন কে?
ক) কর্নওয়ালিস খ) ওয়েলেসলি গ) বেন্টিংক ঘ) ডালহৌসি

৩। সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন করেন কে?
ক) হেস্টিংক খ) কর্নওয়ালিস গ) ওয়েলেসলি ঘ) ডালহৌসি

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করার জন্য পার্লামেন্ট জন পিটারকে স্থায়ী গভর্নর জেনারেল করে প্রেরণ করেন। তাই তিনি শাসন পরিষদের মতামতকে উপেক্ষা করে একাই সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কারণ একাধারে তিনি গভর্নর জেনারেল ও প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা লাভ করেছিলেন।

৪। উদ্দীপকের জনপিটারের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোম্পানি আমলের কোন কর্মকর্তার সাদৃশ্য আছে?
ক) ক্লাইভ খ) হেস্টিংস গ) কর্নওয়ালিস ঘ) ওয়েলেসলি

৫। উক্ত কর্মকর্তা ছিলেন–
i. বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর সভাপতি হেনরি ডান্ডাস এর ঘনিষ্ট বন্ধু
ii. ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট এর অন্তরঙ্গ বন্ধু
iii. আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাপতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, কৃষি বিপ্লব

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস আটচল্লিশ বছর বয়সে বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকাল নানাবিধ সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। তার মধ্যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটা নিশ্চিত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত এক নতুন ব্যবস্থার প্রস্তাব কোম্পানির নিকট পেশ করেন যা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে অনুমোদন লাভ করে। তা ইতিহাসে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ বন্দোবস্তের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আলোচনার সূত্রপাত হয়। এর পক্ষে কর্ণওয়ালিসের যুক্তি ছিল এই যে, ভূমি ব্যবস্থায় স্থায়িত্ব এলে স্বাভাবিকভাবেই জমিদারগণ ভূমিতে পুঁজিবিনিয়োগ করবেন এবং নিজ স্বার্থেই জমিদার তাঁর উদ্বৃত্ত অর্থ জমির উন্নয়নে ব্যবহার করবেন। তার ফলে জমি উন্নত হবে, কৃষিতে উৎপাদন বাড়বে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কর্ণওয়ালিস জমিদার পুত্র ছিলেন বলেই মনে করেছিলেন যে, ইংল্যান্ডে যেমন ভূম্যধিকারী সমাজ কৃষিতে বিপ্লব সাধন করেছিল, তেমনি উপমহাদেশেও অনুগত জমিদার সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হবে। তাই তিনি প্রজার দিকে তেমন নজর দিলেন না। তিনি এমন এক অভিজ্ঞ জমিদার শ্রেণি খাড়া করে দিতে চাইলেন যারা শত বাধার মধ্যেও ইংরেজদের অনুগত থাকবে। আর এমনিভাবেই এ শ্রেণি হবে উপমহাদেশে ইংরেজ-রাজের রাজনৈতিক ভিত্তি।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি

কর্ণওয়ালিস যখন এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার অন্ত ছিল না। কোন একক কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় নি। এর পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে।

পূর্ববর্তী গভর্নর হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য যে পাঁচসালা বন্দোবস্তের (১৭৭২ খ্রি:) প্রথা চালু করেন, তাতে ভূমি রাজস্ব নিলাম করা হতো এবং যিনি ডাক পেতেন তিনিই জমির মালিক হতেন। এ ব্যবস্থায় উচ্চহারে ডাক নিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিলেও সে অনুপাতে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় ও সময়সীমা থাকায় জমিদারগণ প্রজা পীড়ন করত কিন্তু উন্নয়ন করত না। ফলে কৃষকগণ জমি চাষ না করায় তা বছর ধরে অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকত ও জমির দাম কমে যেত। এসব কুফল দেখা দেয়ায় হেস্টিংস জমিদারগণের সাথে 'একসালা' ব্যবস্থা চালু করেন। কিন্তু এতেও সরকার, জমিদার ও প্রজাদের অসুবিধা দেখা দেয়ায় কর্ণওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন (১৭৮৯ খ্রি:)। সাথে সাথে কর্নওয়ালিস এ বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে বলেও আশ্বাস দেন। এ বিষয়ে স্যার জন শোরের সাথে কর্ণওয়ালিসের নানা তর্ক বির্তক হয়। অবশেষে কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ এর অনুমোদন লাভের পর কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং জমির উপর জমিদারদের মালিকানা ক্ষমতা এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জমি হস্তান্তর বা দান করার ক্ষমতাও তাঁরা পান। জমিদারগণ নিজ খুশী মত শর্ত সাপেক্ষে জমি পত্তন বা ইজারা দেয়ার ক্ষমতাও লাভ করেন। কেবল শুল্ক আদায়ের ক্ষমতা, বিচার ও পুলিশী ক্ষমতা তাঁদের হাতে দেয়া হয় নি। তাছাড়া জমির রাজস্ব কিস্তি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে দিতে সক্ষম না হলে জমি নিলামে বিক্রি করার ক্ষমতা সরকারের হাতেই রয়ে গেল। তাই এই নিয়ম সূর্যাস্ত আইন নামে পরিচিত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফলের চেয়ে কুফলই ছিল বেশি।

সুফল

প্রথমত: জমিদারগণ জমির স্থায়ী মালিকানা স্বত্ব লাভ করে জমির উন্নতি বিধানের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন। ফলে, জমির উৎপাদন শক্তি ও মূল্য বেড়ে গেল। **দ্বিতীয়ত:** সরকার প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায়-সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নতুন জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে লাগলেন। **তৃতীয়ত:** দেশের এই প্রভাবশালী জমিদারগণ ইংরেজ সরকারের সহায়তা করায় ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। **চতুর্থত:** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে বাংলার সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি সাধনেও বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল। **পঞ্চমত:** বিত্তবান জমিদারগণ বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, জলাশয় ও দিঘি খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং পালা পার্বন ও সামাজিক উৎসবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে গ্রাম বাংলার গ্রামীন জীবনকে সচল করে রেখেছিলেন। **ষষ্ঠত:** এ সময়েই জমিদার শ্রেণি ও কৃষক শ্রেণির মধ্যে

সংযোগের মাধ্যমরূপে কৃষিজমির উপ-স্বত্বভোগী এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়। **সপ্তমত:** আয় সুনিশ্চিত হওয়াতে কোম্পানির বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুবিধা হয়। অস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত কুফলগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা দূর করা সম্ভব হয়েছিল।

কুফল

প্রথমত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সঠিক জরিপের মাধ্যমে জমি ভাগ না হওয়ায় নিষ্কর জমির উপর বেশি করে রাজস্ব নির্ধারিত হয় এবং জমির সীমানা নির্ধারিত না হওয়ায় পরবর্তীকালে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হতে থাকে।

দ্বিতীয়ত: এই ব্যবস্থার ফলে পরবর্তীকালে জমির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হয় নাই। ফলে সরকার বর্ধিত রাজস্বের লাভ হতে বঞ্চিত হয়।

তৃতীয়ত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ প্রজা ও কৃষকদের কোনো উন্নতি হয় নি। জমিতে প্রজাদের পুরাতন স্বত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং তারা জমিদারদের করুণার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হয়। জমিদার ইচ্ছা করলে যেকোনো সময় উচ্ছেদ করতে পারতেন। পরিশ্রম করেও কৃষকগণ যথাযথ পারিশ্রমিক পেতো না।

চতুর্থত: সূর্যাস্ত আইনের কঠোরতার জন্য অনেক বড় বড় জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে বর্ধমানের, নাটোরের, দিনাজপুরের, নদীয়ার, বীরভূমের ও বিষ্ণুপুরের জমিদারী উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া আর অন্যসব জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম সাত বছরের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়।

পঞ্চমত: জমিদারীর স্বত্ব ও আয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে নায়েব গোমস্তাদের উপর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে জমিদারগণ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস শুরু করে। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যেতে থাকে।

ষষ্ঠত: জমিতে অর্থ বিনিয়োগ করে অনায়াসে সম্পদ ও মর্যাদা লাভের আশায় শিল্প-বাণিজ্য পরিত্যক্ত হতে থাকে। ফলে গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প ও শ্রম শিল্প ক্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

সপ্তমত: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার মুসলমানগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। উইলিয়াম হান্টারের মতে, "গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাংলার মুসলমান পরিবারগুলোর অস্তিত্ব হয় পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে, না হয় ইংরেজদের সৃষ্ট নতুন ধনী সমাজের নীচে এ সময় ঢাকা পড়েছে।"

এ সময় নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফলে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাজস্ব আইন দ্বারা খাজনা বৃদ্ধি বন্ধ করেন এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রজাস্বত্ব আইন দ্বারা জমি থেকে উচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে দেন। পাকিস্তান অর্জনের পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়ে দিয়ে প্রজাদের সঙ্গে সরাসরি জমির বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জমিদার পুত্র লর্ড কর্ণওয়ালিস যে আশায় এ প্রথা চালু করেছিলেন তাঁর সে আশা সম্পূর্ণ বিফল হয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রেক্ষাপট ও ফলাফল আলোচনা করবেন।

সারাংশ

১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেসিংসের পরে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। কর্ণওয়ালিস হেস্টিংস কর্তৃক ভূমি ব্যবস্থাপনার অসুবিধাগুলো লক্ষ করে যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো অসুবিধার সৃষ্টি না হয় তার জন্য এক নতুন প্রথার প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা ছিল ইংরেজদের একটি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা। কর্নওয়ালিস ইংল্যান্ডের জমিদারী প্রথার আলোকে এদেশে অভিজাত জমিদার শ্রেণি তৈরি করতে চাইলেন প্রজার মঙ্গলের দিকে নজর না দিয়েই। এভাবেই ইংরেজরা এদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। এ ব্যবস্থার সুফলের চেয়ে কুফলই ছিল বেশি। এ ব্যবস্থার ফলে মুসলমানগণ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জরিপের মাধ্যমে না হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে কম ধরা হয়েছিল। ফলে জমিদার ও সরকার উভয়েই লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। সূর্যাস্ত আইনে অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদার সর্বশান্ত হয় আবার অনেক সংগতি সম্পন্ন মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, ব্যবসায়ী প্রমুখ জমিদার হয়ে যায়। এরাই কালক্রমে ইংরেজদের সাহায্য করে এবং রাজা মহারাজা ও নবাব উপাধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশের সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে?
ক) কর্নওয়ালিস খ) ওয়েলেসলি গ) বেন্টিংস ঘ) ডালহৌসি

২। কত খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদিত হয়?
ক) ১৭৯২ খ) ১৭৯৩ গ) ১৭৯৪ ঘ) ১৭৯৫

৩। কর্নওয়ালিসের বাবা ছিলেন–
ক) রাজা খ) লর্ড গ) জমিদার ঘ) সাধারণ প্রজা

৪। প্রজাস্বত্ব আইন করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৮৮২ খ) ১৮৮৩ গ) ১৮৮৪ ঘ) ১৮৮৫

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কত খ্রিস্টাব্দে উঠিয়ে দেয়া হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫০ গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৫৪

৬। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে–
i. রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়
ii. জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়
iii. জমিদাররা জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ লর্ড ওয়েলেসলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লর্ড ওয়েলেসলির সমস্যাসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়েলেসলির উদ্দেশ্য ও অধীনতামূলক নীতি কী তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- সাম্রাজ্য বিস্তারে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- অধীনতামূলক নীতির ফলাফল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ওয়েলেসলির সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ওয়েলেসলির চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সাম্রাজ্যবাদ, সিন্ধিয়া, ওয়েলেসলি, টিপু সুলতান

সমস্যাসমূহ

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ভারত বর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর শাসনকালকে উপমহাদেশের ইতিহাসে সংকটময় যুগ বলা যেতে পারে। জন শোরের উদার নিরপেক্ষনীতির ফলে শাসন ভার গ্রহণ করেই ওয়েলেসলি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন।

প্রথমত: ইংরেজদের চিরশত্রু মহীশূরের টিপু সুলতান তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য ফ্রান্সের বিদ্রোহী জেকোবিন ক্লাবের সাথে এবং মরিশাসের ফরাসি শাসনকর্তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। উপরন্তু তিনি ফরাসি সেনাপতি দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেনাদের সাহায্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত: কোম্পানির শর্ত অনুযায়ী মারাঠাদের বিরুদ্ধে নিজামকে সাহায্য না করায় নিজাম ইংরেজদের প্রতি অসুন্তুষ্ট হয়ে ফরাসি সেনাপতি রেমন্ডের নেতৃত্বে নিজ বাহিনীকে সুসজ্জিত করে তোলেন।

তৃতীয়ত: দৌলতরাও সিন্ধিয়া ফরাসি সেনাপতি পেরনের নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন।

চতুর্থত: একমাত্র কুর্গ ছাড়া মালাবারের সকল রাজা ইংরেজ বিরোধী হয়ে উঠেন।

পঞ্চমত: কাবুলের জামান শাহের উপমহাদেশ বিজয়ের হুমকি ইংরেজদের ভয়ে ভীত করে তোলে।

ষষ্ঠত: এ সময় ফরাসী-ইংরেজ শত্রুতার জের ধরে ফরাসি বীর নেপোলিয়ন উপমহাদেশ বিজয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন।

সপ্তমত: এ সময় কোম্পানির আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় পর্যায়ে নেমে যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্য যখন এমনিভাবে নানা সমস্যায় জর্জরিত ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে লর্ড ওয়েলেসলিকে শত্রু মোকাবিলায় অগ্রসর হতে হয়।

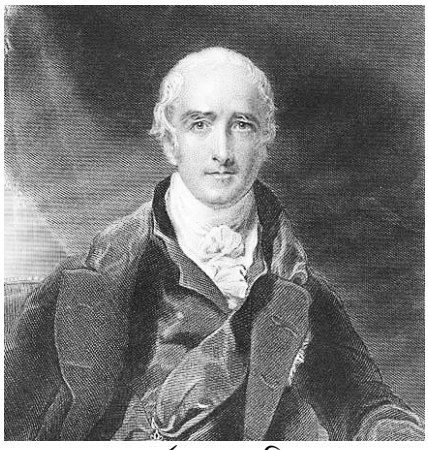
লর্ড ওয়েলেসলি

উদ্দেশ্য ও নীতি

লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী শাসক। প্রতিভাবান, বিদ্বান, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ও অভিজাত সুলভ লর্ড ওয়েলেসলি চেয়েছিলেন উপমহাদেশে ব্রিটিশ শক্তিকে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী করে তুলতে। এ ছাড়া এ উপমহাদেশ থেকে ফরাসি প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে দূর করে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপন বিফল করাও তাঁর আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। এ সকল উদ্দেশ্য সফল করে তোলার জন্য স্বভাবত:ই সামাজ্যবাদী ওয়েলেস্‌লী সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ নীতি অবলম্বন করেন।

মিত্রতা নীতি

লর্ড ওয়েলেসলি পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই এদেশবাসীর চাওয়া পাওয়াকে বিবেচনার যোগ্য মনে করেন নি। পরস্পর বিবদমান এদেশীয় রাজাগণকে ইউরোপীয় সামরিক সাহায্য গ্রহণে আগ্রহী ও উৎসাহী দেখে লর্ড ওয়েলেসলি তাঁদেরকে পুরোপুরি ইংরেজ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে চাইলেন। এ নীতি ওয়েলেসলির আগে ক্লাইভ এবং বিশেষ করে হেস্টিংস কর্তৃক অনুসৃত হয়েছিল। তবে ওয়েলেসলি এ নীতিকে নিপুণতার সাথে ব্যাপকভাবে কার্যকর করেছিলেন। তাই তিনি স্যার জন শোরের নিরপেক্ষ নীতি ত্যাগ করে সামরিক অধীনতার ভিত্তিতে গঠিত এ নীতির নামকরণ করলেন 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি'।

শর্তাবলী

লর্ড ওয়েলেসলির প্রবর্তিত এ নীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিলো :-

প্রথমত: যে সকল দেশীয় রাজা অধীনতা মূলক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হবেন, তাঁরা ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অন্যকোনো রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে কিংবা কোনপ্রকার আলাপ-আলোচনা চালাতে পারবেন না।

দ্বিতীয়ত: দেশীয় রাজাদের মধ্যে যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা নিজ সেনাবাহিনী রাখতে পারবেন তবে তা একজন ইংরেজ সেনাপতির অধীনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত: মিত্রতাবদ্ধ দেশীয় রাজ্যসমূহ হতে একমাত্র ইংরেজ ব্যতীত সকল ইউরোপীয় কর্মচারী ও নাগরিককে বিতাড়িত করতে হবে।

চর্তুথত: মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ যেকোনো দেশ তাঁদের রাজ্যে একদল সৈন্য পালন করবেন এবং তাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নগদ অর্থ বা নিজ রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দেবেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, দেশীয় রাজাদের নিরাপত্তার বিনিময়ে তাঁদের স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তার বির্সজনই এ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল।

লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রথমত: এ নীতি প্রয়োগের প্রথম শিকার হন হায়দ্রাবাদের দুর্বল নিজাম।

দ্বিতীয়ত: মহীশূরের বাঘ টিপু সুলতান এ নীতি গ্রহণ করতে রাজী না হলে কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

তৃতীয়ত: মারাঠা শক্তিকে যুদ্ধে পরাজিত করে মারাঠা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন।

চতুর্থত: ওয়েলেসলি ছোট ছোট রাজ্য যেমন তাঞ্জোর সুরাট ও কর্ণাটের উপর বল প্রয়োগ করে তাদের অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণে বাধ্য করেন। অযোধ্যার মতো বড় রাজ্য ও এ নীতির আওতা হতে বাদ পড়ে নি।

টিপু সুলতান

সংস্কার

কৃষি: লর্ড ওয়েলেসলি উপমহাদেশের কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। বিশেষ করে মহীশূরের এবং মালাবারের যে অংশ ইংরেজ অধিকারে আসে সেখানে তিনি জমি জরিপ করার জন্য ড. ফ্রান্সিস বুকাননকে নিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয় এদেশের কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে গিয়েছেন যা থেকে পরবর্তীকালে ভারত সরকার কৃষি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

বিচার ব্যবস্থা: ১. কোর্ট ফি পুনরায় চালু করেন। ২. আপিল করার নিয়ম কানুন ও আগের চেয়ে কঠিন করা হয়। ৩. সহকারী জজের সংখ্যাও বাড়ানো হয়। ৪. সদর দিউয়ানী আদালতের মামলার সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের উপর থেকে বিচারের ভার সরিয়ে নিয়ে তিনজন ও পরে চারজন জজের উপর এ দায়িত্ব দিয়ে দেন।

জমিদারের ক্ষমতা

লর্ড ওয়েলেসলি রায়তদের উচ্ছেদ করবার ও তাদেরকে গ্রেফতার করবার ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়ে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেন।

শিক্ষা: লর্ড ওয়েলেসলি এ উপমহাদেশে নতুন ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু বোর্ড অব ডাইরেকটরস্ তাঁর এ পরিকল্পনা অনুমোদন না করায় পরে তা ভারতীয় ভাষা শিক্ষার কলেজে পরিণত হয়। তারই নির্দেশে কলকাতার বর্তমান গভর্নর ভবনটি নির্মিত হয়।

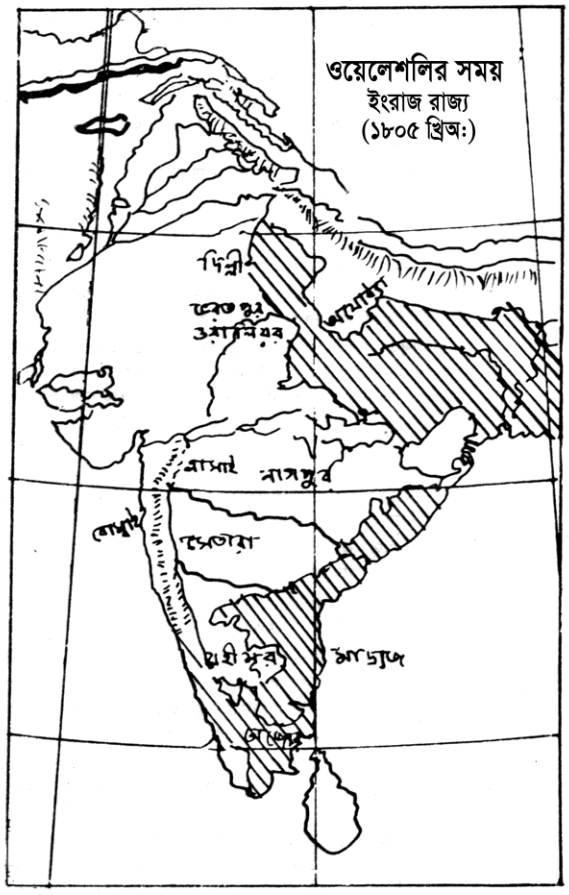

ওয়েলেসলির সময় ইংরেজ রাজ্য

চরিত্র ও কৃতিত্ব

এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠনে যে সকল গভর্নর জেনারেল অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

প্রথমত: কোম্পানির সংকটময় মুহূর্তে ওয়েলেসলি দায়িত্ব নিয়ে একে একে সকল সমস্যার সমাধান করে কোম্পানির সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটান।

দ্বিতীয়ত: ওয়েলেসলি ভারতীয় রাজাদের মধ্যে সব চেয়ে স্বাধীনচেতা, ইংরেজের চিরশত্রু টিপুকে পরাজিত ও নিহত করে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ শক্তিকে অপ্রতিহত করে তোলেন।

তৃতীয়ত: ওয়েলেসলি মারাঠা শক্তিকে ধ্বংস করে মারাঠাদের সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির উপর নির্ভরশীল করে তোলেন।

চতুর্থত: ওয়েলেসলি হায়দ্রাবাদ মহীশূর ও মারাঠা সংঘকে ধ্বংস করে দাক্ষিণাত্য হতে ফরাসি প্রভাব ও প্রাধান্য সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করেন।

পঞ্চমত: তিনি মিশরের দিকে ফরাসি অগ্রগতিকে বন্ধ করার জন্য মিশরকে সামরিক সাহায্য দিয়ে এবং পারস্যের দিকে রাশিয়ার অগ্রগতিকে বাধাদানের জন্য পারস্যে একটি মিশন প্রেরণ করে তাঁর রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দেন।

ষষ্ঠত: ওয়েলেসলি অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই বিচার, কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করেছিলেন। এটা তাঁর কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজ। ফলে তাঁকে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। তিনি এতই অহংকারী ছিলেন যে তা ঔদ্ধত্য বলে মনে হতো। তিনি অন্যের অসুবিধা ও কষ্টকে কিছু মনে না করে নিজের ইচ্ছাকেই চাপিয়ে দিতেন। ফলে এদেশীয় মানুষের দুঃখ দুর্দশা বেড়ে গিয়েছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কিভাবে শুরু হয়েছিল তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। যেকোনো উপায়ে হোক, ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির জন্য ব্যাকুল এ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এদেশের দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পেরেছিলেন। আর এ সুযোগ নিয়েই লর্ড ওয়েলেসলি সামরিক অধীনতার ভিত্তিতে এক নীতি প্রবর্তন করেন যা ইতিহাসে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি নামে খ্যাত। তিনি নিজাম ও মারাঠাদের অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করেন। অন্যায়ভাবে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁকে পরাজিত ও নিহত করেন। গৃহবিবাদের সুযোগে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ অধীনে নিয়ে আসেন। এভাবে লর্ড ওয়েলেসলি ছলে বলে কৌশলে উপমহাদেশের প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মহীশূর, নিজাম ও মারাঠাদের পতন ঘটিয়ে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এদেশের জনগণের স্বার্থ তাঁর লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। অধীনতামূলক মিত্রতানীতি প্রবর্তন করেন কে?
ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) লর্ড ওয়েলেসলি গ) লর্ড ডালহৌসি ঘ) লর্ড কার্জন

২। মহীশূরের বাঘ বলা হয় কাকে?
ক) হায়দার আলী খ) টিপু সুলতান গ) নিজাম ঘ) আসিফ উদ্দৌলা

৩। যে গভর্নর জেনারেল উপমহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী বলে পরিচিত, তার নাম কী?
ক) লর্ড কার্জন খ) লর্ড ওয়েলেসলি গ) লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ) লর্ড কর্নওয়ালিস

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

উইলিয়াম ফ্রান্সিস অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি বিচার, কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন; তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধবাজ। ফলে তাকে স্বদেশে ফিরে যেত হয়।

৪। উদ্দীপকের উইলিয়াম ফ্রান্সিসের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোম্পানি আমলের কোন শাসকের সাদৃশ্য আছে?
ক) লর্ড কর্নওয়ালিস খ) লর্ড ওয়েলেসলি গ) লর্ড ডালহৌসি ঘ) লর্ড কার্জন

৫। উক্ত শাসক–
i. নিজাম ও মারাঠাদের অধীনতামূলক মিত্রতানীতি গ্রহণে বাধ্য করেন
ii. গৃহ বিবাদের সুযোগে ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যগুলোকে ব্রিটিশ শাসনাধীনে আনেন
iii. অন্যায়ভাবে টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাকে পরাজিত ও নিহত করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৫ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেন্টিঙ্কের অর্থনৈতিক সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের বৈদেশিক নীতির বিবরণ দিতে পারবেন।
- বেন্টিঙ্কের চরিত্র ও কৃতিত্বের বিষয় আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	গভর্নর, কাউন্সিল, লর্ড আমহার্স্ট, সতীদাহ, সহমরণ, ঠগী দমন, কর্নেল পীমান

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক প্রথম জীবনে মাদ্রাজ কাউন্সিলের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এই উপমহাদেশে আগমন করেন। এ সময়ে ভেলোরে যে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তা দমনে তিনি ব্যর্থ হলে ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্বদেশে ফিরিয়ে নেন। অতঃপর লর্ড আমহার্স্ট স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গেলে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ পুনরায় বেন্টিঙ্ককে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করে এদেশে পাঠানো হয় এবং তিনি ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বপদে বহাল ছিলেন। তিনি একজন শান্তিপ্রিয় উদারপন্থী শাসক ছিলেন। তিনি প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে শাসিতদের কল্যাণ সাধান করাই শাসকের প্রধান কর্তব্য। তাই তাঁর শাসনামল উপমহাদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে।

বেন্টিংক

অর্থনৈতিক সংস্কার

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর কোম্পানির অর্থনৈতিক সমস্যা যখন চরম আকার ধারণ করে ঠিক সেই সময় শাসনভার গ্রহণ করে বেন্টিঙ্ক আর্থিক সমস্যা সমাধানে মনোযোগ দেন। তাই তিনি প্রথম অবস্থাতে ব্যয় সংকোচ ও রাজস্ব আয়ের ব্যবস্থা করেন। বোর্ড

অব ডাইরেক্টরের নির্দেশ পেয়ে তিনি সামরিক ও বেসামরিক ব্যায় কমানোর লক্ষ্যে কয়েকটি পন্থা গ্রহণ করেন।

শান্তিকালীন সময়ে সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের অর্ধেক ভাতা দেয়ার যে নিয়ম চালু ছিল তা তিনি তুলে দেন। তিনি উর্ধতন বেসামরিক কর্মকর্তাদের বেতন কমিয়ে দেন। তিনি কোম্পানির অতিরিক্ত কর্মচারীদেরও ছাঁটাই করেন। এমন কি তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের দক্ষতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে উর্ধতন অফিসারদের নিকট হতে গোপন সংবাদ নেয়ারও ব্যবস্থা চালু করেন।

কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য লর্ড বেন্টিক মালবে উৎপন্ন আফিমের উপর কর ধার্য করেন। যেসব জমি অবৈধভাবে নিষ্কর বলে দেখান হয়েছিল, সেগুলোর উপর তিনি কর বসান। মাদ্রাজ ও আগ্রায় রায়তওয়ারী প্রথার প্রবর্তন করে তিনি কোম্পানির আয় বাড়ানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি সিন্ধুর আমীর ও পাঞ্জাবের রনজিত সিংহের সাথে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করেন। এ সকল ব্যবস্থা নেয়ার ফলে কোম্পানির যে ঘাটতি ছিল তা পূরণের পর উদ্বৃত্ত হয় এবং কোম্পানির আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে।

শাসন সংস্কার

শাসন সংক্রান্ত সংস্কারে হস্তক্ষেপ করে প্রথমেই তিনি বিচার বিভাগের উন্নতি সাধন করেন। বেন্টিঙ্কই সর্বপ্রথমে এদেশীয়দের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তিনি কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত প্রাদেশিক বিচারালয়গুলো তুলে দিয়ে জেলা কালেক্টরের উপর ফৌজদারী মামলার বিচার করার দায়িত্ব দেন। তিনি কয়েকটি জেলাকে একত্রিত করে একটি বিভাগ গঠন করে প্রতিটি বিভাগে একজন করে কমিশনার নিযুক্ত করেন। ডেপুটি এবং জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদও সৃষ্টি করা হয়। সদর আমিনের পদেও এদেশীয়দের নিয়োগ করা হয়।

এদেশীয় বিচারক এবং কর্মচারীদের বেতন স্কেল ও পদে মর্যাদা বাড়ানো হয়। প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিনি বোর্ড অব রেভিনিউ এর সদর দপ্তর কলকাতা থেকে এলাহাবাদে সরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি এদেশীয় বিচারালয়গুলোতে মুসলিম আমল থেকে প্রচলিত ফার্সি ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন শুরু করেন। তিনি বাংলায় সর্বপ্রথম 'জুরী ব্যবস্থার' প্রবর্তন করেন। তাঁর সময়ে এদেশীয়দের জুরীর সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁর আরও একটি সংস্কার ছিল এদেশের ফৌজদারী আইন বিধির সংকলন। বহুকাল ধরে প্রচরিত মুসলিম আইন ও গভর্নর জেনারেলদের ঘোষিত আইন দ্বারা ফৌজদারী মামলা চালানো হতো। বেন্টিঙ্ক লর্ড মেকলের সহায়তায় আইন কমিশন গঠন করে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' তৈরি করেন যা ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গাইড বুক হিসাবে স্বীকৃতি পায়। এভাবে বেন্টিঙ্ক সুশৃঙ্খল ও দক্ষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সামাজিক সংস্কার

সমাজ সংস্কারের জন্য বেন্টিঙ্কের নাম এ উপমহাদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। সতীদাহ নিবারণ ও ঠগী দমন হলো বেন্টিঙ্কের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধন করেন। বহু প্রাচীনকাল থেকে এদেশের হিন্দু সমাজে 'সহমরণ' (মৃত স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করা) এবং 'অনুমরণ' (বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাকে একাকী চিতায় পুড়িয়ে মারা) প্রথার প্রচলন ছিল। এভাবে স্ত্রীগণ সতী হতেন। অনেক সময় সামাজিকতা রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন বিধবাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোরপূর্বক চিতায় পুড়িয়ে মারতো। লর্ড কর্ণওয়ালিস ও তাঁর পরের অনেক গভর্নর জেনারেলই এ অমানবিক প্রথাকে উঠিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশীয় ভাবাদর্শে আঘাত লাগতে পারে বলে তাঁরা ততটা জোর দেন নি। লর্ড বেন্টিঙ্ক কয়েকজন এদেশীয় উদারপন্থী সংস্কারক বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেন। সদর নিজামত আদালতের জজদের সমর্থন নিয়ে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এক আদেশ বলে এই অমানবিক প্রথা রহিত করেন। এছাড়া তৎকালীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী দেবতাকে খুশি করার জন্য নিজের প্রথম সন্তানকে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ ও বিবাহ দেয়ার অক্ষমতাহেতু নিজ শিশু কন্যাকে গলাটিপে হত্যা করার নিয়মও বেন্টিঙ্ক চিরতরে বন্ধ করে দেন।

ঠগীদের কথা বহু আগে থেকে জানা যায়। ঠগীরা ছদ্মবেশে হঠাৎ করে এসে নিরীহ পথিকদের, তীর্থযাত্রীদের ও ভ্রমণকারীদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে তাদের সবকিছু লুঠ করে নিয়ে যেতো। এটা ছিল ঠগীদের পেশা। কথিত আছে যে মোগল সম্রাট আকবর এটোয়া জেলাতে প্রায় পাঁচশো ঠগীকে হত্যা করেন। বিদেশি ভ্রমণকারীদের কাছ থেকেও জানা যায় যে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়েও ঠগীদের বেশ উৎপাত ছিল। সম্ভবত ইংরেজ আমলে এদের দৌড়াত্ম বেড়ে গিয়েছিল। ঠগীরা ছিল অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ডাকাতদল। এ দলে হিন্দু-মুসলিম উভয় গোত্রের লোক ছিল। এরা পুরোহিত, দরবেশ ইত্যাদি ছদ্মবেশে ডাকাতি করতো। হায়দ্রাবাদ থেকে অযোধ্যা, রাজপুতানা ও বুন্দেলখন্ডে ঠগীদের আস্তানা ছিল।

তারা সাংকেতিক ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতো। তাই জনগণের নিরাপত্তার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ক কর্ণেল পীমানের উপর ঠগী দমনের ভার দেন। কর্নেল পীমান ঠগীদের ভাষা আয়ত্ব করে এবং ফেরিঘিয়া নামে একজন ঠগীর কাছে থেকে ঠগীদের কৌশল ও গোপন আস্তানাগুলোর খবর জেনে নিয়ে প্রায় পনেরশ ঠগীকে ধরে ফেলেন এবং তাদের কঠোর শাস্তি দেন (১৮৩০ খ্রি:)।

শিক্ষা সংস্কার

এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বহু আগে থেকে উপমহাদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা প্রচলিত ছিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট দ্বারা কোম্পানি এদেশীয়দের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য ছিল। এ অর্থ কেবল সংস্কৃত, ফারসি প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হতো। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিঙ্ক ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের উদ্যোগ নিলে দুটি মত বা দলের সৃষ্টি হয়।

একদল প্রাচ্য ভাষা (সংস্কৃত ও ফারসি) শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদল, পাশ্চাত্য ভাষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের (ইংরেজি) শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন। শেষোক্ত দলের সমর্থক ছিলেন গভর্নর জেনারেল পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য লর্ড মেকলে এবং এদেশীয় সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়। লর্ড মেকলে ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে একটি স্মারকলিপি গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের কাছে পেশ করেন। এ বিষয়ে আন্দোলন হলেও বেন্টিঙ্ক এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেন এবং ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করেন। ঐ বৎসরই (১৮৩৫ খ্রি:) বেন্টিঙ্কের চেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য ধারার শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় একটি মেডিক্যাল কলেজ ও বোম্বাইয়ে (বর্তমান মুম্বাই) এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য তিনি ইতিহাসে আজও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়ে আছেন।

অন্যান্য

এছাড়া বেন্টিঙ্ক এদেশের ভেতরে মালামাল চলাচলের উপর শুল্ক উঠিয়ে দেন। নদী ও সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলে উৎসাহ দেন। চা ও কফি উৎপাদনের জন্য চা-বাগান স্থাপনে উৎসাহ দেন। তিনি জল সেচ ব্যবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেন। এদেশীয় সেনাবাহিনীতে বেত্রাঘাত করে শাস্তি প্রদানের যে নিয়ম ছিল তা তিনি বন্ধ করে দেন। উপমহাদেশের কোনো কোনো স্থানে নরবলির যে নিয়ম ছিল তাও তিনি বন্ধ করে দেন। বেন্টিঙ্কের এ সকল সংস্কারের ফলে সমাজজীবন যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়েছিল।

বৈদেশিক নীতি

বৈদেশিক নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলার পক্ষপাতি ছিলেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাঁর নিরপেক্ষ নীতির সুযোগ নিয়ে বরোদার গাইকোয়াড় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধিতা শুরু করে। ভূপাল, গোয়ালিয়র ও জয়পুরে গোলযোগ শুরু হলে বেন্টিঙ্ক এ সকল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হন। কাছাড়ের রাজা উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে সে রাজ্যের জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী বেন্টিঙ্ক তা কোম্পানির শাসনে নিয়ে আসেন। কুর্গের (মহাশূরের কাছে) রাজার অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে তিনি কুর্গও অধিকার করেন। আসামের জৈন্তিয়া পরগনার জনগণ কয়েকজন ইংরেজকে নরবলি দিতে ধরে নিয়ে যায়। কোম্পানির অনুরোধ সত্ত্বেও তাদের ছেড়ে না দেয়ায় বেন্টিঙ্ক বাধ্য হয়ে জৈন্তিয়া পরগণা নিজ শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। কুশাসন ও অরাজকতার অভিযোগে মহীশূর রাজ্যেও তিনি অস্থায়ীভাবে ইংরেজ শাসন প্রবর্তন করেন।

উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে রাশিয়ার অশুভ প্রভাব বন্ধ করার জন্য তিনি পাঞ্জাবের রণজিত সিংহের সাথে চিরস্থায়ী মিত্রতা এবং সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষা করেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

উপমহাদেশে ব্রিটিশ যুগের ইতহাসে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান অধিকার করে আছেন। সামরিক প্রতিভার অভাব বেন্টিঙ্কের চরিত্রে থাকলেও দয়াপ্রবণতা বিচক্ষণতা, আনুগত্য ও জনকল্যাণের ইচ্ছা প্রভৃতি গুণাবলির বিচিত্র সমাবেশ তাঁর চরিত্রে প্রতিফলিত হয়। লর্ড মেকলে বেন্টিঙ্ককে জনহিতৈষী ও জনকল্যাণকামী শাসক বলেছেন। এদেশীয় সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ, এদেশীয় ও ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ, এদেশীয়দের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি সাধন

প্রভৃতির জন্য লর্ড মেকলে বেন্টিঙ্কের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন যে তিনিই সর্বপ্রথম প্রাচ্য দেশীয় অত্যাচারী শাসনের স্থলে ব্রিটিশ স্বাধীনতার স্বাদ এদেশবাসীকে দিয়েছিলেন। একদিকে ইংরেজ স্বার্থ রক্ষার জন্য তিনি যেমন রণজিত সিংহ এবং সিন্ধুর আমীরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন, অন্যদিকে তেমনি মহীশূর, কাছাড়, কুর্গ, জৈন্তিয়া রাজ্য দখল করতে কুণ্ঠিত হন নি। তবুও সবদিক থেকে বিচার করলে উপমহাদেশে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে বেন্টিঙ্কের নাম কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকালের উপর একটি নিবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্ক এদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। প্রথম জীবনে তিনি নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াটারলুর যুদ্ধ বিজেতা ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সেনা বাহিনীতে ছিলেন। তিনি যখন এদেশে গভর্নর জেনারেল হিসেবে আসেন তখন তাঁর এদেশে সামরিক নৈপুণ্য দেখানোর কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ সে সময়টা ছিল সংস্কারের যুগ। তাই নি:সন্দেহে বলা যায যে, বেন্টিঙ্কই প্রথম গভর্নর জেনারেল যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশে প্রজাদের কল্যাণ সাধনই শাসকের প্রধান কর্তব্য। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অবাধ প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়। বেন্টিঙ্কের সমাজ সংস্কার ধর্মীয় গোঁড়ামী ও নিপীড়নের হাত থেকে এদশের জনগণকে রক্ষা করেছিল। তাঁর শিক্ষা সংস্কার পরবর্তীকালে এদেশীয়দের মনোজগতে এক বিরাট আলোড়ন ও পরিবর্তন নিয়ে আসে যা এদেশের সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল। তাই আজও লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক উপমাহদেশের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। "লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কত খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হয়ে" ভারতে আসেন?
ক) ১৮২৮ খ) ১৮২৯ গ) ১৮৩০ ঘ) ১৮৩১

২। বিচার ও শাসন বিভাগের উচ্চ পদে এদেশীয়দের নিয়োগ প্রদান করা হয়। উক্ত নিয়োগ প্রদান করেন কে?
ক) লর্ড হেস্টিং খ) লর্ড বেন্টিংক গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ডালহৌসি

৩। ভারতে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা চালু করেন–
ক) লর্ড হেস্টিংস খ) লর্ড বেন্টিংক গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ডালহৌসি

৪। ঠগীদস্যুদের দমন করেন কে?
ক) কর্নেল স্লিম্যান খ) কর্নেল আপটন গ) কর্নেল চ্যাম্পিয়ান ঘ) কর্নেল ব্রেইনওয়েট

সৃজনশীল প্রশ্ন

লর্ড হ্যারিসনই প্রথম শাসক যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রজাদের কল্যাণ সাধনই শাসকের প্রধান কর্তব্য। তার প্রচেষ্টায় এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার পথ উন্মুক্ত হয়। সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোড়ামীর হাত থেকে জনগণ রক্ষা পায়। তার শিক্ষা সংস্কার এ দেশীয় মনোজগতে আলোড়ন ও পরিবর্তন নিয়ে আসে যা এদেশের সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিকে তরান্বিত করেছিল। তাই আজও উপমহাদেশের ব্রিটিশ যুগের ইতিহাসে লর্ড হ্যারিসন চিরস্মণীয় হয়ে আছেন।

ক. সতীদাহ প্রথা রহিত করেন কে? ১
খ. "ঠগীরা ছিল অত্যন্ত শৃংখলাবদ্ধ ডাকাত দল"– ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকের লর্ড হ্যারিসনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোম্পানি আমলের যে শাসকের সাদৃশ্য আছে তার সামাজিক সংস্কার আলোচনা করুন। ৩
ঘ. "মরিয়া প্রমান করিতে হইবে তুমি সতী?– বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৬.৬ লর্ড ডালহৌসী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যগুলো কী তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতি কি ও এ নীতির প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- লর্ড ডালহৌসীর শাসন সংস্কার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি, স্বত্ববিলোপ নীতি

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জের পর মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে লর্ড ডালহৌসী এ উপমহাদেশে আসেন। আসার পূর্বে তিনি বোর্ড অফ ট্রেডের সভাপতি হিসেবে ব্রিটিশ মন্ত্রী সভায় ছিলেন। ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত যত সাম্রাজ্যবাদী শাসক এ উপমহাদেশে প্রেরণ করেছেন তার মধ্যে লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদ নীতির তিনটি লক্ষ্য ছিল-

লর্ড ডালহৌসী

ক. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শাসনের প্রসার
খ. ইংরেজ সাম্রাজ্যের সংহতি স্থাপন ও
গ. উপমহাদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টি

এ উদ্দেশ্যসমূহ হাসিলের জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তা এদেশের জনগণের জন্য কতটা কল্যাণমুখী ছিল, এসব চিন্তা তাঁর কাছে গৌণ ছিল। ডালহৌসী বৃটিশ রাষ্ট্র বিস্তারে যে নীতিগুলো গ্রহণ করেছিলেন তার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দিক ছিলো- ১. প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয় ২. স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা রাজ্য জয় ৩. কুশাসন ও অরাজকতার অজুহাতে পররাজ্য দখল। এর মধ্যে তিনি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করেই সবচেয়ে বেশি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয়

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮ - ৪৯ খ্রিঃ): লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ের প্রথম শিখ যুদ্ধের পরাজয় শিখ জাতি ভুলতে পারে নি। এছাড়া হার্ডিঞ্জের কিছু পদক্ষেপ শিখদের উত্তেজিত করে তুলেছিল। পাঞ্জাবে নিযুক্ত কোম্পানি কর্মচারীদের অশোভন আচরণ, শিখ গুরুদুয়ারাগুলোর প্রতি অসম্মান দেখানো, শিখ রমনীদের নির্যাতন, শিখদের ধর্মবিশ্বাস ও সম্মানে আঘাত দেয়। ইংরেজদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাণী ঝিন্দদের প্রতিবাদ শিখদের আলোড়িত করে।

দেওয়ান মূলরাজ ছিলেন পাঞ্জারের শাসনকর্তা। লাহোরের ইংরেজ রেসিডেন্ট মূলরাজকে হিসাবপত্র দাখিল করতে বলায় মূলরাজ পদত্যাগের ভান করেন। দুজন ইংরেজ কর্মচারীসহ নবনিযুক্ত শাসকর্তাকে কর্মস্থলে পাঠানো হলে মূলরাজ তাদের হত্যা করে পুনরায় পাঞ্জাবে প্রভুত্ত স্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের অন্যত্র শিখ যোদ্ধারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শের সিংহের নেতৃত্বে কতিপয় শিখ যোদ্ধা ইংরেজদের পক্ষে গেলেও পরে মূলরাজের পক্ষে চলে আসে।

পেশোয়ার পুনরুদ্ধারের আশায় আফগান জাতিও এই শিখ বিদ্রোহে যোগ দেয়। বাধ্য হয়ে লর্ড ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এই যুদ্ধ দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড গাফ ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ানওয়ালা নামক স্থানে শিখ সেনাপতি শেরসিংহের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। কিন্তু চিনাব নদীর নিকটে গুজরাটের যুদ্ধে শিখ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। ডালহৌসী ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষের মতামতের অপেক্ষা না করে পাঞ্জাব অধিকার করে নিলেন। ফলে উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-বার্মা যুদ্ধ

লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবাদের ফলে দ্বিতীয় বার্মা (মায়ানমার) যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত প্রথম বার্মা পর হতেই বর্মীগণ ইংরেজদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং ক্রমে তাদের সম্পর্কের এমনি অবনতি ঘটে যে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মরাজ ইংরেজ রেসিডেন্টকে বার্মা ত্যাগের আদেশ দেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হাতে অপমানিত হয়েছে সংবাদ পেয়ে ডালহৌসী তখনই বার্মার রাজার কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে পাঠান। ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ডালহৌসী নৌ-সেনাপতি কমোডর ল্যাম্বটিকে রণতরীসহ বার্মায় পাঠান। ব্রহ্মরাজ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না বিধায় ডালহৌসীর সমর্থন আদায়ের জন্য দুর্ব্যবহারের দায়ে রেঙ্গুনের গভর্নরকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্টি এতে খুশি না হয়ে ব্রহ্মরাজের একটি রণতরী দখল করে নেয়। ফলে বর্মীগণ ল্যাম্বার্টির জাহাজে গোলাবর্ষণ শুরু করলে দ্বিতীয় বার্মা যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

ডালহৌসী ল্যাম্বাটিকে সাহায্যের জন্য জেনারেল গডউইনকে প্রেরণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই রেঙ্গুন প্রোম ও পেগু অধিকৃত হলো। ব্রহ্মরাজ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে ডালহৌসী সমগ্র পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এভাবে বার্মার উপকূল অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় চট্টগ্রাম হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অঞ্চল যেমন ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হলো তেমনি বার্মা সমুদ্রের সাথে সংযোগ পথের জন্য ব্রিটিশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এছাড়া ডালহৌসী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে সিকিম রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতির সংজ্ঞা: প্রাচীন হিন্দু রীতির উচ্ছেদ ঘটিয়ে বৃটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল দেশীয় রাজ্যগুলো কুক্ষিগত করার জন্য যে নতুন নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল তাই স্বত্ব বিলোপ নীতি নামে পরিচিত। এ নীতির অর্থ হলো এই যে, ইংরেজ আশ্রিত ও অনুগৃহীত কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে; কোনো পালিত পুত্রের অধিকার স্বীকার করা হবে না। প্রাচীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী অপুত্রক রাজা রাজবংশ ও রাজ্য রক্ষা করার জন্য পুত্র পালক নিতে পারতেন। আগে এ ধরনের ক্ষেত্রে ইংরেজের কাছে থেকে রাজারা বিশেষ অনুমতি নিয়ে দত্তক গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু ডালহৌসী কঠোরতার সাথে আগের রীতি বন্ধ করে দিয়ে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের পথ আরও প্রশস্ত করে তোলেন।

স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ

যুদ্ধের দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়াও লর্ড ডালহৌসী স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্য প্রসারে উদ্যোগ নেন। মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যবাদী ডালহৌসী সর্বপ্রথম সাঁতারা রাজ্যের উপর তার স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ করেন। সাঁতারার রাজা ইংরেজের বিনা অনুমতিতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেছিলেন। ফলে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা মারা গেলে ডালহৌসী দত্তক পুত্রের দাবি অগ্রাহ্য করে সাঁতারা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এরপর সম্বলপুর রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ডালহৌসী সম্বলপুর রাজ্যটিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন (১৮৫০ খ্রি:)।

১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ভোঁসলে বংশের শেষ রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ডালহৌসী নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কারণ নাগপুর ইংরেজের প্রত্যক্ষ অধিকারে আসায় কোন দেশীয় রাজ্যের এলাকায় না ঢুকে কলকাতা থেকে বোম্বাই (মুম্বাই) যাতায়াতের পথ ইংরেজদের জন্য সোজা হয়ে গেল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঝাঁসির রাজা মারা গেলে তাঁর দত্তক পুত্রের দাবি অস্বীকার করে ডালহৌসী ঝাঁসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ঐ ভাবে শতদ্রু নদীর নিকট ভগৎ রাজ্য, মধ্যপ্রদেশে উদয়পুর, রাজস্থানে করৌলি প্রভৃতি রাজ্যগুলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

ইংরেজ প্রদত্ত ভাতা ও খেতাবের স্বত্ব লোপ: অতঃপর ডালহৌসী ইংরেজ প্রদত্ত দেশীয়দের ভাতা ও খেতাবের ক্ষেত্রেও স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও মারা গেলে ডালহৌসী বাজীরাও এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেন। একইভাবে তাঞ্জোরের রাজা মারা গেলে তাঁর দু'কন্যা সন্তান থাকলেও তাঁদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং সে সঙ্গে তাঞ্জোরের রাজপদ ও ভাতা বন্ধ করা হয়। ডালহৌসী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদূর শাহের খেতাব ও ভাতা লোপ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরিচালক সভা বাধা দেয়ার ফলে তিনি সফল হন নি।

কুশাসনের অজুহাত: এরপর লর্ড ডালহৌসী কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব নবাবের হাতে থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে। ফলে রাজ্য শাসনে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই তাঁকে অযোধ্যা ছেড়ে কলকাতার খিদিরপুরে বারো লক্ষ টাকা নিয়ে বাস করতে বাধ্য করা হয়। ঠিক কুশাসনের কারণে না হলেও

হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজ সেনাবহিনীর ব্যয়ভার বহনের জন্য যে অর্থ দিতেন তা বাকি পড়ায় ডালহৌসী নিজামের নিকট হতে বেরার প্রদেশটি কেড়ে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন।

স্বত্ত্ববিলোপ নীতির ফলাফল

ডালহৌসীর পূর্ববর্তী শাসকগণের নীতি ছিল যেখানে পারতপক্ষে ইংরেজ শাসন সম্প্রসারণ না করা, সেখানে ডালহৌসীর নীতি ছিল যতদূর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যায় ততদূর পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত স্বত্ত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে এদেশীয় নবাব-রাজা ও জমিদার এবং প্রজার মনে ভীতি ও অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিলেন। কেননা তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের রাজ্যের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এ নীতি প্রয়োগের দ্বারা তিনি বিভিন্ন অজুহাতে একের পর এক রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ছলে বলে কৌশলে না হলে তিনি যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য দখল করতেন। উপরন্তু, ডালহৌসী এ নীতি প্রয়োগের সময় এদেশের প্রচলিত রীতিনীতি ও ধর্মীয় মনোভাব এবং জনমতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন। এ ধূমায়িত ইংরেজ বিরোধী অসন্তোষই ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের জন্য বিশেষভাবে দায়ী ছিল।

সংস্কার

লর্ড ডালহৌসী শুধু একজন সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না রবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। ডালহৌসীর কর্মশক্তি ছিল অসাধারণ। প্রশাসনিক ক্ষেত্রের প্রত্যেক বিভাগেই তিনি সংস্কার সাধন করেন।

শাসন সংস্কার: তিনি গভর্নর জেনারেলের কাজের চাপ কমানোর লক্ষ্যে বাংলার জন্য একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর (ছোট লাট) নিযুক্ত করেন। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে বিভিন্ন জেলায় ভাগ করা হয়। ফলে রাজ কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেড়ে যায়। তিনি বার্ষিক সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং বে-সামরিক কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার স্বাধীনতা রক্ষায় চেষ্টা করেন। তৎকালীন বাংলার সেনাদের সামরিক যোগ্যতার অভাব লক্ষ করে তিনি প্রত্যেক সুস্থ সবল লোকের সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে ভবিষ্যতে সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে পারে। সবশেষে তিনি বন্দীদিগকে ইন্‌সপেকটরদের অধীনে রাখার একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

সামাজিক সংস্কার: সমাজ সংস্কারক হিসেবে ডালহৌসী অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। ডালহৌসী আট বছরের মধ্যে বহু সংস্কার প্রবর্তন করে আধুনিক যুগের সূচনা করেন। যেমন: তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিধবা বিয়েকে আইনসঙ্গত করেন। এ বিষয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ডালহৌসীকে সাহায্য করেন। ডালহৌসী এমন একটি আইন পাস করান যাতে এদেশীয়গণ ধর্মান্তরিত হলেও তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করতে পারে।

ডালহৌসীর শাসনকাল বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত। তিনি পূর্তবিভাগের প্রতিষ্ঠিত গঙ্গা খাল খনন ও জল সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেন। তিনি রাজপথ ও সড়কগুলোর উন্নয়ন করেন। তাঁরই সময়ে কলকাতা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পুনরায় চালু হয়। এদেশীয় রেলপথ ব্যবস্থার জনক ছিলেন ডালহৌসী। তাঁর সময়ে বোম্বাই হতে টানা পর্যন্ত রেললাইন চালু হয় (১৮৫৩ খ্রি:)।

ডালহৌসি ডাক বিভাগের সংস্কার, কলকাতা হতে আগ্রা পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা ও পেনী পোস্টকার্ড ব্যবস্থা চালু করেন। তিনি বনভূমি সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করেন এবং চা ও কফি বাগানের প্রসার সাধন করেন। তাঁর আমলে মেরিয়া নামক এক সমাজ বিরোধী দল বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে। তিনি এই মেরিয়া উপদ্রপের অবসান ঘটান।

শিক্ষা সংস্কার: ডালহৌসী এদেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিক্ষার উন্নয়নে মনোযোগ দেন। এ সময় বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড একটি শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করেন যা উডের ডেসপ্যাচ নামে বিখ্যাত। এই ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ভিত্তি গঠনে সাহায্য করে। এ পরিকল্পনা অনুসারে ডালহৌসী 'শিক্ষা বিভাগ' সৃষ্টি করেন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় এদেশের বিভিন্ন স্থানে স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। জনসাধারণের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রান্ট-ইন-এইড দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। উডের ডেসপ্যাচে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে তিনটি ইউনিভারসিটি স্থাপনের সুপারিশ করা হয়।

ডালহৌসী নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন এবং তাঁর ও কাউন্সিল সদস্য বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় বেথুন কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাবেন। তিনি রুরকির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও স্থাপন করেন। এ সকল উন্নতি সাধন করে ডালহৌসী এদেশে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	স্বত্ত্ববিলোপ নীতির উপর একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সারাংশ

একজন সাম্রাজ্যবাদী শাসক হিসেবে ডালহৌসীর উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করা। সে কারণে তিনি মনে করতেন যে দেশীয় শাসন অপেক্ষা ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত ও মঙ্গলজনক। ফলে এ সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বশত তিনি ছলে বলে কৌশলে দেশীয় রাজ্য দখলের নীতি গ্রহণ করেন। এভাবে স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি সাতারা সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, উদয়পুর, জৈন্তাপুর ও ভগৎপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। সিন্ধু নদ হতে বার্মার (মায়ানমার) ইরাবতীর তীর পর্যন্ত ডালহৌসী ব্রিটিশ পতাকা উড়িয়ে দেন।

অবশ্য অভ্যন্তরীণ সংস্কারেও তাঁর অবদান কম নয়। আট বছরের মধ্যে তিনি বহু সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক যুগের সূচনা করেন। তিনি রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও পূর্তবিভাগ ও জনশিক্ষা ব্যবস্থার জনক ছিলেন। তিনি যোগাযোগ, বিধবা বিবাহ প্রথা, জলসেচ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনন্য। তাঁর সময়ে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন নারী শিক্ষার অগ্রদূত। তাই শাসক ও সংস্কারক হিসাবে ডালহৌসী অবশ্যই প্রশংসা পেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। স্বত্ত্ববিলোপনীতি প্রবর্তন করেন কে?
- ক) লর্ড কর্নওয়ালিস
- খ) লর্ডওয়েলেসলি
- গ) লর্ড ডালহৌসি
- ঘ) লর্ড বেন্টিংক

২। লর্ড ডালহৌসি ছিলেন–
- ক) সাম্রাজ্যবাদী
- খ) সমাজ সংস্কারক
- গ) দক্ষ প্রশাসক
- ঘ) গণতন্ত্রমনা

৩। সমগ্র উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হয় কার সময়ে?
- ক) লর্ড হার্ডিঞ্জ
- খ) লর্ড জলহৌসি
- গ) লর্ড কর্নওয়ালিস
- ঘ) লর্ড অকল্যান্ড

৪। ভারতীয় উপমহাদেশে রেল ও ট্রেলিগ্রাফ প্রথার প্রবর্তন করেন কে?
- ক) লর্ড ডালহৌসী
- খ) লর্ড হেস্টিংস
- গ) লর্ড ওয়েলেসলি
- ঘ) লর্ড হার্ডিঞ্জ

সৃজনশীল প্রশ্ন

মহাদেব চন্দ্র ছিলেন সাঁতারা রাজ্যের রাজা। নিসন্তান রাজা রাজপদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ইংরেজদের অনুমতি ছাড়াই দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের নিয়ম ছিল ইংরেজ আশ্রিত ও অনুগৃহিত কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কোনো পালিত পুত্রের অধিকার স্বীকার করা হবে না, ১৮৪৮ সালে রাজা মহাদেব চন্দ্র মারা গেলে ইংরেজরা তার পালিত পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য করে সাঁতারা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন; এমন কি তার পালিতপুত্রের ভাতাও বন্ধ করে দেয়।

ক. বিধবা বিবাহ আইন পাস করেন কে? ১

খ. স্বত্ত্ববিলোপ নীতি কী? ২

গ. উদ্দীপকের নিয়ম-নীতির সাথে পাঠ্য পুস্তকের কোম্পানি আমলের যে শাসকের নিয়ম-নীতির সাদৃশ্য পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে উক্ত শাসকের অবদান মূল্যায়ন করুন। ৪

পাঠ-৬.৭ কোম্পানি আমলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কোম্পানি আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- কোম্পানি আমলের পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা ও এর প্রচলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- কোম্পানি আমলের শাসন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	রাজস্ব আদায়, দেশ রক্ষার ভার, 'কর্নওয়ালিস কোড', পাঁচসালা বন্দোবস্ত, একসালা বন্দোবস্ত

শাসন ব্যবস্থা

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে। কিন্তু ধীরে ধীরে বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হয়। এক এক জায়গায় এক এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটেছে। তাই সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের দায়িত্বও এসে পড়ে। বস্তুত কোম্পানিকে যখন এদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তখন তাকে নানা সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এদেশীয় ব্যবস্থা, প্রথা, ভাষা, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞতা, যাতায়াত ও যোগাযোগের অসুবিধার মধ্য দিয়ে কোম্পানি একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। যেহেতু বাংলায় ইংরেজরা প্রথম রাজ্য বিস্তার করেছিল, সেহেতু বাংলার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তারা উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানেও তাদের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল।

ক্লাইভের শাসন ব্যবস্থা

দীউয়ানী লাভের পর ক্লাইভ এদেশ শাসনের জন্য যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। এ ব্যবস্থায় কোম্পানির হাতে ছিল 'রাজস্ব-আদায়' ও 'দেশ রক্ষার ভার' আর নবাবের হাতে ছিল বিচার ও শাসনের ভার। এভাবে ধীরে ধীরে এদেশে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার পথ সুগম হতে থাকে। ক্লাইভই ছিলেন ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

হেস্টিংসের যুগে শাসন ব্যবস্থা

অতঃপর হেস্টিংস এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। নানা বাধা ও বিপত্তির মধ্যেও হেস্টিংস শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন। প্রথমেই হেস্টিংস, ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলোপ করেন। তিনি শাসন ও রাজস্ব বিভাগ কোম্পানির অধীনে নিয়ে আসেন। গভর্নর ও কাউন্সিলের সদস্যদের নিয়ে তিনি একটি 'বোর্ড অব রেভিনিউ' গঠন করে তার উপর রাজস্ব ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব দেন। তিনি ইংরেজ 'সুপার ভাইজরদের' স্থলে 'কালেকটর' নিয়োগ করেন। পূর্বে যেখানে উচ্চপদে শুধু ইংরেজদের নিয়োগ করা হতো, এখন সেখানে এদেশীয়দের নিয়োগ করা হলো। দুর্নীতি বন্ধের জন্য তিনি কোম্পানির কর্মচারিদের মোটা বেতনের ব্যবস্থা করেন।। রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য হেস্টিংস পাঁচ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারি ইজারা দেয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন যা 'পাঁচসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। পাঁচসালা বন্দোবস্তের ভুলত্রুটি লক্ষ করে হেস্টিংস জমিদারদের সঙ্গে একটা স্বল্প মেয়াদী বন্দোবস্ত করেন যা 'একসালা বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত।

অতঃপর হেস্টিংস বাণিজ্য ক্ষেত্রে দস্তক প্রথা তুলে দেন এবং সে সঙ্গে কোম্পানির কর্মচারিদের বিনা শুল্কে ব্যক্তিগত ব্যবসাও বন্ধ করে দেন। দেশের অভ্যন্তরে মালামাল চলাচলের সুবিধার জন্য তিনি শুল্ক চৌকিগুলো বিলুপ্ত করে দেন। কোম্পানির স্বার্থে কাপড় তৈরির জন্য তাঁতীদের উপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং দূত প্রেরণ করেন।

হেস্টিংস মুগল বিচার ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেন। তিনি কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করেন যাতে কোম্পানি প্রশাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। হেস্টিংস বিচার বিভাগকে রাজস্ব বিভাগ হতে পৃথক করে প্রতি জেলায় একটি করে ফৌজদারী ও দিওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। তিনি এদেশীয় কাজী বা মুফতীর দ্বারা বিচার কাজ সম্পন্ন

করতেন। হেস্টিংসই সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা মোকদ্দমা হিন্দু মুসলিম ধর্মশাস্ত্র অনুসারে বিচারের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন। এদেশীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি কলকাতায় মাদ্রাসা, বারানসীতে সংস্কৃত কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন।

কর্ণওয়ালিসের সময়ে শাসন ব্যবস্থা

হেস্টিংসের পদত্যাগের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর উপর দায়িত্ব পড়ে হেস্টিংসের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার। তাই লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি দক্ষ প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা তৈরিতে মনোযোগ দেন।

প্রথমেই কর্ণওয়ালিস প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার কাজে হাত দেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এক সৎ, দক্ষ কার্যকরী সিভিল সার্ভিস গঠন করা। তিনি প্রদেশগুলোকে জেলায় এবং জেলাগুলোকে থানায় বিভক্ত করেন। তাঁর সময় ২৩টি জেলা ছিল। কর্ণওয়ালিস কলকাতাকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেন। এ সময় গ্রামাঞ্চলে জমিদারগণ পুলিশী দায়িত্ব থেকে মুক্ত হন।

প্রশাসনকে আইনের পথে পরিচালনার জন্যে কর্ণওয়ালিস তাঁর 'আইন বিধি কোড' প্রবর্তন করেন যা 'কর্ণওয়ালিস কোড' নামে পরিচিত। কর্ণওয়ালিসই সর্বপ্রথম কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে ব্যক্তিগত ব্যবসা কিংবা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কর্ণওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারির সংখ্যা হ্রাস করেন এবং তাদের সার্বক্ষণিক কাজ করার নির্দেশ দেন। কর্ণওয়ালিস রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করে পৃথক কর্মচারিদের উপর এর দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন।

কর্নওয়ালিসই বিচার বিভাগের উচ্চ পদগুলোতে ইংরেজ বিচারকদের নিয়োগের নিয়ম চালু করেন। তাছাড়া তিনি ফৌজদারী আইনকে আধুনিক করার চেষ্টা করেন। ফলে হিন্দু মুসলিম উভয়েই নিজ নিজ পক্ষে উকিল নিয়োগের অধিকার লাভ করে। কর্ণওয়ালিস সরকারি কর্মচারিদের দুর্নীতি ও বে-আইনী কাজের জন্য তাঁদের বিচার বিভাগের কাছে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা করে আইনের শাসন প্রবর্তন করেন।

ভূমি রাজস্ব: ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ভুলত্রুটি থাকার কারণে লর্ড কর্ণওয়ালিস তা সংস্কারের প্রতি মনোযোগী হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব বহুল পরিমাণে অনাদায়ী থাকে ও চাষীদের উপর শোষণ বেড়ে যায়। পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্তের ভুলত্রুটি নিরসনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিস জমির 'দশসালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন, যা ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' পরিণত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ জমির স্থায়ী মালিক হন এবং তাঁদের দেয় করের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের দুর্দশা বেড়ে যায় ও জমির উন্নয়ন কমে যায়। এ ব্যবস্থায় সূর্যাস্ত আইনের বলে বহু জমিদারি নিলামে উঠে। জমিদারি কেনার মধ্য দিয়ে নতুন জমিদারশ্রেণি গড়ে উঠে। এভাবে এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণিরও উদ্ভব ঘটে।

লর্ড ওয়েলস্লির সময়ে শাসন ব্যবস্থা

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির গভর্নর হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি রাজ্য শাসনের পরিবর্তে রাজ্য বিস্তারের দিকেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় তাঁর অবদান নিতান্তই সামান্য। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি বেশকিছু সংস্কার করে গেছেন। তিনি ইংরেজ অধিকৃত স্থানে জমি জরিপ করার জন্য বুকাননকে নিযুক্ত করেন। তিনি এদেশের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার এসব সংগৃহীত তথ্য থেকে কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভে সক্ষম হয়। ওয়েলেসলি বিচার ব্যবস্থার বেশকিছু সংস্কার করেন।

লর্ড ওয়েলেসলি ভারতবর্ষে নবাগত ইংরেজ কর্মচারিদের শিক্ষার জন্য কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ স্থাপন করেন।

বেন্টিংকের সময় শাসনব্যবস্থা

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লর্ড উলিয়াম বেন্টিঙ্ক এদেশের বড়লাট হয়ে আসেন। প্রথমেই তিনি বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনে মনোযোগী হন। বেন্টিঙ্কই সর্বপ্রথমে এদেশীয়দের শাসন ও বিচার সংক্রান্ত উচ্চপদে নিয়োগ করেন। তিনি কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত প্রাদেশিক আদালতগুলো তুলে দিয়ে জেলা কালেকটরের উপর ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্ব দেন। তিনি কয়েকটি জেলাকে একত্রিত করে একটি বিভাগ গঠন করেন। প্রতিটি বিভাগে একজন করে কমিশনার নিযুক্ত করেন। ডেপুটি ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের পদও সৃষ্টি করা হয়।

অতঃপর বেন্টিঙ্ক সমাজ সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেন। প্রথমেই তিনি 'সতীদাহ প্রথা' ও 'অনুমরণ' প্রথার বিলোপ সাধন করেন। এছাড়াও বেন্টিংক আরও অনেক অমানবিক প্রথা বাতিল করেন। তিনি ঠগী দস্যুদেরও দমন করেন।

শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁর সংস্কার অন্যকারও চেয়ে কম নয়। অনেক আগে থেকেই এদেশে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা প্রচলিত ছিল। ১৮১৩ সনের সনদ আইন দ্বারা কোম্পানি এদেশীয়দের শিক্ষা বিস্তারের জন্য বৎসরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য ছিল। এ অর্থ শুধু প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যয়িত হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে বেন্টিঙ্কের চেষ্টার ফলে পাশ্চাত্য ধারায় শিক্ষাদানের জন্য কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ ও বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকেন এদেশের জনগণের নিকট।

বেন্টিঙ্ক কোম্পানির আর্থিক উন্নয়নের দিকে নজর দিয়েছিলেন। তাই তিনি ব্যয় সংকোচন ও রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। বেন্টিঙ্ক কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য মালবে উৎপন্ন আফিমের উপর কর ধার্য করেন। যেসব জমি অবৈধভাবে নিষ্কর বলে দেখানো হয়, সেসব জমির উপর তিনি কর বসান।

মাদ্রাজ ও আগ্রায় 'রায়তওয়ারী প্রথার' প্রবর্তন করে তিনি কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করেন। তিনি সিন্ধুর আমীর ও পাঞ্জাবের রনজিৎ সিংহের সাথে বাণিজ্য চুক্তি করেন। বেন্টিঙ্কের এসব ব্যবস্থা নেয়ার ফলে কোম্পানির ঘাটতি পূরণ হয়ে উদ্বৃত্ত থাকে।

এছাড়া বেন্টিঙ্ক এদেশের ভেতরে মাল চলাচলের উপর শুল্ক লোপ করেন। নদী ও সমুদ্রে জাহাজ চলাচলে উৎসাহ প্রদান করেন। চা ও কফি উৎপাদনের জন্য চা বাগান ও কফি বাগান স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করেন।

বৈদেশিক নীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্ক নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে প্রয়োজনবোধে এ নীতি ছাড়তেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। এই নীতির মধ্য দিয়ে বেন্টিঙ্ক দেশীয় অনেক রাজ্যের উপর দিয়ে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন।

ডালহৌসীর সময়ের শাসন ব্যবস্থা

লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি শুধু সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন না, বরং একজন শ্রেষ্ঠ শাসকও ছিলেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রের প্রতি বিভাগেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। প্রথমেই তিনি বড়লাটের কাজের চাপ কমানোর জন্য বাংলায় একজন ছোটলাট নিয়োগ করেন। বড়লাটের নির্দেশে ছোটলাট বাংলা শাসন করতেন। তাঁর সময়ে পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। ডালহৌসী রাজ্যটির প্রশাসন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা নিজেই করেন। তিনি পাঞ্জাবের শাসনভার একজন কমিশনারের উপর ন্যস্ত করেন।

ডালহৌসী সামরিক বিভাগেও সংস্কার প্রবর্তন করেন। তিনি বেঙ্গল আর্টিলারী সেনার সদর দপ্তর কলকাতা হতে মীরাটে স্থানান্তর করে উত্তরভারতে সামরিক বাহিনীকে শক্তিশালী করেন। তিনি গুর্খাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের নীতি নেন। তিনি বন্দীদেরকে ইন্সপেক্টরের অধীনে রাখার একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

লর্ড ডালহৌসী জনহিতকর কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি পূর্তবিভাগ (P.W.D) গঠন করেন এবং এ দপ্তরকে সামরিক বোর্ড থেকে পৃথক করেন। এ দপ্তরের হাতে রাস্তাঘাট, পুল তৈরি ও জলসেচ ব্যবস্থা পরিচালনা দায়িত্ব দেয়া হয়। এ দপ্তরের উদ্যোগ গঙ্গাখাল খনন করা হয়। পাঞ্জাবেও বারি দোয়াব খালের কাজ আরম্ভ হয়। তাঁরই সময়ে কলকাতা হতে পেশোয়ার পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নির্মাণ করা হয়।

উপমহাদেশে রেলপথ নির্মাণের জন্য ডালহৌসীকে রেলপথের জনক বলা হয়। তাঁর সময়ে বোম্বাই হতে টানা পর্যন্ত রেললাইন চালু হয় (১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ)। রেলের জন্য জমি বেল কোম্পানিকে বিনামূল্যে দেয়া হয়।

ডালহৌসী এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপন করেন। কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত প্রথম টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয় (১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ)। পরে এ লাইন লাহোর ও পেশোয়ার পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সব মিলে ৪ হাজার মাইল দীর্ঘ টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপিত হয়।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ ডাক বিভাগীয় আইন দ্বারা ডালহৌসী ডাক ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি করেন। তিনি পেনী পোস্ট কার্ড প্রথা চালু করেন। এদেশে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ডালহৌসী শিক্ষা সংস্কারে হাত দেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য বেথুন -এর প্রচেষ্টায় বেথুন কলেজ স্থাপিত হয়। তিনি প্রাথমিক শিক্ষার কথাও ভাবেন।

সমাজ সংস্কারক হিসাবে ডালহৌসী অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। তিনি বিধবা বিবাহ আইন পাস করে হিন্দু বিয়েকে আইনসঙ্গত করেন। ডালহৌসী এমন একটি আইন পাস করেন যাতে এদেশীয়গণ ধর্মান্তরিত হলেও তাদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করতে পারে। বৈদেশিক নীতির দিক থেকে ডালহৌসী ছিলেন অত্যন্ত সফল শাসক। যদিও তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী তবুও উপমহাদেশে তিনিই এর স্থায়িত্ব ও দান করেন। ইংরেজ ক্ষমতার স্থায়িত্বের জন্য তিনি তিনটি ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন- প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয়, স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা রাজ্য জয়, কুশাসন ও অরাজকতার অজুহাতে রাজ্য দখল।

পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষা

বাংলায় যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয়, তখন এদেশের কোনো কোনো ইংরেজ শাসকদের মধ্যে এ ধারণা জন্মেছিল যে এদেশের মানুষকে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে এবং তার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলে এদেশে তাঁদের শাসন ব্যবস্থা শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। তাঁরা আরও মনে করতেন যে, পাশ্চাত্য ভাষা ও শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে এদেশীয়দের মঙ্গল নিহিত। ফলে কোম্পানি আমলে এদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছিল।

কিন্তু ইংরেজ শাসন এদেশে যে আধুনিক যুক্তিবাদ ও পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রেবেশ ঘটিয়েছে তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে শিক্ষিত এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আধুনিক উদার চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করে। তাদের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় মধ্যযুগীয় সংকীর্ণতা, গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস পরিত্যাগ করে যুক্তিবাদী হয়ে উঠে। ফলে, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি হয়। বাংলার কলকাতা হয়ে উঠে পাশ্চাত্য শিক্ষা চর্চা ও প্রসারের কেন্দ্র।

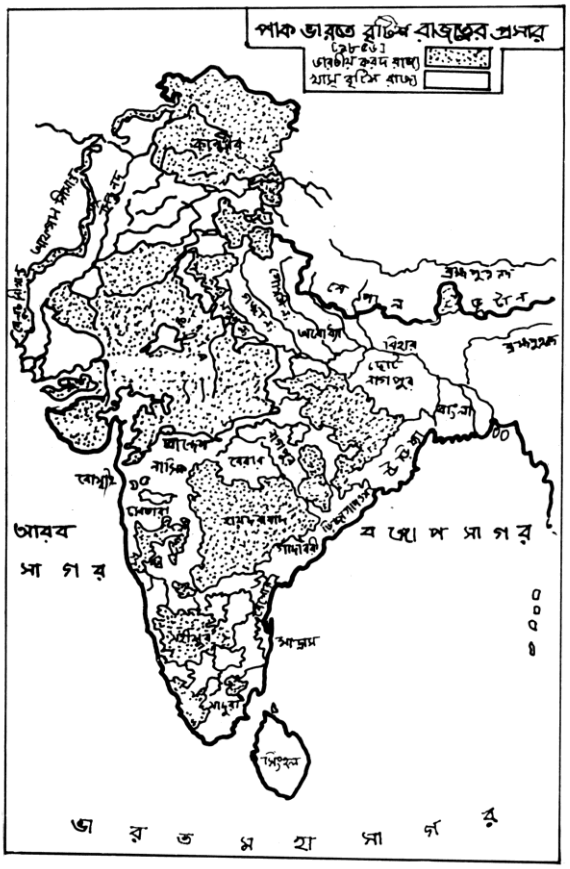

পাক ভারতে বৃটিশ রাজত্বের প্রসার

শিক্ষার্থীর কাজ	একসালা বন্দোবস্ত কিভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপ নেয় আলোচনা করুন।

সারাংশ

কোম্পানির শাসন উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইংরেজ গভর্নরগণ ধীরে ধীরে একটি স্থিতিশীল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। তাদের শাসননীতিতে একদিকে যেমন ইংরেজ ক্ষমতা বিস্তারের ব্যাপারে লক্ষ্য ছিল- অন্যদিকে জনকল্যাণের ব্যাপারেও ছিল তাদের দৃষ্টি। উপমহাদেশে আধুনিক শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়েছিল কোম্পানির শাসনামলেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কে?

ক) লর্ড ক্লাইভ খ) ওয়ারেন হেস্টিংস গ) কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি

২। কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বা অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন কে?
ক) লর্ড ক্লাইভ খ) ওয়ারেন হেস্টিংস গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি

৩। জমি জরিপ করার জন্য বুকাননকে নিযুক্ত করেন কে?
ক) লর্ড ক্লাইভ খ) ওয়ারেল হেস্টিংস গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি

৪। মুম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন–
ক) ওয়ারেন হেস্টিংস খ) লর্ড কর্নওয়ালিস গ) লর্ড ওয়েলেসলি ঘ) লর্ড বেন্টিংক

৫। কত খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮৫৫ খ) ১৮৫৬ গ) ১৮৫৭ ঘ) ১৮৫৮

৬। ইংরেজ ক্ষমতার স্থায়ীত্বের জন্য ডালহৌসি অবলম্বন করেন–
i. প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য জয়
ii. স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা রাজ্য জয়
iii. কুশাসন ও অরাজকতার অজুহাতে রাজ্যগ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১। খ ২। খ ৩। খ ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ ঃ ১। গ ২। ক ৩। খ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। গ ৬। ঘ

বৃটিশ শাসনামলে প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম (১৭৫৭ খ্রি.)

ইউনিট ৭

ভূমিকা

ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.) মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ সংঘটিত হতো। কিন্তু এতে সামগ্রিকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব এত ব্যাপক আকারে ঘটে যে তা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। প্রাথমিকভাবে কোম্পানির দুঃশাসন ও নির্যাতনের শিকার দেশীয় সিপাহীরা এ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। পরবর্তীকালে তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক বছর কাল স্থায়ী এই গণবিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ অংশ নেয় ও সহযোগিতা প্রদান করে। বিদেশি শাসন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহের মূলে কাজ করেছিল। বিপ্লবী জনতা বৃটিশ শাসনকে অগ্রাহ্য করে শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক বলে ঘোষণা দেয়। তা ছাড়া নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রাণী, কুনওয়ার সিং, মৌলভী আহমদ উল্লাহ প্রমুখ নেতা গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে বিপ্লব সফল না হলেও পরিণতিতে ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ রাজের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রকৃতি, বিপ্লব কেন সংঘটিত হয়েছিল, বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণসমূহ এবং উক্ত সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৭.১ সিপাহী বিপ্লবের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও ঐতিহাসিকদের মতামত বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেখক ও ঐতিহাসিকদের মত পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সামরিক বিদ্রোহ, জে.বি. নর্টন, ডক্টর ডাফ, সুশোভন চন্দ্র সরকার

বিপ্লবের প্রকৃতি

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনেকেই একে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। উৎস ও ঘটনাবলির বিবেচনায় কারও মতে এটি ছিল নিছক একটি সিপাহী বিদ্রোহ, কারও মতে জাতীয় সংগ্রাম, আবার কারও মতে কৃষক আন্দোলন। ভিন্ন একটি মত হচ্ছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশীয় সামন্ত প্রভুদের শেষ প্রতিরোধ।

সমসাময়িক ইংরেজদের মধ্যেও এর স্বরূপ নিয়ে মতভেদ ছিল। তদানীন্তন ভারত সচিব আর্ল স্ট্যানলি তাঁর লেখায় সিপাহী বিদ্রোহ কথাটি ব্যবহার করলেও ঐ সময়ে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক ভাষণে ডিজরেলী উক্ত ঘটনাকে বর্ণনা করেন জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে। স্যার লরেন্স একে দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আউটরাম একে একটি সুপরিকল্পিত বৃটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ঘটনাসমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটান। তাছাড়া ইংরেজ কর্মচারীদের অন্য একটি অংশ এ বিপ্লবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের চক্রান্ত বলে বর্ণনা করেছেন। আলফ্রেড লায়লের ভাষায়, "পুরো বিদ্রোহটাই মুসলমানদের একটা ষড়যন্ত্র এবং সিপাহীরা হলো তাদের হাতের পুতুল মাত্র"। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেভ ব্রাউন, টি.খালদুন, আই.এইচ. কোরেশী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও মুসলিম অভিজাতদের পরিকল্পিত বিদ্রোহ বলে মন্তব্য করেছেন।

বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতামত

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের চরিত্র যাচাই করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ সর্বত্রই জোরালো ভাষায় তাঁদের নিজস্ব মতামত ও যুক্তি তুলে ধরেন এবং তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে মোটামুটি দুটি পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। চালর্স রেক্স, জন কে, পি.ই রবার্টস প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে এটি সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রামরূপে দেখার কোনো যুক্তি নেই বলে তাঁরা মনে করেন। সমসাময়িক ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্যার সৈয়দ আহমদ খান, কিশোরী চাঁদ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনে করেন এটি ছিল কেবল সিপাহীদের বিদ্রোহ। তাঁদের যুক্তি হলো, এই বিদ্রোহের পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা পরিকল্পনা ছিল না। কোনো বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা তারা চিন্তা করে নি। তাছাড়া ভারতের সর্বত্র এ বিপ্লবের প্রভাবও পড়ে নি। সমাজের সব স্তরের মানুষ এতে যোগ দেয় নি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিপ্লবের বিরোধিতাই করেছিল। তাছাড়া অভ্যুত্থানে কোনো সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবকে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে তাঁরা মেনে নিতে চান না।

ঐতিহাসিকদের আরেকটি দল জে.বি. নর্টন, ডক্টর ডাফ, সুশোভন চন্দ্র সরকার প্রমুখের মতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব প্রথমত সিপাহী বিদ্রোহ রূপে শুরু হলেও পরে তা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। এই মতকে আরো সম্প্রসারিত করে সাভারকার ও শশীভূষণ চৌধুরী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে এ বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করা। বিদ্রোহ শুধু ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারতবর্ষের সর্বত্র এর প্রভাব না পড়লেও বাংলা প্রেসিডেন্সির অংশসহ উত্তর ভারতের বিশাল এলাকায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে এটি জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সাম্প্রতিককালে আরো দুজন ভারতীয় ঐতিহাসিক একটু ভিন্নভাবে এ বিপ্লবের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ড. সুরেন্দ্র নাথ সেনের মতে বিপ্লব প্রথমে দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে শুরু হলেও পরে এটি কেবল তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলোতে বিদ্রোহীদের পেছনে জনসাধারণের সমর্থন ছিল। ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার সার্বিকভাবে একে জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার লড়াই বলতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মূলত এটি ছিল সিপাহীদেরই বিদ্রোহ। তবে কোনো কোনো অঞ্চলে স্থানীয় জনগণের সমর্থন বা সহানুভূতির কারণে তা গণবিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব সিপাহী বিদ্রোহ বা রাজনৈতিক সংগ্রাম যাই হোক না কেন, এটা ঠিক যে- এর পূর্বে ভারতের এত বিশাল অঞ্চল জুড়ে মানুষের সংঘবদ্ধ ও ব্যাপক বিদেশি বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে নি এবং এত দীর্ঘ সময় ধরে তা স্থায়ীও হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে এ জাগরণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং বিদ্রোহ দমনের কালে এর জনপ্রিয়তা প্রকাশ পায়। ইংরেজ বাহিনী শুধু বিদ্রোহী সিপাহী বা বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী জমিদার তালুকদার ও অভিজাতদের দমন করেই ক্ষান্ত হয় নি। দিল্লি, অযোধ্যা, আগ্রা, পশ্চিম বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম ও শহরের পর শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় এবং অগণিত মানুষকে হত্যা করে। বিপ্লবের এই ধ্বংসাত্মক রূপ লক্ষ করে রেভারেন্ড ডাফ মন্তব্য করেছিলেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানকে নিছক সামরিক বিদ্রোহ বলা যায় না— এটি ছিল একটি বিপ্লব।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রকৃতি, কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে চেষ্টা করবেন।

সারাংশ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, এর স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেন। অনেক ঐতিহাসিক বিশেষ করে বৃটিশ ঐতিহাসিক ও সমকালীন ইংরেজ কর্মচারীদের মতে ১৮৫৭ সালের এ অভ্যুত্থান ছিল দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ। পক্ষান্তরে অন্য একদল ঐতিহাসিক বিশেষত ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখকদের মতে এটি ছিল বৃটিশ শাসন অবসান কল্পে প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার লড়াই। কেউ কেউ একে সামন্তশ্রেণির প্রতিরোধ বলেও মনে করেন। এসব কোনো মতেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য বা ভিত্তিহীন নয়। এসব বক্তব্যের প্রত্যেকটির মধ্যে আংশিক সত্য অবশ্যই রয়েছে। এ নিয়ে বাদানুবাদের অবসান এখনো ঘটে নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কত খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়?
ক) ১৮৫৬ খ) ১৮৫৭
গ) ১৮৫৮ ঘ) ১৮৫৯

২। "পুরো বিদ্রোহটাই মুসলমানদের একটা ষড়যন্ত্র এবং সিপাহীরা হলো তাদের হাতের পতুল মাত্র।" এটা কার ভাষ্য?
ক) কেভ ব্রাউন খ) টি. খালদুন
গ) আলফ্রেড লায়ল ঘ) আই.এইচ. কোরেশী

৩। ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরা সিপাহী বিদ্রোহের–
ক) সমর্থন করেছিল খ) যেকে দূরে ছিল
গ) বিরোধিতা করেছিল ঘ) কিছুই করেনি

৪। "১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান কোনো সামরিক বিদ্রোহ ছিল না, ছিল এক বিপ্লব।"- এ উক্তিটি কার?
ক) রেভারেন্ড ডাফ খ) আউটরাম
গ) আলফ্রেড লায়ন ঘ) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার

উদ্দীকটির পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ভারতবর্ষে এর পূর্বে এত বিশাল এলাকা জুড়ে মানুষের সংঘবদ্ধ ও ব্যাপক বিদেশি বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে নি এবং এত দীর্ঘ সময় ধরে তা স্থায়ীও হয় নি।

৫। উদ্দীপকে কোন বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে?
ক) কৃষক বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ খ) সিপাহী বিদ্রোহ
গ) সামন্ত প্রভুদের প্রতিরোধ ঘ) গণযুদ্ধ

৬। উক্ত বিদ্রোহের ফলে–
i. ভারতে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে
ii. ভারতের শাসন ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজ্যের কাছে হস্তান্তরিত হয়
iii. কোম্পানি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ সিপাহী বিপ্লবের কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিপ্লবের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	লর্ড ক্যানিং, মঙ্গল পাণ্ডে, ঝাঁসির রাণি,

ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা বিপ্লব। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর দেশীয় সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণে সৃষ্ট বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই গণবিদ্রোহ বৃটিশ শাসনকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তবে এই গণবিদ্রোহ শুধু যে সিপাহীদের অসন্তোষের ফল তা নয়। এর মূলে ছিল কোম্পানির অনুসৃত নীতি ও বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা। ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে এবং তা থেকেই বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে।

কোনো একটি বিদ্রোহ বা বিপ্লব একদিনে বা একটি কারণে সংঘটিত হয় না। এর পেছনে থাকে নানাবিধ কারণ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পেছনেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি কারণ ছিল। এছাড়াও কোনো কারণকে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

রাজনৈতিক কারণ

লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা তিনি সাঁতারা, ঝাঁসি, সম্বলপুর ও নাগপুর রাজ্য দখল করেন। তাঞ্জোর ও কর্নাটকের নবাবের বৃত্তি এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীয়াও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেন। অযোধ্যা রাজ্যটি কুশাসনের অভিযোগে গ্রাস করা হয় এবং অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার সাথে দখলকৃত অযোধ্যা ও নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করা হয়। এর ফলে নানা সাহেব ও ঝাঁসির রাণি বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং সাঁতারা ও নাগপুরের রাজপরিবারগুলো বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। ডালহৌসি মোগল সম্রাটের উপাধি পর্যন্ত কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার ও কুশাসনের কারণে ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক কারণ

ইংরেজ কোম্পানি শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। পলাশীর পর থেকে প্রায় একশ বছর ধরে ইংরেজরা ভারত থেকে সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ও অপরিসীম ধনসম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করে। ভারতবর্ষকে বিলাতী পণ্যের বাজার হিসেবে গড়ে তোলা হয়। অবাধভাবে বৃটিশ পণ্য আমদানির ফলে আস্তে আস্তে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ নতুন ভূমি ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর অসম্ভব করের বোঝা চাপান হয়। বহু লাখেরাজ সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ইংরেজ কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর সেখানকার বহু তালুকদার জমির মালিকানা হারান। এভাবে ইংরেজদের শোষণ নীতির কারণে জনগণের দুর্দশা ও দুরবস্থা চরমে উঠলে তারা বিদেশি শাসন বিরোধী হয়ে উঠে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

বিজিত ভারতবাসী এবং বিজেতা ইংরেজদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব থাকায় উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সে কারণে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ আইন, শিশু হত্যা নিবারণ, নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সংস্কারমূলক

পদক্ষেপ সনাতনপন্থী হিন্দুদের মনে সন্দেহ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার, জেলখানার কয়েদীদের কাছে পাদরীদের যাতায়াত এবং অসহায় ও গরীবদের শিক্ষা-দীক্ষায় আর্থিক সহায়তা দান হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন আশংকার সৃষ্টি করে যে, ইংরেজদের উদ্দেশ্য হলো ভারতবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। রেলপথ বিস্তার ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন একই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে তারা সন্দেহ পোষণ করে।

সামরিক কারণ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল সিপাহীদের অসন্তোষ। যে সিপাহীরা ছিল বৃটিশ রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ, নানাবিধ কারণে তারাও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের বেতন ছিল খুবই কম। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার হতো। সামরিক কারণে দূরদেশে অবস্থান কালে ইংরেজ সৈনিকরা ভাতা পেত। কিন্তু ভারতীয় সিপাহীরা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। বৃটিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহার, উদ্ধত ও অপামানজনক আচরণে দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়। সিপাহীদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারে উৎসাহ দেয়া, কপালে তিলক লেপন, দাঁড়ি রাখা ও পাগড়ী পরা নিষিদ্ধ করা, কালাপানি অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করা ইত্যাদির কারণে তাদের ধর্ম বিশ্বাসেও আঘাত লাগে এবং তারা ক্রমশ ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে।

প্রত্যক্ষ কারণ

বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হল চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের প্রবর্তন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীতে এনফিল্ড রাইফেল নামে এক ধরনের বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। ব্যবহারের পূর্বে এর কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। গুজব রটে যে, উক্ত রাইফেলে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের প্রচলন করে বৃটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম নাশ করার ষড়যন্ত্র করছে। ফলে দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পান্ডে নামে এক সিপাহী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মঙ্গল পাণ্ডে এবং তার একজন সমর্থককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে বিদ্রোহের আগুন নেভাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর মে মাসে বড় আকারের বিদ্রোহ দেখা দেয় মীরাটের সেনা ছাউনিতে। সিপাহীরা সরকারী নির্দেশ অমান্য করে এবং কর্নেল ফিনিসকে গুলি করে হত্যা করার পর প্রকৃত বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের কারণগুলো বর্ণনার করবেন

সারাংশ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব শুধু যে সিপাহীদের অসন্তোষের ফল তা নয়। এর পেছনে ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ ও ক্ষোভ। বিপ্লবের কারণসমূহকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, ধর্মীয় ও সামাজিক এবং প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিদেশী শাসন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ এ বিপ্লবের মাধ্যমেই ঘটেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন কে?
ক) লর্ড কানিং খ) লর্ড ডালহৌসী গ) লর্ড ওয়েলেসলি ঘ) উইলিয়াম বেন্টিংক

২। স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন কে?
ক) ওয়ারেন হেস্টিংস খ) লর্ড কর্নওয়ালিস গ) উইলিয়াম বেন্টিংক ঘ) লর্ড ডালহৌসি

৩। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল–
ক) সামাজিক খ) এনফিল্ড রাইফেল প্রবর্তন গ) সামরিক ঘ) রাজনৈতিক

৪। সিপাহীর গুলিতে নিহত হন–
ক) লর্ড ক্যানিং খ) কর্ণেল ফিনিস গ) লর্ড ডালহৌসি ঘ) উইলিয়াম বেন্টিংক

৫। ব্যারাকপুরে প্রথম প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন কে?
ক) মঙ্গল পান্ডে খ) বাজীয়াও গ) নানা সাহেব ঘ) লক্ষ্মী বাঈ

সৃজনশীল প্রশ্ন

অরবিন্দ ঢালী, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত। তিনি লক্ষ্য করেছেন দেশীয় সৈন্যদের থেকে বিদেশি সৈন্যদের বেশি বেতন দেয়া হয়। ভিন্ন দেশে কর্মরত থাকলেও দেশীয় সৈন্যদের ভাতা দেয়া হয় না ভাতা দেয়া হয় বিদেশি সৈন্যদের। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার। এছাড়া ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাদের দুর্ব্যবহার, উদ্ধত ও অপমানজনক ব্যবহার তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তৈরি করে। কপালে তিলক লেপন, দাড়ি রাখা, পাগড়ীপরা ও জোর করে সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করায় ক্রমশ দেশীয় সৈন্যরা ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ক. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী? ১
খ. প্রকৃত বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে কখন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে বিদ্রোহের সাদৃশ্য আছে, তার সামরিক কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "উক্ত বিদ্রোহের ফলে কোম্পানি শাসকের অবসান ঘটে।" বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৭.৩ বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব সফল না হওয়ার বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিপ্লবের সময় ইংরেজ পক্ষের শক্তি ও সুবিধাসমূহ কী ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিপ্লবের পক্ষের শক্তির দুর্বলতা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, কুনওয়ার সিং

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব-এর ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় ছিল এক বিরাট প্রতিরোধ সংগ্রাম বা গণবিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর উপক্রম করে। কিন্তু নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এ বিপ্লব সফল হয় নি। এর ব্যর্থতার কারণগুলো নিম্নরূপ:

পূর্বপরিকল্পনার অভাব

এই বিপ্লব পূর্বপরিকল্পিত ছিল না এবং কোনো রকম পরিকল্পনা অনুসারে কার্যকরীও হয় নি - বিদ্রোহীদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থাও ছিল না। বিভিন্ন স্থানে নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিন্নভাবে এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। উপযুক্ত যোগাযোগ বা সংহতি তাঁদের মধ্যে ছিল না। ফলে একই সময়ে সকল জায়গায় অভ্যুত্থান যেমন ঘটে নি, তেমনি সর্বত্র একই পদক্ষেপ বা কর্মপন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। অপরদিকে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী নেতাদের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকায় সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা ব্যর্থ হয়। নানা সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পেশোয়া পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ যাঁকে বিদ্রোহীরা নেতা নির্বাচন করে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মোগল সম্রাটের হারানো শক্তির পুনরুদ্ধার করা। উভয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল পরস্পর বিরোধী। ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈও নিজের হারানো রাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

সংঘবদ্ধতার অভাব

এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার অন্যতম কারণ ছিল এতে দেশের সকল শ্রেণির মানুষ যোগ দেয় নি। তা ছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতি অনেকের সমর্থনও ছিল না। যদিও কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রকট আকার ধারণ করেছিল, তথাপি তা ছিল সীমাবদ্ধ প্রকৃতির। উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড এবং বাংলা ও বিহারের পশ্চিমাঞ্চলেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকে। দক্ষিণ

ভারতের বিশাল এলাকায় এর বিস্তৃতি ঘটে নি। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং দেশীয় রাজণ্যবর্গের বড় অংশ এই বিদ্রোহ থেকে নিজেদের দূরে রাখে।

অন্যদিকে দেশীয় নৃপতিদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে। হায়দ্রাবাদের নিজাম, কাশ্মীরের মহারাজা এবং মারাঠা অধিপতি সিন্ধিয়ার ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্যযোগ্য। লর্ড ক্যানিং এ সময় বলেছিলেন যে, যদি মারাঠা নেতা সিন্ধিয়া এই বিদ্রোহে যোগ দেয় তাহলে ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, কাশ্মীরের মহারাজার করুণার উপর তখন পাঞ্জাবে ইংরেজদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। বিপ্লবের সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা অর্থাৎ শিখ ও গুর্খা বাহিনী এবং কিছু সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা সিপাহীদের পক্ষ না নিয়ে বরং ইংরেজদের সাহায্যে এগিয়ে যায়।

দক্ষ নেতৃত্বের অভাব

বিদ্রোহীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল। নেতাদের অধিকাংশই বিদ্রোহের যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হন। ঝাঁসির রাণি, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, কুনওয়ার সিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্ব-স্ব এলাকায় সুযোগ্য নের্তৃত্বের পরিচয় দিলেও ব্যাপক বিদ্রোহের সার্বিক নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তাঁদের কারও ছিল না। তা ছাড়া কোনো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নি। ফলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টাগুলো সহজেই ইংরেজদের পক্ষে দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

ইংরেজদের সামরিক শক্তি

ইংরেজদের সামরিক সংগঠন ও রণকৌশল তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে উন্নততর ছিল। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আধুনিক ও উন্নত ধরনের। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের তুলনায় ইংরেজ সেনাপতিরা ছিলেন অধিক দক্ষ, সাহসী ও রণকৌশলী যোদ্ধা। লরেন্স, আউটরাম বা নিকলসনের মতো নির্ভিক ও সমরকুশলী বিদ্রোহীদের মধ্যে কেউই ছিলেন না।

বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব

যুদ্ধাস্ত্র এবং শক্তির দিক থেকেও বিদ্রোহীরা দুর্বল ছিল। তাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল গাদা বন্দুক। বিপরীতে ইংরেজ বাহিনী ছিল আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। রেলপথে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ, টেলিগ্রাফের সাহায্যে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছানো ইত্যাদি ব্যবস্থা বিদ্রোহ দমনে তাদের প্রভূত সাহায্য করে। তদুপরি বৃটিশ নৌবাহিনী পারস্য ও মালয় থেকে প্রয়োজনীয় সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে স্বপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে দেশীয় সিপাহীরা তাদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী সংঘর্ষ চালাতে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণগুলো লিপিবদ্ধ করবেন।

সারাংশ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে ব্যর্থ হয়। এ বিপ্লবের পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় ঐক্যবদ্ধ কোনো কর্মপন্থা বা সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় নি। দুর্বল নেতৃত্ব, আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ, উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাব, নিম্নমানের সমরাস্ত্র ও দুর্বল রণকৌশল বিদ্রোহীদের পরাজয়কে অবধারিত করে তোলে। অন্যদিকে ইংরেজদের দক্ষ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত সামরিক শক্তি তাদের গলায় বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে বিদ্রোহীরা কাকে নেতা নির্বাচিত করেছিল?

ক) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ খ) নানা সাহেব গ) হায়দ্রাবাদের নিজাম ঘ) লক্ষ্মীবাঈ

২। বিদ্রোহ দমনে সক্রিয়ভাবে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করে–
i. হায়দ্রাবাদের নিজাম
ii. কাশ্মীরের মহারাজ
iii. মারাঠা অধিপতি সিন্ধিয়ার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। "যদি মারাঠা নেতা সিন্ধিয়ার ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যোগ দেয়, তাহলে ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে।" এ কথা কে বলেছিলেন?
ক) লর্ড ডালহৌসি খ) লর্ড ক্যানিং গ) উইলিয়াম বেন্টিংক ঘ) লর্ড ওয়েলেসলি

৪। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় পাঞ্জাবে ইংরেজদের অস্তিত্ব নির্ভর ছিল কার উপর?
ক) হায়দ্রাবাদের নিজাম খ) কাশ্মীরের মহারাজ গ) মারাঠা অধিপতি সিন্ধিয়া ঘ) ঝাসির রানি লক্ষ্মী বাঈ

৫। ইংরেজদের বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করে–
i. উন্নততর সামরিক সংগঠক ও রনকৌশল
ii. আধুনিক ও উন্নতমানের অস্ত্র শস্ত্র
iii. দক্ষ, সাহসি ও রণকৌশলী সেনাপতি ও যোদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ বিপ্লবের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পরে ভারতের অবস্থা কী হয়েছিল, বিবরণ দিতে পারবেন।
- বৃটিশ সরকারের নীতি ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিপ্লবের আশু ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	গণবিপ্লব, ভাইসরয়, বোর্ড অব কন্ট্রোল, কেবিনেট

কোম্পানি শাসনের অবসান

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। নানাবিধ কারণে সে গণবিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। কোম্পানি থেকে বৃটিশ রাজের হাতে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর ইংরেজদের ভারত শাসন নীতি ও শাসন ব্যবস্থায় বেশকিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। বৃটিশ সরকার স্পষ্টত অনুধাবন করে যে, একটি বণিক সম্প্রদায়ের হাতে ভারতের ন্যায় এত বড় সাম্রাজ্যের শাসনভার ছেড়ে দেয়া নিরাপদ নয়। সে কারণে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট বৃটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ করে। কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার কর্তৃত্ব বিলোপ করা হয়। পূর্বেকার বোর্ড অব কন্ট্রোলের স্থলে বৃটিশ কেবিনেট মন্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, তিনি পনের সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারত শাসন করবেন। ভারত সরকারের নির্বাহী প্রধান গভর্নর জেনারেল এখন থেকে রাজ প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় উপাধি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

রাণি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র

ভারতীয়দের মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারাণি ভিক্টোরিয়ার এক রাজকীয় ঘোষণা প্রচারিত হয়। রাণির ঘোষণায় দেশীয় রাজাদের আশ্বাস দেয়া হয় যে, বৃটিশ সরকার আর কোনো ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করবে না। পূর্বেকার রাজ্য বিস্তার নীতি সরকার বর্জন করবে। দেশীয় রাজণ্যবর্গের মর্যাদা, অধিকার এবং প্রচলিত রীতিনীতি রক্ষা করা হবে। দত্তকপুত্র গ্রহণের রীতি প্রচলিত থাকবে এবং স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হবে। বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকবেন।

মহারাণির ঘোষণাপত্রে এ কথাও বলা হলো যে, একমাত্র বৃটিশ নাগরিক ও প্রজাদের হত্যাকাণ্ডের সংগে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলকে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের দায় থেকে মুক্তি দেয়া হবে। যোগ্যতা অনুসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়দেরকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করা হবে। বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর সামাজিক প্রথা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবেন।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

ভারত শাসনের জন্য আরও কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ মাদ্রাজ ও বোম্বে কাউন্সিলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিত করে তা কলকাতা কাউন্সিলের উপর অর্পণ করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরে এই কেন্দ্রীয়করণ নীতি পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল এ্যাক্টের মাধ্যমে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে আইন প্রণয়নের অধিকার প্রত্যর্পণ করা হয়। নতুন কোনো প্রদেশ গঠিত হলে ঐ প্রদেশের জন্য আইন সভা এবং সেখানে ভারতীয় সদস্য মনোনয়নের বিধানও গৃহীত হয়।

সেনাবাহিনী ও অর্থনীতির উপর প্রভাব

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ভারতের সেনাবাহিনী ও অর্থনীতির উপর। হাজার হাজার বিদ্রোহী সিপাহীদের হত্যা করে ও প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বৃটিশ সরকার বিদ্রোহের চরম প্রতিশোধ নেয়। ভবিষ্যতে সৈন্যবাহিনীতে যেন আর কোনো বিদ্রোহ ঘটতে না পারে সে জন্য কতিপয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সেনাবাহিনী অবলুপ্ত করে তা পুনর্গঠন করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় এবং উচ্চপদে তাদের পদোন্নতি বন্ধ রাখা হয়। অযোধ্যা ও বেনারস থেকে সৈনিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এর পরিবর্তে বিপ্লবকালে অনুগত অঞ্চল পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও নেপাল থেকে সামরিক জাতি বলে চিহ্নিত শিখ, পাঠান ও গুর্খাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া শুরু হয়। সেনাবাহিনীতে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং দেশীয় সৈন্য সংখ্যা যাতে তাদের দ্বিগুণের বেশি না হয় সে দিকেও সরকার মনোযোগী হন। তাছাড়া সেনাবাহিনীর মধ্যে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ বজায় রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়। এ সবের ফল হিসেবে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে নতুন নতুন করের বোঝা এদেশবাসীর উপর চাপানো হয়। ঔপনিবেশিক নীতির প্রয়োগ হিসেবে ভারতবর্ষে বৃটিশ পণ্যের অবাধ বাজার তৈরি হওয়ায় এ দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

মোগল সম্রাটের আইনানুগ অধিকার বিলুপ্ত

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পরে মোগল সম্রাটের আইনানুগ অধিকারের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। বিদ্রোহী সিপাহীরা যাঁকে নেতা বলে ঘোষণা করেছিল, সেই দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর বন্দি হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পরোক্ষ প্রভাব

বিপ্লবের একটা পরোক্ষ প্রভাব ছিল শাসক-শাসিতের সম্পর্কের উপর। বিদ্রোহের সময় উভয় পক্ষ চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব বাড়ে। সহযোগিতার পরিবর্তে বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্রমশ ভারতবাসীর বিরোধিতা শুরু হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি চাকুরীসহ দেশ শাসনে অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন।

সারাংশ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পরে ভারতে এক বছরের (১৭৫৭-১৮৫৭) কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার বৃটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। বৃটিশ কেবিনেটের একজন সদস্য ভারত সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হয় শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্য করবে ১৫ সদস্যের একটি কাউন্সিল। বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির অবসান ঘোষণা করে। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে ভারতীয়দের প্রতি ন্যায় বিচারের পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করা হয়। বিদ্রোহের ঝুঁকি এড়াবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বাড়ান হয়। ভারতে মোগল সম্রাটের আইনানুগ কর্তৃত্বের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে–
ক) ১৮৫৭ খ্রি. খ) ১৮৫৭ খ্রি. গ) ১৮৫৯ খ্রি. ঘ) ১৮৬০ খ্রি.

২। ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরয় কে?
ক) লর্ড কার্জন খ) লর্ড ক্যানিং গ) লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ) লর্ড আমহার্স্ট

৩। ভারতবর্ষের শাসনভার ইংল্যান্ডের রানির উপর অর্পিত হয়
ক) ১৮৫৭ খ্রি. খ) ১৮৫৮ খ্রি. গ) ১৮৫৯ খ্রি. ঘ) ১৮৬০ খ্রি.

৪। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণা প্রচারিত হয়–
ক) ১৮৫৭ খ্রি. খ) ১৮৫৮ খ্রি. গ) ১৮৫৯ খ্রি. ঘ) ১৮৬০ খ্রি.

৫। ভারত সচিবকে সাহায্য করার জন্য কত সদস্যের কাউন্সিল গঠনের কথা বলা হয়?
ক) ১২ খ) ১৪ গ) ১৩ ঘ) ১৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে সেনাবাহিনী ও অর্থনীতির উপর। হাজার হাজার বিদ্রোহী সৈন্যদের হত্যা করে ও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বিদ্রোহের প্রতিশোধ নেয়া হয়। ভবিষ্যতের বিদ্রোহ দমনের জন্য ভারতীয়দের গোলন্দাজ বাহিনীতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। ভারতীয় সৈন্য হ্রাস করে বিদেশি সৈন্য দ্বিগুণ করা হয়। ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নতুন নতুন করের বোঝা এ দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। বিদেশি পণ্যের অবাধ বাজার তৈরি হওয়ায় দেশের কৃষি শিল্প ও ব্যবসায় অপুরণীয় ক্ষতি হয়।

ক. কত খ্রিস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়?১
খ. ভারত বর্ষের শাসনভার মহারানীর হাতে অর্পণ করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে বিদ্রোহের সাদৃশ্য আছে তার প্রভাব আলোচনা করুন। ৩
ঘ. 'সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল ছিল সুদুরপ্রসারী'– বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। খ ৬। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। খ ৫। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। খ ৫। ঘ

বৃটিশ শাসনামলে সামাজিক সংস্কার ও স্বাধীকার আন্দোলন

ইউনিট ৮

ভূমিকা

আঠার শতকের শেষ পর্ব থেকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দিয়ে এর সূচনা। উনিশ শতকে শুরু হয় বাংলায় সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা সংস্কার। হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সমাজেও কিছুটা বিলম্বে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। খ্রিস্টান মিশনারি স্যার উইলিয়াম কেরীর শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বাংলার শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তৈরি করে। এর ধারাবাহিকতায় রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজকে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে নেন। কয়েক দশক পরে বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে নেয়ার জন্য সংস্কার তৎপরতা চালান নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, হাজি মোহাম্মদ মহসীন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও মুসলমান সমাজে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনও পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার এবং অনৈসলামিক ভাবধারা বিসর্জন দিয়ে ইসলামের বিশুদ্ধ জীবন ধারায় ফিরে যাওয়া। এই লক্ষ্যে পূর্ব বাংলায় হাজী শরীয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন, তিতুমীরের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলায় তরীকা-ই-মোহাম্মদীয়া আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই দু'টি আন্দোলন মূলত ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে শুরু হলেও কৃষক প্রজাদের মধ্যে আন্দোলনের জনপ্রিয়তার কারণে শ্রেণি স্বার্থের দ্বন্দ্বে জমিদার ও নীলকরদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকার জমিদার নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করায় পরিণতিতে এই সংস্কারমুখী প্রচেষ্টা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়।

এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি বাংলায় সংঘটিত ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ, স্যার ইউলিয়াম কেরীর সংস্কার, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে পরিচালিত সমাজ ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনসমূহ এবং তিতুমিরের আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন। এ সম্পর্কে নানা বিষয়ে ব্যাখ্যাও দিতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফকির ও সন্ন্যাসীদের জীবন-আচার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইংরেজদের সাথে তাঁদের বিরোধের কারণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহকে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন, কাছারী, নায়েব গোমস্তা, মজনুশাহ

আঠার শতকের শেষার্ধে বাংলায় ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল বৃটিশ বিরোধী একটি সশস্ত্র সংগ্রাম। এই সময় ফকির নামে পরিচিত মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী নামে পরিচিত মানুষ

সমাজে ছিল। এই সংসার ত্যাগী সম্প্রদায়ের মানুষ দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতো। ধর্মের কথা বলতো। সাধারণ মানুষ তাদের ভক্তি করত। মানুষের দেয়া তাদের চাল, ডাল সব্জিতে তাদেরা জীবন নির্বাহ হতো। ধর্মীয় উৎসব বা তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষ্যে এসকল ফকির সন্ন্যাসীরা সারা বছর একস্থান হতে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন এবং পথে নিরাপত্তার জন্য তারা নানা ধরনের হাল্কা অস্ত্র সাথে বহন করতেন। প্রকৃত পক্ষে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত এরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতেন। জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষকের হয়ে মাঝে মাঝে তারা রুখে দাঁড়াতেন।

জমিদাররা তাই ফকির সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ক্ষেপিয়ে তুলতো। এর প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ সরকার তাদের স্বাধীন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। তীর্থস্থান দর্শনের উপর করারোপ করে। ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বে-আইনী ঘোষণা করে। পরিকল্পনা করে ফকির সন্ন্যাসীদের ডাকাত-দস্যু বলে মানুষের কাছে হেয় করে তুলতো। এসব কারণে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। তাই এক পর্যায়ে ফকির ও সন্ন্যাসীরা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের এ তৎপরতা ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় যা প্রায় চার দশক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

বিদ্রোহের গতি

ফকির ও সন্ন্যাসীরা সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছারী ও নায়েব গোমস্তার বাড়ি আক্রমণ করতো। লাঠি, বর্শা, তরবারী ও গাদা বন্দুক ছিল তাদের অস্ত্রশস্ত্র। চাকুরী হারা অনেক সৈনিক এবং দুর্দশাগ্রস্থ বহু কৃষক তাদের সংগ্রামে যোগ দেয়। ফকিরগণ বাংলার অধিবাসী হলেও তাদের আন্দোলনের প্রধান নেতারা ছিলেন অবাঙালি। বিদ্রোহী ফকিরদের নেতা ছিলেন মজনু শাহ এবং সন্ন্যাসীদের নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক।

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম শুরু করে। এরপর একদল ফকির ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাকেরগঞ্জে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হামলা করে। তাদের আক্রমণের মুখে কুঠির প্রধান মি. লিস্টার পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ফকির দল বিনা বাঁধায় কুঠি দখল করে লুণ্ঠন করে। সে বছরেই সন্ন্যাসীরা রাজশাহীতে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হানা দেয়। ফ্যাক্টরির প্রধান মি. বেনেটকে তারা বন্দি করে এবং পাটনায় নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে। উত্তর বঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসী তৎপরতা দমনের জন্য ক্যাপ্টন ডি. ম্যাকেঞ্জির নেতৃত্বে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে এক অভিযান প্রেরিত হয়। সেই অভিযানের সময় ইংরেজ পক্ষের লেফটেন্যান্ট কিথ এবং তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয়।

১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে ফকির মজনু শাহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা গড়ে তোলেন। পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কোম্পানিকে রংপুর ও দিনাজপুরে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণ করতে হয়। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ দুই হাজার সশস্ত্র অনুগামীসহ রাজশাহী আক্রমণ করেন এবং কোম্পানির রাজস্ব অফিস লুণ্ঠন করেন। পরের বছর অন্য এক সংঘর্ষে সন্ন্যাসীদের হাতে ক্যাপ্টেন টমাস পরাজিত ও নিহত হন। মজনু শাহের সাথে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যধ্যক্ষ রবার্টসনের বাহিনীর এক তীব্র সংঘর্ষ হয়। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শেষে মজনু শাহ পালিয়ে যান। এরপরেও উত্তর বঙ্গ এবং ময়মনসিংহে ইংরেজ বাহিনীর সাথে মজনু শাহ-এর কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়েছিল।

ঐসব সংঘর্ষে মজনু শাহের রণকৌশল ছিল গেরিলা কায়দায় আক্রমণ ও নিরাপদে পলায়ন করা। কিন্তু কোম্পানির পক্ষে কখনো তাঁকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। ফকির মজনু শাহ ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ফকির দলের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, সোবহান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকিরগণ। এঁরাও কয়েক বছর কোম্পানিকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন। কিন্তু নেতৃত্বের কোন্দল, সংঘবদ্ধতার অভাব, সরকারী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ফকিরদের প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাঁরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠকের সঙ্গে ফকির দলনেতা মজনু শাহের যোগাযোগ ছিল। রংপুর, রাজশাহী ও বগুড়া অঞ্চল ছিল তাঁর আশ্রয়স্থল। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের অধীনে একদল বৃটিশ সৈন্যের আক্রমণে ভবানী পাঠক ও তাঁর দুই সহকারী নিহত হন এবং অপর ৪২ জন বন্দি হয়। দেবি চৌধুরাণী নামের একজন ছোট জমিদারের সঙ্গে ভবানী পাঠকের যোগযোগ ছিল বলে এক সরকারী নথিতে উল্লেখ রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের ফলে ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন এক সময় স্তিমিত হয়ে গেলেও এতে বৃটিশ বিরোধী জনমত গড়ে উঠে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ফকির সন্নাসীদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

বাংলার ফকির ও সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল একটি বৃটিশ বিরোধী সংগ্রাম। ইংরেজ সরকার ফকির ও সন্ন্যাসীদের চিরাচরিত জীবন ধারায় বাঁধা সৃষ্টি করলে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। মজনু শাহের নেতৃত্বে ফকিররা সুদীর্ঘ সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মজনু শাহের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে তাদের সংগ্রামের অবসান ঘটে। সন্ন্যাসী আন্দোলনে প্রধান নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ভবানী পাঠকের মৃত্যু হলে এই আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বাংলায় ফকির সন্ন্যাসী আন্দোলন শুরু হয়
ক) ১৭৫০ খ্রি. খ) ১৭৫৭ খ্রি. গ) ১৭৬০ খ্রি. ঘ) ১৭৬৫ খ্রি.

২। সন্ন্যাসীরা পাটনায় নিয়ে হত্যা করে–
ক) মি. লিস্টারকে খ) ডি. ম্যাকেঞ্জিরকে গ) মি. বেনেটকে ঘ) লেফটেন্যান্ট কিথকে

৩। ফকির মজনুশাহ মারা যান–
ক) ১৭৮৬ খ্রি. খ) ১৭৮৭ খ্রি. গ) ১৭৮৮ খ্রি. ঘ) ১৭৮৯ খ্রি.

৪। জমিদার দেবী চৌধুরানির সাথে যোগাযোগ ছিল কার?
ক) ভবানী পাঠকের খ) মজনুশাহের গ) আহম্মদ শাহের ঘ) দুদু মিয়ার

পাঠ-৮.২ স্যার উইলিয়াম কেরী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্যার উইলিয়াম কেরীর পরিচয় এবং বাংলায় তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- উইলিয়াম কেরী এদেশে আধুনিক শিক্ষা বিকাশে কী ভূমিকা রেখেছিলেন তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং সংবাদপত্র প্রকাশে কেরীর অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	উলিয়াম কেরী, বাংলা ভাষা, সতিদাহ প্রথা

সতের শতক থেকেই বাংলায় খ্রিস্টান মিশনারিরা সীমিতভাবে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মিশনারিদের তৎপরতা অনেক বেড়ে যায়। বিশেষ করে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির আগমনের মধ্যদিয়ে প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদ প্রচারিত হতে থাকে।

উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.) ছিলেন একজন ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি। তাঁকে আধুনিক যুগের খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের জনক (father of modern missions) বলা হয়। তিনি ছিলেন ডেনমার্কের অধিবাসী। জসুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামের দুই বন্ধুকে নিয়ে উইলিয়াম কেরী ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে আসেন। তিনি হুগলি জেলার সিরামপুরে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করে ধর্মপ্রচারের যাত্রা শুরু করেছিলেন। সিরামপুর মিশন কালক্রমে খ্রিস্টধর্ম বিকাশ ও নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই মিশনের উদ্যোগে উইলিয়াম কেরীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল। এর কারিকুলামে যুক্ত করা হয়েছিল আধুনিক বিজ্ঞান, ভূগোল এবং ইতিহাস। সিরামপুর মিশনের উদ্যোগে স্কুলগুলোর জন্য বাংলা

ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। পুস্তক মুদ্রণের জন্য এই মিশনে স্থাপন করা হয় ছাপাখানা। কেরী জার্মানি থেকে মুদ্রণযন্ত্র ক্রয় করে এনেছিলেন। উইলিয়াম কেরী ও তাঁর বন্ধুরা ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা টেক্সটবুক সোসাইটি স্থাপন করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য এখান থেকে পুস্তক ছাপা হতো। উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে সিরামপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে খ্রিস্টান ও অ-খ্রিস্টান সকল শিক্ষার্থীকেই শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব পড়ানো হতো। এই মিশন পরিচালনার জন্য ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি চার্টার অনুমোদন করেন।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ছাড়াও সিরামপুর মিশন বাংলা ভাষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। এরমধ্যে ছিল অভিধান প্রণয়ন ও ব্যকরণ গ্রন্থ রচনা। এছাড়াও উইলিয়াম কেরী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। এ ব্যাপারে মিশনারীদের সাহায্য করেছিলেন রামরাম বসু। তিনি নিজে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না করলেও মিশনারীদের নানাভাবে সহায়তা করেন। বাইবেল অনুবাদে তাঁর প্রত্যক্ষ সহায়তা ছিল। রামরাম বসু খ্রিস্টধর্মসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এই মিশন থেকে 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ' নামে দুটি সাময়িকীও প্রকাশ করা হয়। এভাবেই এদেশে বাংলা সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়। 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকাও প্রকাশিত হয় সিরামপুর মিশন থেকে। এটিই ছিল 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার আদি রূপ। উদ্ভিদচর্চা এবং কৃষি উন্নয়নেও উইলিয়াম কেরী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। উদ্ভিদ উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য তিনি হাওড়ার কাছে শিবপুরে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন বা উদ্ভিদ উদ্যান তৈরি করেছিলেন। তিনি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে উদ্ভিদ বীজ এনে এখানে বপন করেন। কেরীর এই প্রচেষ্টার ফল ছিল উত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত 'এগ্রি-হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'। হিন্দু ধর্মের ভেতর কোনো কোনো ক্ষেত্রে অমানবিক আচরণ ছিল। যেমন সতীদাহ প্রথা বা কালাপানি (সমুদ্র) পাড়ি দেয়ায় নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি। এসবের বিরুদ্ধে কেরী জনমত তৈরি করতে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ উলিয়াম কেরির জীবন ও কর্ম নিয়ে একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

উনিশ শতককে বাংলায় নানা ধরনের সংস্কার চলছিল। এই সকল সংস্কারের মধ্যদিয়েই বাংলার মানুষ শিক্ষা ও চিন্তায় নিজেদের যুক্ত করে। আর এই সংস্কারের যাত্রা শুরু হয়েছিল খ্রিস্টান মিশনারি স্যার উইলিয়াম কেরীর মাধ্যমে। তিনি তাঁর সিরামপুর মিশনকে ঘিরে আধুনিক শিক্ষার যাত্রা শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় গঠিত হয় স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ছাপাখানা প্রভৃতি। তাঁর মিশন থেকে প্রকাশিত হয় সংবাদপত্র। তিনি কৃষি উন্নয়নেও ভূমিকা রেখেছিলেন। তাছাড়া হিন্দু সমাজে প্রচলিত অমানবিক সতিদাহ প্রথা বন্ধের জন্যও তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উইলিয়াম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪ খ্রি.) কে ছিলেন?

ক) ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি খ) যোদ্ধা গ) খেলোয়াড় ঘ) কবি

২। 'দি ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নামে ইংরেজি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় কোথা থেকে?

ক) সিরামপুর মিশন খ) ভাগলপুর মিশন গ) রামপুর মিশন ঘ) সৈয়দপুর মিশন

৩। নিচের কোনটি সঠিক?

i. উইলিয়াম কেরী ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে আসেন

ii. ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা টেক্সটবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়

iii. কৃষি উন্নয়নেও উইলিয়াম কেরী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৩ রাজা রাম মোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উনিশ শতকে কেন হিন্দু সমাজ সংস্কারে সংস্কারকগণ এগিয়ে এসেছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজকে কীভাবে আধুনিক জীবনের দিকে নিয়ে এসেছিলেন তা লিখতে পারবেন।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার কার্যক্রম বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	রাজা রাম মোহন রায়, রাষ্ট্র সমাজ, বিদ্যাসাগর

পাঠ-৩: হিন্দু সমাজ সংস্কার

উনিশ শতকে ভারতে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সাথে ধর্মসংস্কার ও শিক্ষান্নোয়নের একটি সম্পর্ক ছিল। বাংলার হিন্দু সমাজ সংস্কারে অভিন্ন বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইংরেজদের আগমন ও ক্ষমতাসীন হওয়া বাংলার সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান দুই সমাজেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে শাসক ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ অনুমোদন দেয়নি ইংরেজদের সংস্পর্শে আসার। ইংরেজ সান্নিধ্যকে তারা ধর্মীয় অনাচার হিসেবে মনে করতে থাকে। একারণে আধুনিক ইউরোপীয় জ্ঞানের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পারে নি। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণকে পাপ বিবেচনা করতে থাকে। এই বাস্তবতায় হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে আধুনিকতার পথে এগিয়ে এনেছিলেন যেকজন বাঙালি সংস্কারক তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪- ১৮৩৩ খ্রি.)

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রামমোহন রায় উনিশ শতকের একজন ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত। হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে এক হিন্দু পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। রামমোহন রায়ের পারিবারিক ধর্মীয় ঐতিহ্য সে যুগের বিচারে ব্যাতিক্রমী ছিল। রামমোহন রায়ের পরিবার রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। পারিবারিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ঠাকুরদা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায় বৈষ্ণব মতবাদ গ্রহণ করেন। অন্যদিকে তাঁর মা তারিণী দেবী শৈব পরিবারের মেয়ে ছিলেন। এসব কারণেই সম্ভবত একটি উদার ও মিশ্র ধর্মীয় অবয়বের ভেতর অনেকটা মুক্ত মানসিকতায় বেড়ে উঠেছিলেন রামমোহন রায়। তাই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

রাজা রামমোহন রায় একজন ধর্ম সংস্কারক ও শিক্ষা সংস্কারক হিসেবে পরিচিত হলেও সমাজ সংস্কারক হিসেবেই তাঁর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। তাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল।

রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতাতে চলে আসেন। এসময় থেকে তিনি সমাজ সংস্কারে নিবেদিত হন। এখানে তিনি সমমনা বন্ধুদের একত্রিত করে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এর নাম হয় 'আত্মীয়সভা'। নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন করা হতো এখানে। ধর্মীয় ও সামাজিক নানা সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হতো। এই সভায় দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মত বরেণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকতেন।

সাধারণ হিন্দুদের ভেতর মুক্তচিন্তা ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায় সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে ১৮২১ সালে প্রকাশ করেন *সংবাদ কৌমুদী* নামে একটি বাংলা সংবাদপত্র। পরের বছর ফারসি ভাষায় আরেকটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এর নাম ছিল *মিরাত উল আখবার*।

রামমোহন রায় মূর্তিপূজা বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপনের পক্ষে সমর্থন পেলেন উপনিষদ থেকে। উপনিষদে বহু দেবদেবির পরিবর্তে নিরাকার ব্রহ্মার উপাসনার কথা রয়েছে। এই সূত্রেই তিনি ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসভা' নামে একটি সংগঠনের জন্ম দেন। এখানে নিরাকার ব্রহ্মার স্মরণে ধর্মসঙ্গীত গেয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। পরবর্তী সময়ে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে ব্রাহ্মসভা 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

বহুকাল আগে থেকেই হিন্দু সমাজে অনেক কুপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। এর অন্যতম হচ্ছে সতী। সতীদাহ প্রথা অনুসারে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পেড়ানো হতো। গোঁড়া হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধের মধ্যেও রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন। তিনি প্রভাবিত করতে থাকেন কোম্পানির শাসকদের। এই সূত্রে ১৮২৯ সালে গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের অনুমোদনে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করে আইন পাশ হয়।

রামমোহন রায়কে সাধারণভাবে রাজা রামমোহন রায় বলা হয়। তিনি রাজা উপধিটি পেয়েছিলেন সেসময়ের নামেমাত্র মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের (১৮০৬-১৮৩৭) কাছ থেকে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রি.)

বিদ্যাসাগর উপাধিতে সমধিক পরিচিত হলেও এই ক্ষণজন্মা পুরুষের প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বাঙালি নবজাগরণের একজন পুরাধা ব্যক্তিত্ব। বিদ্যাসাগর ছিলেন একাধারে দার্শনিক, শিক্ষানুরাগী, শিক্ষক, লেখক, অনুবাদক, মুদ্রাকর, প্রকাশক, সমাজ সংস্কারক এবং ব্যাকরণবিদ। তিনি সহজবোধ্য আধুনিক বাংলা গদ্য রচনার পথপ্রদর্শক ছিলেন। কোলকাতার সংস্কৃত কলেজ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত করে।

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সেক্রেটারি পদে যোগদান করেন। ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বেশকিছু পরিবর্তন আনার সুপারিশ করেন। ১৮৪৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান। একই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব লাভ করেন ১৮৫১ সালে। ১৮৫৫ সালে তিনি বিশেষ স্কুল পরিদর্শকের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজ সংস্কারে ভূমিকা: দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে এসময় ভারতীয় নারীরা দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। এই অবস্থা ব্যাথিত করেছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। বিশেষ করে হিন্দু মেয়েদের বাল্যবিয়ে প্রচলিত থাকা এবং বিধবা বিয়ে নিষিদ্ধ থাকাকে তিনি অন্যায় ও অমানবিক মনে করেছিলেন। সামাজিক প্রথামতে কোনো মেয়ের বারো বছরের মধ্যে বিয়ে না হলে তা সামাজিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। এমন পরিবারকে নানাভাবে নিগৃহীত হতে হতো। কখনো কখনো পুরো পরিবারকে গ্রাম ছাড়া করা হতো। আবার ব্রাহ্মণ কন্যাকে কুলিন ব্রাহ্মণ ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না বলে সমাজ বিধান ছিল। ফলে এক ধরনের কুলিন ব্রাহ্মণের বিয়ে করা পেশা হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক চাপে পড়ে সাত বছরের কন্যার সাথে সত্তর বছরের কুলিন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের বিয়ে হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। স্বাভাবিক নিয়মেই এই বৃদ্ধদের বা অন্য বয়সী বরদের মৃত্যু হলে বালিকা বধূ বিধবা হয়ে যেত। কিন্তু এদের আর পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি ছিল না। উপরন্তু এই বাল্য বিধবাদের সারাজীবন নানা আচার অনুষ্ঠান পালন করে চলতে হতো। বাল্যবিয়ের কুফল এবং বিধবাদের করুণ জীবন ঈশ্বরচন্দ্রকে ব্যাথিত করে।

ঈশ্বরচন্দ্রের চেষ্টায় ভারত সরকার এগিয়ে আসে। অবশেষে ১৮৫৬ সালে বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয়। সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যাসাগর নিজের পুত্রকেও একজন বিধবার সাথে বিয়ে দেন। বিধবা বিয়ে কার্যকর করা, দ্বিতীয় বিয়ে ও বাল্যবিয়ে রোহিতকরণ এং বিধবা বিয়েকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ১৮৭২ সালে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট পাশ করা হয়। এই আইন পাশেও বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট অনুপ্রেরণা ছিল।

বিদ্যাসাগর বিশেষ স্কুল পরিদর্শক থাকার সুবিধায় শিক্ষা বিস্তার ও নারী শিক্ষার প্রণোদনা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয় গড়ায় উৎসাহ দিতেন। তিনি অনেক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি নিজ অর্থ ব্যয়ে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা বিস্তারে এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৮৯১ সিলের ২৯ জুলাই এই মহৎপ্রাণ সমাজ সংস্কারক ও পণ্ডিত ব্যক্তির জীবন অবসান ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

কুসংস্কারে জর্জরিত পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজকে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকে বাংলায় এই এই সংস্কারের দায়িত্ব নিয়ে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তারা হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেন। নতুন নতুন স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। সংস্কারবাদী সংগঠন গড়ে তুলেন। সতীদাহের মতো কুপ্রথা বন্ধে আইন পাশে ভূমিকা রাখেন। এই সংস্কারের পথ ধরেই বাল্যবিয়ে বন্ধ ও বিধবা বিয়ে প্রবর্তনে আইন পাশ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সতীদাহের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে থাকেন কে?
ক) রামমোহন রায় খ) কেদার রায় গ) মানিক রায় ঘ) চাঁদ রায়

২। বিধবা পুনর্বিবাহ আইন পাশ হয় কার চেষ্টায়?
ক) ভাদারাম পোদ্দার খ) সতীনাথ ভাদুড়ী গ) অখিলেশ সাহানী ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৩।
i. ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ পান
ii. রামমোহন রায় মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কলকাতাতে চলে আসেন।
iii. রামহোমন রায় মূর্তিপূজা করতেন।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৪ হাজী শরিয়ত উল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফরায়েজি আন্দোলনের নেতা হাজী শরিয়ত উল্লাহর জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি কী ছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ভূমিকার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	হাজী শরিয়ত উল্লাহ, ফরায়েজি আন্দোলন, দুদু মিয়া

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। মুসলমান সমাজে নানাবিধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপ লক্ষ করে হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষার আদর্শে স্ব-ধর্মাবলম্বীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তা 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিত।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০ খ্রি.)

বর্তমান শরিয়তপুর জেলার শ্যামাইল গ্রামে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে শরিয়তউল্লাহর জন্ম হয়। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যান কলকাতায়। হুগলী জেলার ফুরফুরায় দুই বছর আরবি ও ফারসি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ সালে তিনি তাঁর ওস্তাদ মাওলানা বাশারত আলীর সাথে মক্কায় যান এবং হজ্ব সম্পন্ন করেন। সেখানে তিনি ওয়াহাবি ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে তিনি ফরায়েজি আন্দোলন নামে ইসলামি সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন।

হিন্দু সমাজে যখন সংস্কার চলছিল ঠিক একই সময়ে বাংলার মুসলমান–বিশেষ করে পূর্ববাংলার মুসলমানদের কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করার জন্য বেরিয়ে আসেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ। শরিয়ত উল্লাহ লক্ষ করেছিলেন ইংরেজ শাসিত এদেশে মুসলমানরা নানা ক্ষেত্রে পিছিয়ে পরেছে। স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির আচার আচরণ নিজেদের জীবনে প্রবেশ করায় ইসলামের মূল শিক্ষার প্রতি তারা উদাসীন হয়ে পড়েছে। এ কারণে ফরায়েজি আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী করে তাদের শক্তি জাগিয়ে তোলা। একই উদ্দেশ্যে এই আন্দোলনের মধ্যদিয়ে মুসলমানদের ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও অনুশাসন পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং সব ধরনের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করারও

প্রচেষ্টা নেয়া হয়। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি জমিদার, নীলকর, মহাজন ও স্থানীয় প্রশাসনের শোষণ ও অত্যাচার থেকে কৃষকদের মুক্ত করাও ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

হাজী শরিয়তউল্লাহ তাঁর আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য হিসাবে ইসলামের ৫টি মৌলিক আদর্শের ভেতর মুসলমানদের নিষ্ঠাবান থাকার নির্দেশ দেন। এই মূল আদর্শসমূহের ব্যতিক্রম কাজকে তিনি শিরক ও বিদাত বলে ঘোষণা দেন। ফরায়েজীরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে জন্মদিন, বিয়ে, মৃত্যু প্রভৃতির সাথে যুক্ত আচার অনুষ্ঠান, পীরপূজা, পীরের প্রতি অতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাজিয়া নির্মাণ ও মহররম মিছিল।

হাজী শরিয়ত উল্লাহর জীবদ্দশায় ফরায়েজি আন্দোলন ফরিদপুর ছাড়াও ঢাকা, বরিশাল ও কুমিল্লা জেলায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শরিয়ত উল্লাহ বুঝেছিলেন মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের নীতি ছিল শত্রুতামূলক। একারণে মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল। তিনি মুসলমানদের বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, রাজনৈতিকভাবে তারা আর স্বাধীন নয়। তাদের দেশ এখন 'দারুল হারব' অর্থাৎ যুদ্ধরত বা অমুসলিমের দেশ। এমন দেশকে হয় শক্তি প্রয়োগ করে মুসলমান শাসিত দেশ অর্থাৎ 'দারুল ইসলাম' বানাতে হবে অথবা দারুল হারব ছেড়ে অন্যকোনো মুসলমানের দেশে চলে যেতে হবে। এর কোনোটি করা সম্ভব না হলে মুসলমানদের কয়েকটি নিয়ম মেনে এ দেশে থাকতে হবে। এ কারণেই শরিয়ত উল্লাহ ঘোষণা দেন দারুল হারবে মুসলমানদের ঈদ ও জুমুয়ার নামাজ পড়ার প্রয়োজন নেই। শুধু ফরজ ইবাদতটুকু করবে। এ কারণেই আন্দোলনটির নাম হয় ফরায়েজি আন্দোলন। অর্থাৎ শরিয়ত উল্লাহ এমন প্রতীকী নিয়ম পালনের মধ্যদিয়ে বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এভাবে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে পরিশুদ্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।

ইংরেজ সিভিলিয়ান জেমস ওয়াইজ হাজী শরিয়ত উল্লাহকে মুসলমান কৃষকদের উজ্জীবিত করার কাজে একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতা বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ করা গিয়েছে যেসব অঞ্চলে ফরায়েজি আন্দোলন জনপ্রিয় হয়েছে সেখানে হিন্দু জমিদার ও নীলকররা শক্তিশালী ছিল এবং এদের দ্বারা কৃষকরা অত্যাচারিত হতো। কঠোরভাবে ধর্ম সংস্কার করায় এক শ্রেণির মুসলমান নেতা শরিয়ত উল্লাহর আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী। এই মতবিরোধের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন হিন্দু জমিদাররা। তারা কৌশলে রক্ষণশীল মুসলমান কৃষকসহ নীলকরদের ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে একত্রিত করেন। এভাবে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফরায়েজিরা একটি সংঘাতময় অবস্থার মুখোমুখি হয়। এমন একটি পরিস্থিতি যখন বিরাজমান তখনই হাজী শরিয়ত উল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। এবার ফরায়েজিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁর পুত্র মুহসীন উদ্দিন দুদু মিয়া।

দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২খ্রি.)

দুদু মিয়া ছিলেন শরিয়ত উল্লাহর একমাত্র পুত্র। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে পৈত্রিক গ্রামেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর দুদু মিয়া ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

শিক্ষা গ্রহণের জন্য পিতার জীবদ্দশাতেই দুদু মিয়া মক্কা যান। সেখানে পাঁচ বছর কাটান তিনি। পিতার অসুস্থতার সংবাদে উনিশ বছর বয়সে দেশে ফিরে আসেন দুদু মিয়া। এ সময় হিন্দু জমিদার, নীলকর, কোনো কোনো রক্ষণশীল মুসলিম নেতা ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তারা প্রায়ই ফরায়েজিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতো। দুদু মিয়া ছিলেন বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ও কূটনৈতিক জ্ঞানে দক্ষ।

দুদু মিয়া ঘোষণা করেন জমির মালিক হবে কৃষকেরা। তাঁর এই ঘোষণা নির্যাতিত কৃষকদের মনে আশার সঞ্চার করে। ফলে ফরায়েজি আন্দোলনও পায় নতুন গতি। দুদু মিয়া অবশ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করেন নি। ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রেখেছিলেন। এক ধরনের সহযোগিতার মধ্যদিয়ে দুদু মিয়া প্রজার অধিকার রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর দুদু মিয়াকে সরকার বন্দি করে। তাঁকে কলকাতার আলীপুর কারাগারে আটক রাখা হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পান তিনি। দুদু মিয়া ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ প্রশাসনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ফরায়েজি আন্দোলন বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি। দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর ক্রমশ এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়। তবে বাঙালির জাগরণে এই আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফরায়েজি আন্দোলনের ভেতর ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি থাকায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমানকে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা সহজ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ হাজী মুহম্মদ মুহসীনের জনকল্যান ও হাজী শরিয়তউল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলনের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

হাজী মুহম্মদ মুহসীন ছিলেন জনকল্যাণে নিবেদিত। জীবিতকালে তিনি যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অর্থ প্রদান করেছেন পরবর্তীকালে তার প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট ফান্ড শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। হাজী শরিয়ত উল্লাহ পরিচালিত ফরায়েজি আন্দোলন মূলত একটা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন। বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে সব অনৈসলামিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল হাজী শরিয়ত উল্লাহ্ সেগুলো বর্জন করার জন্য তাদেরকে আহবান জানান। বহু লোক তাঁর আহবানে সাড়া দিলেও প্রাচীনপন্থীরা তাঁর বিরোধিতা করে। কৃষকদের উপর জমিদারদের অত্যাচারের কারণে এ আন্দোলন জমিদার বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মুহসীন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছিরেন কে?
- ক) মুহসীনের বোন
- খ) মুহসীন নিজে
- গ) সরকার
- ঘ) স্থানীয় জনগন

২। ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক
- ক) দুদু মিয়া
- খ) হাজী শরীয়ত উল্লাহ
- গ) মজনু শাহ
- ঘ) আহমদ শাহ

৩। হাজী শরীয়ত উল্লাহ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
- ক) মাদারীপুরে
- খ) শরিয়তপুরে
- গ) ফরিদপুরে
- ঘ) ত্রিপুরায়

৪। শরীয়ত উল্লাহ হজ্জ করতে মক্কা শরীফ গমন করেন
- ক) ১৭৯৭ খ্রি.
- খ) ১৭৯৮ খ্রি.
- গ) ১৭৯৯ খ্রি.
- ঘ) ১৮০০ খ্রি.

৫। হাজী শরীয়ত উল্লাহ মক্কায় অবস্থান করেন
- ক) ২০ বছর
- খ) ২১ বছর
- গ) ২২ বছর
- ঘ) ২৩ বছর

সৃজনশীল প্রশ্ন

করিমুল্লাহ ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কোলকাতায় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি তার শিক্ষকের সাথে পবিত্র হজ্জব্রত পালনের জন্যে মক্কা শরীফ গমন করেন এবং দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করে যুগশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের নিকট ইসলাম ধর্মের উপর লেখা পড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি ইসলামে অননুমোদিত আচার ও প্রথা ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয় অর্থাৎ 'ফরজ' তা মেনে চলা ও পালন করার জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান।

ক. হাজী শরীয়ত উল্লাহ পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী? ১

খ. শিরক বা মহাপাপের কাজ কাকে বলে? ২

গ. উদ্দীপকের করিমুল্লাহর আন্দোলনের সাথে পাঠ্য পুস্তকের যে আন্দোলনের সাদৃশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত আন্দোলনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-৮.৫ তিতুমীরের আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলতে পারবেন।
- তিতুমীরের আন্দোলনের চরিত্র সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্দোলনের ঘটনাবলির একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	তিতুমীর, জমিদার, প্রজা, নারিকেলবাড়িয়া

পূর্ব বাংলায় (আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ) যখন ফরায়েজি আন্দোলন গড়ে উঠে, প্রায় একই সময়ে পশ্চিম বাংলায়ও আরেকটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'তরীকায়ে মোহাম্মদীয়া' আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। এ আন্দোলনেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত কুসংস্কার এবং অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করে ইসলামের আদর্শে বাংলার মুসলিম সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করা। কিন্তু কৃষক সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার কারণে জমিদারদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটি সরকার বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়।

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি গ্রামের এক মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেন এবং সে গ্রামের ব্যায়ামাগারে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে একজন কুস্তিগীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কিছুদিন তিনি নদীয়ার এক জমিদারের লাঠিয়ালের চাকরি করেন। পরে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলেম ও বিদ্রোহী নেতা সৈয়দ আহমদ শহীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে দেশে ফিরে তিতুমীর ধর্ম সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ঐ যুগে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তিতুমীর মুসলমানদেরকে পীরের কাছে নত হওয়া, মাজার তৈরি করা, মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা, মহররম অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেন। হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বসবাস করার ফলে মুসলমানদের সংস্কৃতি ও সমাজ জীবনে যে ভিন্ন প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে, সে সমস্ত দূর করে ইসলাম ধর্মের আদি বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি প্রচেষ্টা চালান। অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকশ মুসলমান তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তারা দাঁড়ি রাখত এবং বিশেষ পোশাক পরত। তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এমন গোঁড়ামী সৃষ্টি হয় যে, অন্য মুসলমানদের সঙ্গেও তাদের বিরোধ বাঁধে। তবে এর চেয়ে বেশি তীব্র হয়েছিল হিন্দু জমিদারদের প্রতিক্রিয়া।

চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক ও তাঁতী তিতুমীরের আন্দোলনে সাড়া দেয়। মুসলমান প্রজাদের সংঘবদ্ধ হতে দেখে স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। তারা তিতুমীরের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করার উপায় খুঁজতে থাকে এবং প্রজাদের উপর অযথা উৎপীড়ন শুরু করে। তারাগুনিয়ার জমিদার রাম নারায়ণ, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং আরো অনেকে তাদের জমিদারিতে মুসলমান রায়তদের প্রত্যেকের দাঁড়ি রাখার উপর আড়াই টাকা হারে কর ধার্য করেন। সরফরাজপুরের প্রজাগণ এই অন্যায় কর প্রদানে অস্বীকার করলে তাদের উপর নেমে আসে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন। তিতুমীর এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার চেয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় অবশেষে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ বেছে নেন।

১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে তিতুমীর ও তাঁর সমর্থকরা তাদের প্রধান ঘাঁটি নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে একটি মজবুত বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করা হয়। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে উঠে একটি সুদক্ষ লাঠিয়াল ও প্রতিরোধ বাহিনী। এবার তিতুমীরের অনুসারীরা জমিদারদের অন্যায়ের প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। লাউঘাটায় এক সংঘর্ষে জমিদার দেবনাথ রায় নিহত হন। পার্শ্ববর্তী অনেকগুলো গ্রামের উপর তিতুমীরের বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারদের প্ররোচনায় মুলাহাটির নীলকুঠির পক্ষ থেকে তিতুমীরের সমর্থকদের বিরুদ্ধে কিছু ব্যবস্থা নেয়ায় তাঁর বাহিনী

নীলকুঠি আক্রমণ করে তা লুণ্ঠন করে কুঠির তত্ত্বাবধায়ককে বন্দি করে নিয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত জমিদার ও নীলকররা ইংরেজ সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠায়।

বৃটিশ সরকার শীঘ্রই তিতুমীরের বিরুদ্ধে বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা শোচনীয় পরাজয়বরণ করে এবং তাদের ১৫ জন নিহত ও বহু আহত হয়। আলেকজান্ডারকে সহায়তা দানের অভিযোগে তিতুমীরের সমর্থকরা কয়েকটি নীলকুঠি লুণ্ঠন করে। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ৩০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু এবারও ইংরেজ সৈন্যরা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। পরিশেষে ১৮৩১ সালের নভেম্বর মাসে মেজর স্কটের অধীনে এক বিরাট ইংরেজ বাহিনী নারিকেলবাড়িয়া আক্রমণ করে। তিতুমীরের সমর্থকরা সাহসের সাথে তুমুল লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। কিন্তু ইংরেজদের কামানের গোলার আঘাতে তিতুমীরের বাঁশের কেলা সহজেই ধ্বংস হয়। যুদ্ধে তিতুমীর ও তাঁর বহু অনুগামী শহীদ হন। সেনাপতি গোলাম মাসুমসহ প্রায় আড়াইশ জন বন্দি হন। বৃটিশ সরকার গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেয় এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করে। এভাবে তিতুমীরের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন যা পরিণতিতে জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার এবং ইংরেজ শাসন বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ জমিদার ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রামের উপর একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যত ধর্ম সংস্কার করা। যেসব অনৈসলামিক রীতিনীতি ও কুসংস্কার মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করে সেসব বর্জন করার জন্যই তিনি আন্দোলন শুরু করে। কিন্তু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে জমিদার ও নীলকরদের স্বার্থের দ্বন্দ্বের ফলে এ আন্দোলন কৃষক আন্দোলনের রূপ নেয় এবং ইংরেজদের সাথেও বিরোধ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। তিতুমীর জন্মগ্রহণ করেন
ক) নদিয়ায় খ) চব্বিশ পরগনায় গ) বারাসাতে ঘ) দিল্লিতে

২। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন
ক) উলুবেড়িয়ায় খ) চাঁদপুরে গ) নারকেল বাড়িয়ায় ঘ) সরফরাজপুরে

৩। তিতুমীর বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন
ক) ১৮২৮ খ্রি. খ) ১৮২৯ খ্রি. গ) ১৮৩০ খ্রি. ঘ) ১৮৩১ খ্রি.

৪। তিতুমীরের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল–
ক) ধর্ম সংস্কার খ) রাজনৈতিক খ্যাতি লাভ গ) জনকল্যাণ ঘ) ইংরেজ শাসন উৎখাত

৫। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হয়?
ক) ১৮৩০ খ্রি. খ) ১৮৩১ খ্রি. গ) ১৮৩২ খ্রি. ঘ) ১৮৩৩ খ্রি.

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১। খ ২। গ ৩। খ ৪। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। গ ৫। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ ঃ ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক ৫। খ

বৃটিশ শাসনামলে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন (১৮৫৮ - ১৯১১ খ্রিঃ)

ইউনিট ৯

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক শাসনামলে প্রায় সমগ্র উপমহাদেশ একই শাসন কর্তৃপক্ষের অধীনে আসায় ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য গড়ে ওঠে। এতে জাতীয় ভাবধারা গড়ে উঠার পথ সুগম হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয়দের মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে উনিশ শতক শেষার্ধে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারিত হয়। তারা শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের প্রতিনিধিত্ব ও অধিকার সম্পর্কে সোচ্চার হতে থাকে। হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভা। আরও পরে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় সর্বভারতীয় সংগঠন 'সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি উদাসীন থাকার ফলে এবং বিদেশি শাসনের সংগে সহযোগিতা না করার ফলে ভারতীয় মুসলমানরা অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে। তাদের সেই দুর্দিনে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং বাংলার নেতা নবাব আবদুল লতিফ ও স্যার সৈয়দ আমির আলী। তাঁরা মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার নীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনা ও জাগরণের। হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের প্রভাব, জাতীয় কংগ্রেস থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নীতি, বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থায় তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব বজায় রাখা এবং চাকুরি ও শিক্ষার অধিকারসহ সর্বত্র আলাদাভাবে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টার ফলে তাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র চেতনা ও বোধ অঙ্কুরিত হয়। লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক সংস্কার এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের আন্দোলন সে বোধকে আরো শাণিত করে। এই পটভূমিতেই ঢাকায় জন্ম নেয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সামান্য কিছুদিন আগে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি করা হয়। জাতীয় কংগ্রেস মুসলমানদের সে দাবির বিরোধিতা করলেও ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা মেনে নেয়। উল্লেখ্য যে, ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

এ ইউনিট পাঠ শেষে আপনি রাজনৈতিক বিবর্তন ধারায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা আলীগড় আন্দোলন পরবর্তী মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, সিমলা ডেপুটেশন, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে-মিন্টো সংস্কার সম্পর্কেও ভালভাবে অবহিত হবেন বা আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৯.১ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখন ও কেন প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় কাদের ভূমিকা ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কংগ্রেসের প্রাথমিক আদর্শ ও কর্মসূচি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	মধ্যবিত্ত শ্রেণি, হিউম, রাজনৈতিক সংগঠন

ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা একটা যুগান্তকারী ঘটনা। যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ সংগঠনের আত্মপ্রকাশ সে সময়টা ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের ঊষালগ্ন। বৃটিশ নীতি ও শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে ক্রমশ ক্ষোভ ও অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে। ফলে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ও পরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে। এ সবের উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'। ভারতীয় জনগণের নায্য অধিকার আদায়ের জন্য জনমত গঠন ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন'। কিন্তু এসব সমিতি শিক্ষিত অভিজাত ও জমিদারদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকায় মধ্যবিত্ত বা সাধারণ জনগণের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে নি। বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের অনুকরণে বোম্বে ও মাদ্রাজে অনুরূপ সংগঠন গড়ে উঠে। শাসন সংস্কারের মাধ্যমে দেশ শাসনে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও তাদের নায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠান জনমত গঠনের চেষ্টা করে। বাংলার নেতা সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' বা ভারত সভা নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব বজায় রাখা এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত কলকাতায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি চাকুরীসহ বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু করে।

ভারত উপমহাদেশে এরূপ পরিস্থিতিতে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লিটন ভাইসরয় হয়ে আসেন। তাঁর সময়কালের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপের দরুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়সসীমা একুশ থেকে উনিশে আনা হলে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে আগ্রা, দিল্লী, আলীগড়, লাহোর, কানপুর, বেনারস ও অমৃতসরসহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রতিবাদ সভা হয়। এ বিক্ষোভের পরপরই শুরু হয় ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের ভার্নাকুলার প্রেস এ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এ আইনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার দেশীয় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করেছিলেন। সরকারের বর্ণ বৈষম্যমূলক অস্ত্র আইন, সাম্রাজ্যবাদী আফগান যুদ্ধ, ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দের জাঁকজমকপূর্ণ দিল্লী দরবার ইত্যাদিও অসন্তোষের মূলে ছিল।

এসবের রেশ মুছে যেতে না যেতেই দেখা দেয় লর্ড রিপনের সময়কার ইলবার্ট বিল নিয়ে বিতর্ক। এ বিতর্কের ফলে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে এক নিদারুন বর্ণ বৈষম্যের সূত্রপাত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের এক আইন বলে ভারতে ইংরেজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিচারকার্যে শুধু ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ ক্ষমতা পাবেন বলে স্থির হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের আইন সদস্য সি.পি. ইলবার্ট প্রস্তাব করেন যে, ভারতের প্রেসিডেন্সি শহরগুলোর ন্যায় অন্যান্য স্থানেও ভারতীয় সেসন জজরা ইউরোপীয় অপরাধীদের বিচার করতে পারবেন। এটা ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা ভারতবর্ষে চরম বিক্ষোভ শুরু করে। সরকার শেষ পর্যন্ত কিছুটা আপোষ করেন এবং স্থির হয় যে ইউরোপীয় আসামীদের বিচারের ক্ষেত্রে জুরী মণ্ডলীর উপস্থিতি লাগবে এবং তাদের অর্ধেক হতে হবে সাদা চামড়ার লোক।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি

ইউরোপীয়ানদের বিক্ষোভ ভারতীয়দের মর্যাদা ও জাতীয় চেতনায় আঘাত করে। শিক্ষিত হিন্দুরা সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ মোহন বসুর নেতৃত্বে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এলবার্ট হলে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিরা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ দিকে ভারতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ এবং অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আন্দোলনের চাপে বৃটিশ সরকার কিছুটা ভীত হয়। ভারতীয়দের দাবি ও আন্দোলনকে নিয়মতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করার এবং তাদের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য সরকার মনোযোগী হয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এলান অক্টেভিয়ান হিউম ভারতের ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সহযোগিতায় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বে শহরে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) প্রতিষ্ঠা করেন। দুজন মুসলমানসহ সত্তর জন প্রতিনিধি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দেয় এবং এর সভাপতি নির্বাচিত হন বাঙালি ব্যারিস্টার উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী। বক্তৃতায় তিনি কংগ্রেসের চারটি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেন:

১. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁরা দেশ সেবায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা;
২. জাতি ধর্ম আঞ্চলিকতার সংকীর্ণতা দূর করে জাতীয় ঐক্যের পথ সুগম করা;
৩. শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যেমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথে বের করা এবং

৪. রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য পরবর্তী বছরের কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে বৃটিশ শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক সংগঠন। প্রথম দিকে অল্প কয়েকজন মুসলমান এতে যোগদান করেন। কিন্তু এর কর্মসূচি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হওয়ায় পরবর্তী সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং কিছু মুসলিম নেতারা মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের সাথে জড়িত হতে নিষেধ করেন। প্রথম দিকে কংগ্রেস নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন মধ্যপন্থী। ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান হতো। কিন্তু সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ও সহযোগিতার এ নীতি অচিরেই পরিবর্তিত হতে থাকে। কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে ভারতের জন্য স্বরাজ বা স্বাধীনতার আন্দোলন করে এবং সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী বিরোধী দলে পরিণত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ এলান অক্টোবিয়ান হিউমের উপর তথ্যাদি সংগ্রহ করে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তার অবদানের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।

সারাংশ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস হচ্ছে ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন। এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম দিকে বৃটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা এবং আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দাবি আদায় এর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে এবং বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ব্রিটিশ ভারতের সর্বপ্রথম বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক দল কোনটি?

ক) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস খ) নিখিল ভারত মুসলিমলীগ

গ) ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ঘ) ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি

২। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কী ছিল?

i. দেশ সেবকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন

ii. ধর্মীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা

iii. আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারতীয় কংগ্রেসের ব্যাপারে বিরোধী ব্যক্তিত্ব কে?

ক) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী খ) উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী

গ) স্যার সৈয়দ আহমদ খান ঘ) এলান অক্টাভিয়ান হিউম

সৃজনশীল প্রশ্ন

বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে একটি জাতি ক্রমশই অধিকার সচেতন হয়ে উঠে। এহেন অধিকার সচেতনতা যাতে বিপথগামী না হয় এজন্য শাসকগোষ্ঠী উক্ত জাতির শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ কিছু সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করে। এ সময় শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় সর্বপ্রথম একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিছু কাল এ দলটি স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হলেও একটি সম্প্রদায় কোনো অধিকার না পেলে তারাও একটি নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করে। ইতিহাসে এ নতুন দলটির প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ব্যাপক।

ক. বর্ণিত প্রথম রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠার পটভূমি আপনার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ১

খ. নতুন রাজনৈতিক দলটি প্রথমদিকে কেন সরকারের অনুগত ছিল এবং কেন পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী হয়ে উঠে তা বিশ্লেষণ করুন। ২

পাঠ-৯.২ স্যার সৈয়দ আহমদ খান ও আলীগড় আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্যার সৈয়দ আহমদ খানের কর্মজীবন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ভারতের মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- আলীগড় আন্দোলনের মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল', ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, হান্টার শিক্ষা কমিশন, ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে নিরুৎসাহ ও হতাশার সৃষ্টি করে। ইংরেজ শাসনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে না পারায় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে এবং দুঃখ দুর্দশার আবর্তে নিপতিত হয়। মুসলমানদের সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে তাদের ত্রাণকর্তারূপে উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ঘটে। অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুসলমানদের পুনরুদ্ধার ও তাদের পুনর্জাগরণের জন্য তিনি উত্তর ভারতে আলীগড় কেন্দ্রিক যে আন্দোলন সৃষ্টি করেন, ইতিহাসে তা 'আলীগড় আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ।

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সৈয়দ আহমদ খানের জন্ম হয়। কোম্পানির অধীনে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি সেরেস্তাদারের চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরে সাব জজ পদে উন্নীত হন। তিনি ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, হান্টার শিক্ষা কমিশন ও ভারতীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বৃটিশ সরকার ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

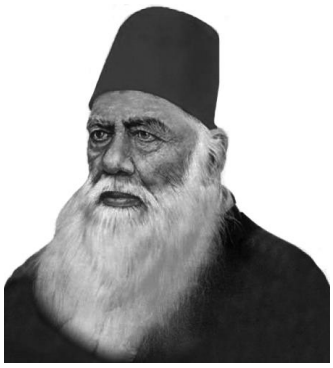

স্যার সৈয়দ আহমদ খান

ইংরেজ শাসনাধীনে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের শোচনীয় অবস্থা সৈয়দ আহমদ খানকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের ধর্মীয় গোঁড়ামি বৃটিশ বিরোধী মনোভাব ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অনীহা তাদের দুর্দশার অন্যতম কারণ। তাই প্রথমে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি মুসলমানদেরকে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং ইংরেজ শাসকদের সাথে সহযোগিতা করার উপদেশ দেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর মুসলমানরা শাসক শ্রেণির বিরাগ ভাজন হয়ে পড়ে। কারণ ব্রিটিশ সরকারের ধারণা ছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের মূলে মুসলমানরা দায়ী। ইংরেজ সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য সৈয়দ আহমদ খান 'সিপাহী বিদ্রোহের কারণ' এবং 'ভারতের রাজ ভক্ত মুসলমান' নামে দু'খানি বই লেখেন। তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের জন্য মুসলমানরা দায়ী ছিল না। বরং বিদ্রোহকালে অধিকাংশ মুসলমান ছিল ইংরেজদের পক্ষে। শাসক-শাসিতের দূরত্ব এবং তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি এ বিপ্লবের মূলে ছিল বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'ভারতীয় মুসলমান' (The Indian Mussalaman) গ্রন্থে সে বিদ্রোহের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করলে যুক্তি দিয়ে সৈয়দ আহমদ তা খণ্ডন করেন। ফলে মুলমানদের প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ায় স্যার সৈয়দ আহমদের ভূমিকা

স্যার সৈয়দ আহমদ শুধু বৃটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যেই সম্পর্কের উন্নতি করে ক্ষান্ত হন নি। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রসারে উদ্যোগী হন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তর ভারতের গাজীপুরে একটি ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজিতে রচিত মূল্যবান বইগুলো উর্দুভাষায় অনুবাদ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে তিনি 'বিজ্ঞান সমিতি' নামে একটা সংস্থা গঠন করেন। পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শ ও শিক্ষাব্যবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য সৈয়দ আহমদ খান নিজে বিলাত যান। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে এসে 'তাহজীবুল আখলাক' নামে একটি পত্রিকা

প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের নৈতিকতা ও আচার ব্যবস্থার উন্নতি এবং তাদের মধ্যকার কুপমন্ডুকতা ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেন।

একই সময়ে তিনি বেনারসে 'ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষা উন্নয়ন সমিতি', নামে একটি সংস্থাও গঠন করেন। এ সমিতির সুপারিশে মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য সৈয়দ আহমদ খান ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। দু'বছর পরে এটি কলেজে উন্নীত হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে উক্ত 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠার পর আলীগড় মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এখানে মুসলমান ছাত্ররা শুধু আধুনিক কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষাই গ্রহণ করে নি, বরং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় একাত্মতার দরুন আলীগড় তাদের ঐক্যের সেতুবন্ধন রচনায়ও সাহায্য করে। আলীগড় কলেজকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা, চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয় এবং পরবর্তীকালে এই কলেজ তাদের রাজনৈতিক জীবনকেও প্রভাবিত করে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ খান 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' নামে অন্য একটি সংস্থা গঠন করেন। প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমান নেতারা এক জায়গায় সমবেত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করতেন। আলীগড়ের বার্তা তাঁরা দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেন। এভাবে সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টা ও আলীগড় আন্দোলনের ফলে মুসলিম সমাজে এক নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে।

সৈয়দ আহমদ খান কুরআনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেন। তিনি সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে ছিলেন। মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তাঁর যুক্তিবাদী চিন্তা ও আধুনিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি সনাতনপন্থীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন।

প্রথম দিকে সৈয়দ আহমদ খান দেশের অগ্রগতির স্বার্থে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতার কথা বলেন। কিন্তু ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে হিন্দি-উর্দু বিতর্ক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। এ সময়ে উত্তর প্রদেশে নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা কোর্ট কাচারীতে উর্দুর পরিবর্তে নাগরী বর্ণমালায় লিখিত হিন্দি ভাষা প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তিনি মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাতদের নিয়ে তাঁর চেষ্টায় ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন'। ভারতীয় জনগণের মন থেকে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব দূর করা, দেশে শান্তি রক্ষা ও সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এ সময় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের কারণে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'গো-হত্যা নিবারণ সমিতি' প্রতিষ্ঠা এবং সহিংসতার কারণে মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে সৈয়দ আহমদ খানের আহবানে আলীগড়ে 'মোহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ মৃত্যুবণন করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের এক সংকটকালে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও নবচেতনা জাগিয়ে তুলে তিনি তাদেরকে আলোর পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ স্যার সৈয়দ আহমদ খান কীভাবে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখেন তার উপর নিজেদের আলোচনা করবেন।

সারাংশ

ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের বহুবিধ অবদানের মাধ্যমে তিনি আলোর পথের সন্ধান দেন। মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে তিনি নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর সৃষ্ট আলীগড় আন্দোলন মুসলিম সমাজে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। ভারতীয় মুসলমানদের নবজাগরণে সৈয়দ আহমদ খানের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। স্যার সৈয়দ আহমদ খান 'নাইট' উপাধি লাভ করেন কত খ্রিস্টাব্দে?
ক) ১৮১৭ খ) ১৮৩৭ গ) ১৮৮৮ ঘ) ১৮৯৮

২। স্যার সৈয়দ আহমদ খান রচিত গ্রন্থের নাম কী?
i. ভারতীয় মুসলমান
ii. সিপাসী বিদ্রোহের কারণ
iii. ভারতের রাজভক্ত মুসলমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন'-এর সদস্য কারা?
ক) সকল ভারতীয় মুসলমান খ) সকল ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান
গ) অভিজাত মুসলমান ঘ) অভিজাত হিন্দু-মুসলমান

পাঠ-৯.৩ মুসলিম সমাজ সংস্কার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আবদুল লতিফের কর্মময় জীবন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুসলমানদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য তাঁর অবদান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ব্যবস্থাপক পরিষদ, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি, ইংরেজি শিক্ষা, ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন, দ্বিজাতি তত্ত্ব মুসলীম লীগ

নওয়াব আবদুল লতিফ

বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান সম্প্রদায় এক চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়। বিদেশি শাসন ও ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ না করার ফলে তাঁরা একদিকে যেমন চাকুরিসহ সব সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে, অন্যদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক দিক সহ জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে। এমন অধঃপতিত অবস্থা থেকে যেসব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ আসে তাঁদের মধ্যে নওয়াব আবদুল লতিফ অন্যতম।

নওয়াব আবদুল লতিফ

আবদুল লতিফের জন্ম ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায়। কলকাতা মাদ্রাসায় তিনি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে আবদুল লতিফ প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন এবং ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইন অনুযায়ী বাংলায় ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠিত হলে তিনি এর সদস্য মনোনীত হন। আবদুল লতিফ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেন। কর্মজীবনে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার প্রথমে তাঁকে 'খান বাহাদুর' এবং পরে 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করে।

আবদুল লতিফ যখন সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন তিনি সেখানকার কৃষকদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা সরকারকে অবহিত করেন এবং সুবিচারের জন্য অনুরোধ জানান। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে নীল কমিশন গঠিত

হলে এর সুপারিশ অনুসারে নীলচাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা হয়। ফলে বাংলার কৃষকরা নীলকরদের হাত থেকে রেহাই পায়।

নওয়াব আবদুল লতিফ নিজে ইংরেজ অনুগত ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ প্রয়োজন বলে মনে করতেন। ইংরেজ শাসকদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা লাভের স্বার্থে তিনি মুসলমানদের ইংরেজ বিদ্বেষী মনোভাব পরিহার করে তাদের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণের জন্য মুসলমানদের অনুরোধ জানান। তাঁর প্রচেষ্ঠায় মুসলমানেরা ইংরেজদের প্রতি জেহাদী মনোভাব ত্যাগ করে। উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে।

নওয়াব আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগতির জন্য এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। তিনি স্বীয় বাস্তববাদী বিবেচনা দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুসলমানদের উন্নতি অসম্ভব। তাই তিনি আধুনিক শিক্ষার আলোকে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা ও কুসংস্কার দূর করে তাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক ফার্সি ভাষায় একটা রচনা প্রতিযোগিতা আহবান করেন। এ উদ্যোগে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দারুন সাড়া জাগায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে লেখা প্রেরিত হয়। আবদুল লতিফের সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-ফার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার আয়োজন করা হয়। উচ্চ শিক্ষায় মুসলমানদের অসুবিধার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর চেষ্টার ফলেই কলকাতার হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং মুসলমান ছাত্রদের অধ্যয়নের সুযোগ সেখানে তৈরি হয়।

আবদুল লতিফের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্যযোগ্য কীর্তি ছিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এবং তাদেরকে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাংলার মুসলমানদের বিদ্বেষভাব দূর করে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করার ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সমস্যা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়াদির উপর মূল্যবান আলোচনা হতো। মুসলমানদের রীতিনীতির সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলন ঘটাবার জন্য এর মাধ্যমে চেষ্টা চলে। একবার বিখ্যাত মনীষী ও আলীগড় আন্দোলনের নেতা স্যার সৈয়দ আহমদ আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় সোসাইটির এক সভায় ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর মূল্যবান ভাষণ দেন। অন্য সময়ে মাওলানা কেরামত আলীও এ সমিতিতে বক্তৃতা করেন।

মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নওয়াব আবদুল লতিফ আরও কিছু অবদান রাখেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি সাহায্যে মফস্বলে কয়েকটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ঐ সব মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের চেষ্টার ফলে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধান্ত হয় যে, সরকার হুগলী কলেজের যাবতীয় ব্যয় বহন করবে এবং দানবীর হাজী মুহসীনের প্রদত্ত তহবিলের অর্থ শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয়িত হবে। পূর্বে মহসিনফান্ডের বৃত্তি হিন্দু মুসলিম সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল।

আবদুল লতিফ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বাংলার মুসলমানদের দুরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মুসলমানদের সার্বিক স্বার্থ রক্ষা কল্পে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। সে জন্য ইংরেজ বিরোধী কর্মকাণ্ড থেকে তিনি তাদেরকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ও সত্যিই প্রশংসনীয়।

সৈয়দ আমীর আলী

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজের নবজাগরণে যাঁর অবদান অত্যন্ত মূল্যবান তিনি হলেন সৈয়দ আমীর আলী। পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক ও বৈষয়িক অগ্রগতি লাভের পাশাপাশি তিনি মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে জাগিয়ে তোলার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত শিয়া পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ এবং বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। লন্ডনের লিঙ্কন্স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করার পর ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কর্মজীবনে তিনি বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৪ সালে তিনি লন্ডনে চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন।

সৈয়দ আমীর আলী

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নিয়োজিত হন এবং আমৃত্যু সে পদে বহাল থাকেন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

কর্মজীবনের শুরুতে আইন ব্যবসার পাশাপাশি সৈয়দ আমীর আলী সমাজ সেবার কাজেও মনোনিবেশ করেন। বাংলা তথা ভারতের মুসলমান নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে তিনিও নওয়াব আবদুল লতিফ এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের অনুসরণে ভারতের মুসলমানদের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ ও বৃটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে রাখার চেষ্টা করেন। সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হলে মুসলমানদের শিক্ষা বিস্তার ও সার্বিক উন্নতি ব্যাহত হবে, এ ধারণা তাঁদের উভয়েরই ছিল। আমীর আলীর নিকট তাঁদের এ ধারণা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সে কারণে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। পরবর্তীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কলকাতাস্থ প্রধান শাখার নাম করণ করা হয় 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার, ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং তাদের নায্য দাবিদাওয়া নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারের নিকট পেশ করা ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। বক্তৃতা অনুষ্ঠান, সভা ও সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষা ও ঐক্য গড়ার প্রয়াস এর মাধ্যমে গৃহীত হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সমিতির পক্ষ থেকে ভাইসরয় লর্ড রিপনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত স্মারক লিপিতে সৈয়দ আমীর আলী মুসলমানদের শিক্ষার বিষয়টি স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কে মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। এ সব প্রচেষ্টার ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিল। নওয়াব আবদুল লতিফের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও হুগলীর মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রসংখ্যা খুবই হ্রাস পাওয়ায় মহসীন তহবিলের অর্থ এসব প্রতিষ্ঠানে অনর্থক খরচ না করে কলিকাতায় একটি কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার জন্য আমীর আলী প্রস্তাব করেন। তাঁর দাবিতে সরকার ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। করাচীতে মুসলমানদের লেখাপড়ার জন্য একটি কলেজ তাঁরই উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি নিজে ইসলামী ও পাশ্চাত্য উভয় জ্ঞানেই পারদর্শী ছিলেন। তাঁর রচিত দু'খানি গ্রন্থ 'The Spirit of Islam' এবং 'A short History of the Saracens' তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। বইগুলোর মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেন।

সর্বতোভাবে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় সচেষ্ট থাকা সত্ত্বেও আমীর আলী মনের দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমিতির দ্বারা ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন যে, জাতীয় কাজকর্মে হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতির আন্তরিক সহযোগিতার উপর আধুনিক ভারতের উন্নতি নির্ভরশীল। তথাপি মুসলমানদের পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার পর তিনি লন্ডন থেকে এর প্রতি সমর্থন জানান। ১৯০৮ সালে লন্ডনে মুসলিম লীগের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আমীর আলী লন্ডন মুসলিম লীগের এক প্রতিনিধি দল নিয়ে ভারত সচিব লর্ড মর্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষে জোরালো মতামত তুলে ধরেন। এদেশে মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে সৈয়দ আমীর আমীর ভূমিকা ছিল অনন্য সাধারণ। বস্তুত সৈয়দ আমীর আলীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের এক জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সে দৃষ্টিতে তাঁকেই অনেকে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবর্তক বলে মনে করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর কর্মকাণ্ডের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

দুর্দশায় নিপতিত বাংলার মুসলিম সমাজকে আলোর পথে টেনে তুলতে যাঁদের অবদান মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় নওয়াব আবদুল লতিফ অন্যতম ও সৈয়দ আমীর আলী তাঁদেরই একজন। শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষাই নয়, মুসলমানদের রাজনৈতিক শিক্ষার গুরুত্বও তিনি অনুভব করেছেন এবং সে কারণে মুসলমান সমাজকে রাজনীতি সচেতন করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নওয়াব আবদুল লতিফ কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন?

i. কলকাতা মাদ্রাসা
ii. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়
iii. ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। 'নীল কমিশন' কত খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়?

ক) ১৮২৮ খ) ১৮৪৯ গ) ১৮৬০ ঘ) ১৮৭৭

৩। 'নীল কমিশন' গঠনের ফলে নীল চাষ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসে তা হলো–

ক) নীল চাষ কৃষকদের ইচ্ছাধীন করা খ) নীল চাষ বাধ্যতামূলক করা
গ) নীল চাষে উৎসাহিত করা ঘ) নীল চাষে অধিক বিনিয়োগ করা

৪। সৈয়দ আমীর আলী 'লন্ডন প্রিভি কাউন্সিল'-এর সদস্য নিয়োজিত হন কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৮৪৯ খ) ১৮৭৩ গ) ১৯০৯ ঘ) ১৯২৮

৫। সৈয়দ আমীর আলী রচিত প্রস্তকের নাম হলো–

i. The Spirit of Islam
ii. The Indian Mussalman
iii. A short History of the Saracens

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৯.৪ বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের (বাংলা বিভাগ) পটভূমি ও কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে এর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বাংলা, পূর্ববঙ্গ ও আসাম, কার্জন, নবাব সলিমুল্লাহ, ঢাকা

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গ-বিভক্তি ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলের একটি প্রশাসনিক সংস্কার। ঐ সময় সমগ্র বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বঙ্গ প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। উপমহাদেশের এক তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল এ অঞ্চলে। কার্জন এত বড় এলাকাকে একটি মাত্র প্রশাসনিক ইউনিটের অধীনে রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। রাজধানী কলকাতা থেকে সুদূর পূর্বাঞ্চলের আইন শৃংখলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। তাই প্রশাসনিক কারণে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দু'ভাগে ভাগ করার পরিকল্পনা করেন। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গকে আসামের সাথে সংযুক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটা নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। কিন্তু কার্জনের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও বাংলার বর্ণ হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে চরম আন্দোলন গড়ে তোলে।

বাংলা প্রেসিডেন্সির সীমানা রদবদলের প্রয়োজনীয়তা অনেক পূর্ব থেকেই সরকারী মহলের বিবেচনায় স্থান লাভ করে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে চার্লস গ্রান্ট বাংলা প্রদেশকে দু'ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন। পরের বছর লর্ড ডালহৌসীও একই মন্তব্য করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার সরকারের ব্যর্থতার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ভারত সচিব লর্ড নর্থকোট যে কমিটি নিয়োগ করেন তার প্রতিবেদনেও বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার সুপারিশ করা হয়। এসব বিবেচনা করে সরকার ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে আসামকে বাংলা থেকে পৃথক করে চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশে পরিণত করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ হওয়ায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। ভাইসরয় নিযুক্তির অল্পদিনের মধ্যেই কার্জন ভারতের প্রদেশগুলোর সীমারেখা পুনর্নির্ধারণের পূর্বের প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার বাংলার সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলোর মতামত জানতে চাইলে তারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার সামান্য রদবদল করে পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি প্রবল গণ-অসন্তোষের সম্মুখীন হয়। বিভিন্ন মহল থেকে এর বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠান হয়। মুসলমানদের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ আসে। এমতবস্থায় লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ সফরে যান। তিনি সর্বত্রই বঙ্গবিভক্তি বিরোধী উত্তেজনা লক্ষ করেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে প্রদত্ত ভাষণে তিনি প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাসে আরও কিছু এলাকা এর সঙ্গে যুক্ত করার ইঙ্গিত দেন, যার ফলে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, একটি আইন পরিষদ ও পৃথক রাজস্ব বোর্ড নতুন প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে থাকবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকায় এবং এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা নতুন প্রদেশে বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। ফিরে গিয়ে কার্জন প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পুনরায় পর্যালোচনা করেন এবং কিছু সংযোজনসহ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুমোদনের জন্য ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করেন। নতুন বিন্যাসে আসামের সঙ্গে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ যুক্ত হয়। তাছাড়া দার্জিলিং বাদ দিয়ে জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ এর অন্তর্ভুক্ত হয়। তিন কোটি দশ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী নির্বাচিত হয় ঢাকা। বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবর কার্যকরী হয়।

বঙ্গবিভাগ ও নতুন প্রদেশ গঠনের পেছনে প্রশাসনিক সুবিধা ও দক্ষতা বৃদ্ধিই ছিল কার্জনের মূল উদ্দেশ্য। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই সমগ্র বাংলার শাসন ব্যবস্থা ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। এর ফলে পূর্ব বাংলা সব সময়েই ছিল অবহেলিত ও

অনুন্নত। কার্জন ভেবেছিলেন যে, নতুন প্রদেশ করা হলে এ অঞ্চলের শিক্ষা, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে এবং পূর্ববঙ্গ বাংলার অন্য অংশের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। কিন্তু কোনো কোনো ঐতিহাসিক ও সমকালীন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের অনেকে তাঁর এ পরিকল্পনাকে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির একটি রাজনৈতিক কৌশল বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা কার্জন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইংরেজ বিরোধী ভূমিকায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং তিনি বাঙালীর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক শক্তিকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন। সে জন্য প্রধানত রাজনৈতিক কারণে তিনি কংগ্রেসের প্রভাব প্রতিপত্তি ও নতুন জাতীয়তাবাদী শক্তিকে দুর্বল করতে মনস্থ করেন।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লা এবং নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলো নতুন প্রদেশ গঠনে সন্তোষ প্রকাশ করে। যেহেতু পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা নানারকম সুযোগ সুবিধার আশায় বঙ্গবিভাগকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে। তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে জমিদার, পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে যোগ দেয়। কলকাতা কেন্দ্রিক ভূস্বামী ও পেশাজীবীরা নতুন প্রদেশে নানাবিধ সমস্যা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবার আশংকায় বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলনকে শক্তিশালী ও ব্যাপক করে তোলে। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, বাল গঙ্গাধর তিলক এমন কি গোখলের মতো উদারপন্থী নেতাও এ আন্দোলনে অংশ নেয়। বঙ্গ-বিভক্তি প্রতিরোধ সংগ্রাম পরে স্বদেশী আন্দোলনকে বেগবান করে। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তি প্রয়োগের কৌশল অবলম্বন করায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও এর সঙ্গে যুক্ত হয়। বৃটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের প্রতিহত করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ দিল্লী দরবারে এ ঘোষণা দেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	"বঙ্গভঙ্গ কতটুকু যৌক্তিক ছিল" – এই বিষয়ে শিক্ষার্থীগণ একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

বঙ্গভঙ্গ বিশ শতকের গোড়ার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ায় ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য বৃটিশ সরকারী মহলে অনেক প্রস্তাব আসে। শেষ পর্যন্ত মূলত প্রশাসনিক কারণে লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন একটা প্রদেশ সৃষ্টি করেন। এ প্রদেশের রাজধানী ছিল ঢাকা। পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা এতে খুশী হলেও বাংলার বর্ণ হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে। তাদের চাপে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানিয়েছিলেন কে?

i. স্যার সৈয়দ আহমদ খান
ii. নবার স্যার খাজা সলিমুল্লা
iii. নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯০৩ খ) ১৯০৫ গ) ১৯০৯ ঘ) ১৯১১

৩। বঙ্গভঙ্গের ফলে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয় কোথায়?

ক) কলকাতা খ) আসাম গ) ঢাকা ঘ) দিল্লী

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশাসনিক ও মহানগরীর বাসিন্দাদের সার্বিক সুবিধা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নামে বিভক্ত করা হয়। দু'জন মেয়রের হাতে এর দায়িত্বভার ন্যাস্ত করা হয়। এ ঘোষণায় নামমাত্র বিক্ষোভ হলেও ঢাকাবাসী সাদরে এ বিভক্তি সমর্থন করে সরকারকে ধন্যবাদ জানায়।

ক. বর্ণিত অঞ্চল বিভাজন আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন বিভাজনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন। ১

খ. উক্ত বিভক্তি বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায় কীভাবে গ্রহণ করেছিল? এই বিষয়ে আপনার মতামত যুক্তিসহ লিখুন। ২

পাঠ-৯.৫ বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে কারা ও কেন অংশ নেয় তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- স্বদেশী পর্যায়ে এ আন্দোলনের কী রূপ ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সন্ত্রাসবাদী ও চরমপন্থীদের এ আন্দোলনে কী ভূমিকা রয়েছে তার মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- ব্রিটিশ সরকার কেন বঙ্গভঙ্গ রদ করেন এ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বঙ্গভঙ্গ, কলকাতা, ঢাকা, স্বদেশী আন্দোলন, যুগান্তর

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গবিভাগের কারণে বাংলার উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা শীঘ্রই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী একটি সুসংহত আন্দোলনের রূপ নেয়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি বিদেশী পণ্য বর্জন বা বয়কটের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ব্রিটিশ বিরোধী প্রসিদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনের। চরমপন্থীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলনকে প্রচণ্ড শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষণা করতে বাধ্য হয়।

বাংলার নিম্নবর্ণের হিন্দুরা এ আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও সাধারণভাবে হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষত বর্ণ-হিন্দুরা এর নেতৃত্ব দেয়। জাতীয় কংগ্রেস ছিল এ আন্দোলনের পুরোভাগে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার শ্রেণি, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও সাংবাদিক সবাই এ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। বক্তৃতা মঞ্চ ও পত্র-পত্রিকায় বঙ্গবিভক্তিকে 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' 'জাতীয়তাবাদ বিরোধী' ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়। নতুন সৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়াতে হিন্দু সম্প্রদায়ের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এক প্রতিবাদ সভায় বলেন, "নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হইবে সংখ্যাগুরু আর বাঙালী হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে স্বদেশেই আমরা হইব প্রবাসী"। নিছক স্বার্থবোধ ও ধর্ম-ভিত্তিক সংকীর্ণ জাতীয় চেতনা থেকেই মূলত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত। এ আন্দোলন ছিল প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক। জমিদার, পুঁজিপতি শ্রেণি ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছিল এর অগ্রভাগে। বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে এরা ছিলেন সুবিধাভোগী। জমিদারেরা তাদের প্রজাদের শোষণ করে বিপুল ঐশ্বর্য গড়ে তোলে এবং তাদের নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচারে কৃষকরা আর্থিক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়।

ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হলে নতুন প্রদেশে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে, নতুন পুঁজিপতি শ্রেণির জন্ম হবে। ফলে তাদের একচেটিয়া ব্যবসা ও মুনাফা নষ্ট হবে এ আশংকায় কলিকাতার ধনিক শ্রেণি ও ব্যবসায়ীরা নতুন প্রদেশ গঠনের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, আইনজীবী এবং সাংবাদিকতার পেশায় জড়িতরাও অনুরূপ কারণে ভীত ছিল। সে কারণে তারা সকলেই নিজেদের শ্রেণিস্বার্থ ও প্রাধান্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনী কুমার দত্ত, মহারাষ্ট্রের তিলক প্রমুখ নেতারা জাতীয়তাবাদের চেতনায় এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

হিন্দু সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা নিয়ে জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলে। অনেকগুলো প্রতিবাদ সভা থেকে বঙ্গ বিভক্তি বাতিলের দাবি জানানো হয়। আন্দোলন জোরদার করার জন্য কংগ্রেস ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট কলিকাতার এক জনসভা থেকে বৃটিশ পণ্য বর্জনের ডাক দেয়। অক্টোবরে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হবার দিনে হিন্দুরা 'রাখীবন্ধন' অনুষ্ঠান পালন করে এবং মিছিল ও সভাসমিতিতে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দেয়।

শীঘ্রই স্বদেশী আন্দোলন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদেশি পণ্য আমদানি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয়। দেশীয় শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশে নতুন নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। আন্দোলনকারীরা বিলাতী পণ্যের সঙ্গে ইংরেজদের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বর্জনের আহ্বান জানায়। ছাত্ররা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কর্মসূচিকে জোরদার করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা বিশেষত সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও কবি-সাহিত্যিকরা এ আন্দোলনকে জোরদার করতে মূল্যবান অবদান রাখে। সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর 'বেঙ্গলী' এবং মতিলাল ঘোষের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রতিরোধ আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র লাল, রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস প্রমুখ কবিদের রচিত দেশ বন্দনামূলক গান আন্দোলনকারীদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি" গানটি রচনা করেন যা আজ আমাদের জাতীয় সংগীত। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনকালে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে দেশাত্মবোধক ভাবের এক নতুন জোয়ার আসে।

বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষ পূর্তি কংগ্রেস ও হিন্দুরা শোক দিবস হিসেবে পালন করে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ক্ষেত্র বিশেষে সহিংসতার পথে ধাবিত হয়। আন্দোলনকারীদের একাংশ চরমপন্থী নেতাদের প্ররোচনায় উগ্রপন্থী কার্যকলাপ শুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটান। ঢাকা ও কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। এদের মধ্যে ঢাকার 'অনুশীলন' এবং কলকাতার 'যুগান্তর' সমিতি ছিল প্রধান। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র। এ সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয় পুলিন বিহারী দাসের উপর। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বিপ্লবীদের দ্বিতীয় দল 'যুগান্তর সমিতি'র জন্ম হয়। অরবিন্দ ঘোষ, বারিন্দ্র ঘোষ ও ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত এ সমিতির উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন। 'যুগান্তর' নামে সমিতির একটা পত্রিকা ও প্রকাশিত হয়।

সারাদেশ গুপ্ত সমিতিগুলোর অনেক শাখা-প্রশাখা গড়ে উঠে। শরীরচর্চা ছাড়াও এসব সমিতির মাধ্যমে যুবকদের অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শতশত যুবক ও ছাত্র এ আন্দোলনে যোগ দেয়। গুপ্ত হত্যার দ্বারা ইংরেজদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করা হয়। বিপ্লবী যুবকরা পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলার-কে দু'বার হত্যার চেষ্টা করে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী এই আন্দোলনে জড়িত হয়ে জীবন উৎসর্গ করেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। লর্ড মিন্টোর পরে নতুন ভাইসরয় হয়ে আসেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। তিনি কংগ্রেসী নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য আপোসনীতি গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ করতে মনস্থ করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ বাতিলের ঘোষণা দেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দলনের উপর একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

লর্ড কার্জন শাসনকার্যের সুবিধার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দু'ভাগে ভাগ করেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্গভঙ্গ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বেগবান হয় বিদেশি পণ্য বর্জনের স্বদেশী আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের একাংশ সশস্ত্র কার্যকলাপ, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। ইংরেজ সরকার আপোসের পথ নেয় এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বাতিল ঘোষণা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পত্রিকা কোনটি?

i. বেঙ্গলী
ii. অমৃত বাজার
iii. যুগান্তর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। বঙ্গভঙ্গ রহিতকরণের সময়ে ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় কে ছিলেন

ক) লর্ড ডাফরিন খ) লর্ড কার্জন গ) লর্ড মিন্টো ঘ) লর্ড হার্ডিঞ্জ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বহুভাগে বিভক্ত ইতালিকে একত্রীকরণের লক্ষ্যে আদেলফিয়া ও কারবোনারি নামে দুটি গুপ্ত সমিতির আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৩। ভারতবর্ষে অঞ্চল একত্রীকরণের বিরুদ্ধে গঠিত গুপ্ত সমিতির নাম কী?

i. যুগান্তর
ii. অনুশীলন
iii. রাখীবন্দন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। উক্ত সংগঠনের কোন সদস্যকে ফাঁসি দেয়া হয়?

ক) প্রমতনাথ মিত্র খ) মতিলাল ঘোষ গ) ক্ষুদিরাম ঘ) ভূপেন্দনাথ

পাঠ-৯.৬ সিমলা ডেপুটেশন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সিমলা ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সিমলা ডেপুটেশনে মুসলমান প্রতিনিধিদের উত্থাপিত দাবিগুলো কী ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুসলমান নেতাদের দাবির প্রেক্ষিতে লর্ড মিন্টোর প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সিমলা, লর্ড মিন্টো, পৃথক নির্বাচন, সিমলা ডেপুটেশন

ভারতীয় মুসলমানদের কাছে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সিমলা ডেপুটেশনের গুরুত্ব অত্যধিক। ঐ বছর একটি মুসলিম প্রতিনিধিদল বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করার দাবি জানান। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের সে দাবি পূরণ করে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের পদত্যাগের পর লর্ড মিন্টো তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বৃটেনে একটি উদারনৈতিক সরকারের আবির্ভাব ঘটে এবং জন মর্লি ভারত সচিব নিযুক্ত হন। জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলছিল। বঙ্গভঙ্গ বাতিলের কংগ্রেসী দাবি সরাসরি মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না বিধায় বৃটিশ সরকার কিছুটা সমঝোতামূলক মনোভাব নিয়ে কংগ্রেসকে অন্যভাবে খুশী করার চেষ্টা করে

এবং আইন পরিষদের গঠনকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক করার কথা বিবেচনা করে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে এ ব্যাপারে আরও পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইংল্যান্ডের কমন্স সভায় বাজেট বক্তৃতাকালে মর্লে ঘোষণা করেন যে, ভারতের আইন পরিষদের গঠনকে আরেকটু বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্য ভাইসরয় শীঘ্রই একটি ছোট কমিটি নিয়োগ করবেন। উক্ত কমিটি অল্প সময়ের মধ্যে তাদের সুপারিশমালা প্রদান করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মর্লির শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ঘোষণা প্রকাশিত হবার সাথে সাথে বিভিন্ন মুসলিম পত্র-পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সাথে মত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত সংস্কারে আইন-পরিষদের গঠন-প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের সামনে তুলে ধরা উচিত। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের ভারতীয় কাউন্সিল আইনের অধীনে বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে জনসংখ্যানুপাতে মুসলমানদের যতগুলো আসন প্রাপ্য ছিল, নিজেদের প্রার্থী দেয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা তার অর্ধেক আসনও লাভ করতে পারে নি। তারা অনুভব করে যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা মেনে নিলে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে।

আলীগড় কলেজের সেক্রেটারী নবাব মহসীন-উল-মুলকের অনুপ্রেরণা ও উদ্যোগে মুসলমানরা তখন একটি প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে তাঁদের মতামত বৃটিশ সরকারের কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড বড়লাটের সাথে প্রতিনিধিদলের সাক্ষাতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। মহামান্য তৃতীয় আগা খান দলের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর ৩৫ জনের মুসলিম প্রতিনিধিদল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করতে যান। পূর্ববঙ্গের মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সিমলা ডেপুটেশনে যোগদান করেন। এটাই ঐতিহাসিক সিমলা ডেপুটেশন। প্রতিনিধিবর্গ একটি স্মারকলিপিতে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দাবিসমূহ ভাইসরয়ের সামনে তুলে ধরেন। তাঁরা মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার্থে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি করেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল যে, পূর্বের কাউন্সিলসমূহে মুসলমানদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না। তা ছাড়া মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত অনেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। তাঁরা বড়লাটের কাছে দাবি করেন যে, মুসলমানদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও রাজনৈতিক ভূমিকার প্রতি লক্ষ রেখে তাদেরকে জনসংখ্যার শক্তির চেয়েও বেশি প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ দিতে হবে। স্থানীয় সরকার এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে মুসলমান প্রতিনিধিগণ তাদের পৃথক মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিক সংখ্যক মুসলমানদের নিয়োগ দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসনে তাদের প্রতিনিধি রাখার জন্য ডেপুটেশনের সদস্যরা দাবি করেন।

বড়লাট মিন্টো সহানুভূতির সঙ্গে মুসলিম প্রতিনিধিদলের বক্তব্য শোনেন। তিনি তাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, ভারতবর্ষের শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যতদিন তাঁর কিছু করার থাকবে ততদিন তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বিবেচনা করবেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতীয় জনসাধারণের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ না রেখে ভোটাধিকার ভিত্তিক যেকোন নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হলে তা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে। উল্লেখ্য যে, মুসলমান প্রতিনিধিদেরকে দেয়া বড়লাটের প্রতিশ্রুতি কোনো মিথ্যা আশ্বাস ছিল না। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লে-মিন্টো সংস্কারে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং জনসংখ্যার তুলনায় তারা অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সিমলা ডেপুটেশনের আদলে একটি আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করুন।

সারাংশ

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের সিমলা ডেপুটেশন ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আইন পরিষদের সংস্কারের উদ্যোগের মুখে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সিমলায় সাক্ষাত করেন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব আরও বৃদ্ধিসহ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখার দাবি জানান। বড়লাট তাদের দাবি বিবেচনার আশ্বাস দেন এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে তা বাস্তবায়িত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মর্লি-মিন্টো সংস্কারের সময়কাল কোনটি
ক) ১৯০৬ খ) ১৯০৭ গ) ১৯০৯ ঘ) ১৯১১

২। মর্লি-মিন্টো সংস্কার মুসলমান সম্প্রদায়–
i. স্বতন্ত্র নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে
ii. চাকুরির ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা প্রাপ্ত হয়
iii. জনসংখ্যার তুলনায় বেশি প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। সিমলা ডেপুটেশনে মূখ্য প্রতিনিধি কে ছিলেন?
ক) তৃতীয় আগা খান খ) নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী
গ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ঘ) মহসীন-উল-মুলক

পাঠ-৯.৭ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- মুসলিম লীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রথম দিকে এ দলের সাংগঠনিক চরিত্র কী ছিল তা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	মুসলীম লীগ, আলীগড় কলেজ, শাহবাগ, অবিজাত

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগের জন্ম উপমহাদেশের ইতিহাসের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। উনিশ শতকে স্যার সৈয়দ আহমদ খানসহ বিশিষ্ট মুসলিম নেতৃবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার ফল হিসেবে একদিকে যেমন মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়, তেমনি কংগ্রেসের রাজনীতি হতে দূরে থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থেও এগিয়ে আসে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা এ রূপ স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনৈতিক ধারারই ফল।

মুসলমানদের চরম দুর্দিনে ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে সৈয়দ আহমদ খানের আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে এবং ইংরেজ বিদ্বেষ পোষণ করে এ সময় মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষা এবং চাকুরি সহ সর্বক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে ছিল। স্যার সৈয়দ ও বাংলার নেতা নবাব আবদুল লতিফ মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সৈয়দ আহমদ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরে 'বিজ্ঞান সমিতি', ১৮৭৫ সলে আলীগড়ে 'মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল' এবং ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের সচেতন ও সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে বাংলার আরেক নেতা সৈয়দ আমির আলী প্রতিষ্ঠা করেন 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল

মোহামেডান এসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগ দিতে নিষেধ করেন।

সৈয়দ আমির আলী প্রথমে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন দিয়ে কিছুদিন পর তা প্রত্যাহার করেন। তাঁর মতে কংগ্রেসের কর্মসূচীর প্রতি সর্বাংশে সমর্থন মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সর্বনাশ ডেকে আনবে। নেতৃবৃন্দের স্বাতন্ত্র্যবাদী নীতি মুসলমানদের মধ্যে স্বতন্ত্র চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

উনিশ শতকের শেষের দিকে আরো কতিপয় ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে পুনর্জাগরণের চেতনাকে শাণিত করে। বেনারসে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দী-উর্দু বিতর্ক, হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় উৎসবাদির আয়োজন, যেমন— নবগোপাল মিত্রের হিন্দু-মেলা ও শিবাজী উৎসব, উত্তর ভারত জুড়ে গো-জবাই নিবারণ সমিতি ইত্যাদি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত চেতনাকে আহত করে। এ ছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য সরকারি চাকুরীতে মুসলমানদের দৈন্য-দশা তাদেরকে অস্তিত্ব রক্ষায় অনুপ্রাণিত করে। যুক্ত প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের দিকে কতিপয় বিশেষ সরকারি কাজে উর্দুর বদলে দেবনাগরী হরফে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিলে সেখানকার মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। প্রতিবাদ স্বরূপ ১৮ আগস্ট লক্ষৌতে মুসলমান প্রতিনিধিরা একটা সভা ডাকে। আলীগড় কলেজের সেক্রেটারী মহসীন-উল-মুল্‌কের নেতৃত্বে 'উর্দু প্রতিরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌতে অরেকটি সভায় মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে একটি জাতীয় সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনরায় ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে উত্তর প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিলে সাহারানপুরের এক জনসভায় ভারতের মুসলমানদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে নবগঠিত পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের সংখ্যগরিষ্ঠ মুসলমানরা অধিকতর সুযোগ সুবিধার আশায় নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারি পদক্ষেপকে সমর্থন জানায়। কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সর্বাত্মক আন্দোলন এ অঞ্চলের মুসলমান নেতৃবৃন্দকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারা নিজেদের জন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা এ সময় আরো বেশি করে অনুভব করে। বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ পক্ষের নেতা নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এবং নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী জাতীয় কংগ্রেসের বিপরীতে একটি রাজনৈতিক দলের তাগিদ তীব্রভাবে অনুভব করেন।

পরবর্তী বছরের জুলাই মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক বক্তৃতায় ভারত সচিব লর্ড মর্লে ভারতের জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের উদ্যোগের কথা ব্যক্ত করেন। বৃটিশ সরকার এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই মুসলমান সম্প্রদায়ের অনুভূতি ও বক্তব্য সরকারের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন। মহসীন-উল-মুল্‌কের উদ্যোগে ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাতের আয়োজন করা হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১ অক্টোবর ৩৫ সদস্যের মুসলিম প্রতিনিধিদল আগা খানের নেতৃত্বে সিমলায় ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে মত বিনিময় করেন। ইতিহাসে এটি সিমলা ডেপুটেশন নামে খ্যাত। নওয়াব সলিমুল্লাহর অনুরোধে সমবেত নেতৃবৃন্দ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সিমলায় পরস্পর মত বিনিময় করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠেয় মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সের বার্ষিক সভায় দল গঠনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে ভারতীয় মুসলমান নেতাদের মধ্যে নব উদ্দীপনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠে এবং শীঘ্রই তাঁরা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসী' নামে একটি দলের প্রস্তাব দেন। ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয় 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে'র বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনের শেষ দিনে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মুসলিম প্রতিনিধিগণ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের জন্য একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। নবগঠিত দলের যুগ্ম-আহবায়ক নির্বাচিত হন নবাব মহসীন-উল-মুল্‌ক ও ভিকার-উল-মুল্‌ক। প্রাথমিকভাবে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ :

ক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি সহযোগিতা ও আনুগত্যের মনোভাব বজায় রাখা।

খ. মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

গ. উপরিউক্ত লক্ষ্যের কোনো ক্ষতি না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলা।

মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মুসলমানদের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্ত তৈরি করে। এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। তবে উল্লেখ্য যে, অভিজাত সম্প্রদায় তথা নাইট, নবাব ও ভূস্বামী জমিদার জোতদারদের প্রাধান্যের কারণে বহুদিন পর্যন্ত গণমানুষের সাথে মুসলিম লীগের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত-বিভক্তির মাত্র কিছুদিন পূর্বেই এটি মুসলমানদের প্রকৃত সংগঠনে পরিণত হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ঐ সময় মুসলিম লীগ পাকিস্তান অর্জন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মুসলীম প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ রচনা করবেন।

সারাংশ

মুসলিম লীগের আবির্ভাব উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম ঘটনা। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব থেকেই এর প্রতিষ্ঠা। উনিশ শতকের উগ্র হিন্দুবাদী কার্যকলাপ ও মুসলিম স্বার্থবিরোধী তৎপরতা মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে দেয় এবং ক্রমশ নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার তাগিদে তারা পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এ দলের প্রতিষ্ঠা এরই পরিণতি মাত্র। কিন্তু ব্যাপক ভিত্তিক জন-সমর্থিত দল রূপে গড়ে উঠতে এর অনেক সময় লাগে এবং ১৯৪০ দশকের পূর্বে তা সম্ভব হয় নি। মুসলিম লীগই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সিলমা ডেপুটেশনে অংশ নেয়া ভারতীয় প্রতিনিধি কত জন?

ক) ১৮ খ) ৩০ গ) ৩৫ ঘ) ৪০

২। মুসলিম লীগ কার স্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তার ফসল?

i. স্যার সৈয়দ আহমদ খান
ii. সৈয়দ আমীর আলী
iii. নওয়াব আবদুল লফিত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা কোথায় হয়েছিল?

ক) দিল্লী খ) লাহোর গ) লক্ষ্ণে ঘ) ঢাকা

পাঠ-৯.৮ মর্লি-মিন্টো সংস্কার (১৯০৯ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মর্লি-মিন্টো সংস্কার কেন প্রবর্তিত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- মর্লি-মিন্টো সংস্কারের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ বিষয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	মর্লি-মিন্টো, ভারত শাসন আইন, আইন সভা, পৃথক নির্বাচন

পটভূমি

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইন ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। তারা উপলব্ধি করে যে ভারতের জনগণকে কোনো প্রকার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অধিকার প্রদান করতে বৃটিশ সরকার আদৌ আগ্রহী নয়। কিন্তু বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠায় এবং ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র বৃটিশ বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করে ঔপনিবেশিক সরকার সংস্কারের কথা চিন্তা করে। একদিকে স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা, অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ- এহেন পরিস্থিতিতে সরকার বুঝেছিল যে, কেবল দমনমূলক নীতির মাধ্যমে এ অশান্ত পরিবেশের মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। ঐ সময়ে ইংল্যান্ডে উদারনৈতিক দলের ক্ষমতা লাভ, ভারতে লর্ড কার্জনের স্থলে বড়লাট হিসেবে লর্ড মিন্টোর দায়িত্ব গ্রহণ এবং ভারত সচিব পদে লর্ড মর্লির নিয়োগ ভারতের রাজনীতিতে সঞ্চার করে এক নতুন গতিবেগ। মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে দলের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী উপদলের উদ্ভব পরিস্থিতিকে খানিকটা বৃটিশের পক্ষে অনুকূল করে তোলে। বৃটিশ পার্লামেন্টে বাজেট ভাষণে মর্লির ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের আভাস কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সহযোগিতা লাভের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। লর্ড মর্লি ও বড়লাট মিন্টো উভয়েই নিজেদের মধ্যে মতের আদান প্রদানের পর শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের জন্য যে আইন পাশ হয় তা মর্লি-মিন্টো সংস্কার বা ১৯০৯ সালের *ভারত শাসন আইন* নামে পরিচিত।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইনে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয়দের সহযোগিতা লাভের নীতি গৃহীত হয়। বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয়। বোম্বে ও মাদ্রাজের গভর্নরের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪ জনে উন্নীত করা হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের গঠন ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ অতিরিক্ত সদস্য সংখ্যা ১৬ থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ৬০ পর্যন্ত করা হয়। এর মধ্যে ২৮ জনের বেশি সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন না। কতগুলো বিশিষ্ট সম্প্রদায় থেকে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করার অধিকার বড়লাটকে দেয়া হয়। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়, জমিদার শ্রেণি, কলিকাতা ও বোম্বের চেম্বার অব কর্মাস এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে সর্বমোট ২৭ জনকে মনোনীত করবেন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার নীতি গৃহীত হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদের ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রদেশগুলোতে অতিরিক্ত সদস্যের সর্বাধিক সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ৫০ জনে। তবে এ বৃদ্ধি এমনভাবে করা হয় যাতে নির্বাচিত সদস্যদের তুলনায় সরকারি ও বেসরকারি মনোনীত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে। একমাত্র বাংলায় নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা অধিক রাখা হয়।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকার করে এ আইনে মুসলিম সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচনের (পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা) অধিকার দেয়া হয়। তাছাড়া আইন সভাগুলোকে বাজেট নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব উত্থাপন করার এবং জন-স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা করার অধিকার প্রদান করা হয়। অবশ্য ঐসব প্রস্তাব অগ্রাহ্য বা বাতিল করার ক্ষমতা সরকারের হাতে রাখা হয়। তবে দেশীয় রাজ্য, সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের উপর প্রস্তাব গ্রহণ বা আলোচনা নিষিদ্ধ ছিল।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। আইন সভার নির্বাচিত সদস্যগণ জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন না। তাছাড়া তাদেরকে কোনো ক্ষমতাও দেয়া হয় নি। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলোতে তারা সবসময়ই সংখ্যালঘু ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সংস্কার আইনের মাধ্যমে ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন ইচ্ছাই ইংরেজদের ছিল না। ভারত সচিব মর্লে স্পষ্টতই বলেছিলেন যে, স্বায়ত্তশাসিত ডোমিনিয়নের মর্যাদা ভারতকে দেয়া সম্ভব নয়। বড় লাট মিন্টোরও উক্তি ছিল যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রতিনিধিমূলক সরকার গঠন ভারতের জন্য উচিত হবে না। তাই কংগ্রেসের নরমপন্থীদের পক্ষে আনা যদি মর্লি-মিন্টো সংস্কারের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে স্বীকার করতে হবে যে সে উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবি মেনে নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহন করে।

মর্লি-মিন্টো সংস্কারে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকায় জাতীয় কংগ্রেস অসন্তুষ্ট হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস এ ধরণের নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। অধিবেশনের সভাপতি মদন মোহন মালাভীয়া সরকারের বিভেদমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, এর ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুণ্ন হবে।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী একে মারাত্মক নীতি বলে অভিহিত করেন। অন্যদিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের পত্র-পত্রিকা ও নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথাকে স্বাগত জানায়। নাগপুরে অনুষ্ঠিত ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের অধিবেশনে ভারত সচিব ও বড়লাটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ১৯০৯ সালের সংস্কার সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

বিশ শতকের প্রথমদিকে উত্তপ্ত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে প্রশমিত করার জন্য মর্লি-মিন্টো সংস্কার ছিল একটা কৌশলগত পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করায় স্বভাবতই তারা খুশী হয়, যদিও কংগ্রেস এতে ক্ষুব্ধ ছিল। কংগ্রেসের নরমপন্থীরাও সন্তুষ্ট ছিল না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনকে–
- ক) মুসলিম লীগ স্বাগত জানিয়েছিল
- খ) মুসলিম লীগ অসন্তুষ্ট হয়
- গ) কংগ্রেস স্বাগত জানিয়েছিল
- ঘ) দেশীয় রাজ্যগুলো অসন্তুষ্ট হয়

২। মর্লি-মিন্টো সংস্কারে–
- ক) ভারতকে স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয়
- খ) প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থা করা হয়
- গ) মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের সযোগ দেয়া হয়।
- ঘ) আইন পরিষদের ক্ষমতা বাড়ানো হয়

৩। মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইনে বড়লাটের কার্যনির্বাহী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সদস্য সংখ্যা কতজন নির্ধারিত হয়?
ক) ০ খ) ১ গ) ২ ঘ) ৩

পাঠ-৯.৯ বঙ্গভঙ্গ রদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বঙ্গভঙ্গ রদের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গ রদের প্রক্রিয়া ও বড়লাট হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল বিষয়ে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	পঞ্চম জর্জ, লর্ড মিন্টো, লর্ড হার্ডিঞ্জ, বড়লাট

লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক পদক্ষেপ বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বাংলায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। প্রথম দিকে ভারত সরকার এ বিষয়ে অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে ও নির্যাতনের আশ্রয় নেয়। তদানিন্তন ভারত সচিব মর্লে বঙ্গ বিভক্তিকে মীমাংসিত বিষয় বা 'Settled Fact' বলে ঘোষণা করেন এবং তা বাতিলের দাবিকে নাকচ করে দেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের উগ্রতা এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ড বৃটিশ সরকারকে ক্রমশ ভাবিয়ে তোলে। সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং সামাজ্যের আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তার কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা আপোসের পথ

বেছে নেয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রহিত করার ঘোষণা দেন। বংলার ভৌগোলিক সীমানা আবার পুনর্বিন্যস্ত হয় এবং একই সঙ্গে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বৃটেনের রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণে আসেন। এ সময় বঙ্গভঙ্গের কারণে তিনি হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা লক্ষ করেন। কিন্তু তখন এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে তিনি এগিয়ে যান নি। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় নবগঠিত প্রদেশের পক্ষে সমর্থন প্রদান করে। ঐ সময়ে ভারত সচিব মর্লে ও বড়লাট মিন্টো তাদের আশ্বাস দেন যে, বঙ্গভঙ্গ একটি বাস্তবতা এবং এর কোনো পরিবর্তন হবে না। অপর দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলে বঙ্গ বিভাগের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করবেন বলায় মুসলমান নেতারা আশংকা প্রকাশ করেন। তাঁরা স্মারকলিপির মাধ্যমে সরকারকে তাদের আশংকার কথা জানান। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাঁরা মত দেন যে, বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হলে মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হবে।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে লর্ড মিন্টোর স্থলে লর্ড হার্ডিঞ্জ নতুন ভাইসরয় নিয়োজিত হন। তাঁর আসার পর পরই বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয়ে গোপন যোগাযোগ ও আলোচনা শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গের কারণে ব্যাপক অসন্তোষ ও সন্ত্রাসমূলক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য বিবেচনা করে তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ অনুভব করলেন যে, বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করা দরকার। ঐ বছরের ডিসেম্বরে তিনি তদানিন্তন ভারত সচিব লর্ড ক্রু এবং বড়লাট হার্ডিঞ্জের সঙ্গে পত্রালাপ করেন। সম্রাট বড়লাটকে জানান যে, বঙ্গভঙ্গের বিষয়ে কোনো পরিবর্তন আনা হলে বাংলায় বিরাজমান অসন্তোষ ও রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অবসান ঘটবে। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বোঝা হ্রাসে উক্ত পদক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রথম দিকে ভারত সচিব এবং ভাইসরয়ের মনে হয়েছিল যে, কার্জনের ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে কোনো মতেই পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। পরে বড়লাটের শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য জেনকিন্স নতুনভাবে বাংলা পুনর্গঠনের ও ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের এক পরিকল্পনা প্রদান করেন। হার্ডিঞ্জের নিকট উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। শাসন পরিষদের অনুমোদনের পর সেটি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হয়। উল্লিখিত পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান-এ পাঁচটি বাংলা ভাষাভাষী বিভাগ নিয়ে একজন গভর্নরের অধীনে বাংলা প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর নিয়ে আরেকটি প্রদেশ গঠিত হবে এবং একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর এই প্রদেশের দায়িত্বে থাকবেন। শ্রীহট্টসহ আসামকে পূর্বের ন্যায় কমিশনারের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। নভেম্বর মাসে ভারত সচিব লর্ড ক্রু উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও রানি মেরীর ভারত আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে এক ঐতিহাসিক দরবারের আয়োজন করা হয়। সেখানে রাজা জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের পরিকল্পনার ঘোষণা দেন। ফলে কার্জনের বঙ্গ বিভক্তির ব্যবস্থা বাতিল হয় এবং ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়। নতুন ব্যবস্থাটি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।

বঙ্গভঙ্গ রদ করায় বর্ণ হিন্দু ও কংগ্রেস নেতারা উল্লসিত হয়ে সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। স্বাভাবিক কারণে মুসলমানরা এতে ভীষণভাবে আহত হয় এবং তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। এটিকে তারা সত্যিকার অর্থে ব্রিটিশ সরকারের একটি বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করে। সরকার কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দরুন অনেক মুসলমানই ইংরেজদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা রাজার অনুগত থাকার নীতি ত্যাগ করে। রাজনৈতিকভাবে এর প্রভাব পড়ে মুসলিম লীগের নীতি ও কর্মধারায়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ভারতের জন্য স্বরাজের দাবি দলের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায়ের সংগ্রাম মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বড়লাট হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে নবাব সলিমুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর সাথে দেখা করেন। তাঁরা মুসলমানদের গভীর হতাশা এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বড়লাটকে অবহিত করেন। তিনি এ অঞ্চলের শিক্ষার উন্নতির জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। অবশেষে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বড়লাটের সে আশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গভঙ্গ রদ নিয়ে পঞ্চম জর্জ-এর সিদ্ধান্ত কতটুকু যৌক্তিক ছিল এই বিষয়ে শিক্ষার্থীগণ একটি বিতর্কসভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও বর্ণহিন্দুদের প্রতিবাদ ও আন্দোলন সত্ত্বেও প্রথমদিকে বৃটিশ সরকার কোনো পরিবর্তন না করার ব্যাপারে অটল ছিল। কিন্তু শেষে ইংরেজগণ চাপের মুখে নতি স্বীকার করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ এক ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ রদ করেন। এতে কংগ্রেস ও হিন্দুরা খুশি হলেও মুসলমানদের মনে আঘাত লাগে। তারা ইংরেজদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গভঙ্গ রদ কার্যকর করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯০৯ খ) ১৯১০

গ) ১৯১১ ঘ) ১৯১২

২। কে বঙ্গভঙ্গ রদ করার ঘোষণা দেন?

ক) রাজা পঞ্চম জর্জ খ) রানি মেরি

গ) লর্ড মিন্টো ঘ) লর্ড হার্ডিঞ্জ

৩। বঙ্গ বিভক্তিকে মীমাংসিত বিষয় বা 'Settled Fact' বলে অভিহিত করেন কে?

ক) ব্রিটেনের রাজা খ) ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী

গ) ভারতের ভাইসরয় ঘ) ভারত সচিব

৪। বঙ্গভঙ্গ রদে মুসলমানদের ক্ষতি কিছুটা লাঘব কয়েছিল কীভাবে?

ক) চাকুরিতে মুসলমানদের অধিক সুবিধা দিয়ে

খ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে

গ) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার বাড়িয়ে

ঘ) ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তর করে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। গ ৫। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ ঃ ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ ঃ ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। খ

লক্ষ্মৌ চুক্তি থেকে ভারত বিভাগ (১৯১৬-১৯৪৭ খ্রি.)

ইউনিট ১০

ভূমিকা

বিশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতের রাজনীতিতে বেশকিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি ভারতীয়দের মধ্যে স্বার্থ আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগে। বঙ্গভঙ্গ রদের পরে মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তারা হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে পা বাড়ায় এবং স্বরাজ অর্জনকে তাদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্মৌ চুক্তিতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রশ্নে এক যৌথ দাবিনামায় চুক্তিবদ্ধ হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারে সে দাবির কিছু প্রতিফলন থাকলেও ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ প্রতিফলন তাতে ছিল না। বাংলার নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস হিন্দু মুসলিম ঐক্যের জন্য 'বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি' করলেও এটা ক্ষণস্থায়ী হয়। পুনরায় ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঘটে বিভেদের সূত্রপাত। শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন, গোল টেবিল বৈঠক আহবান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ভারতীয়দের উদ্যোগে নেহেরু রিপোর্ট, জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা ইত্যাদিও সমস্যার সুরাহা করতে পারে নি। পরে আসে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে উপমহাদেশের মুসলমানরা নিজেদের জন্য একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। ভারতের রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে অনৈক্যের পথে ধাবিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বৃটিশ সরকার একটি শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উপমহাদেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয় নি। হিন্দু মুসলিম অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটলে শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়। অভ্যুদয় ঘটে পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের।

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী ভারতের হিন্দু মুসলিম রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে জানবেন; ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধানের চেষ্টা সম্পর্কে অবহিত হবেন এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির পটভূমি আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১০.১ লক্ষ্মৌচুক্তি (১৯১৬ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- লক্ষ্মৌচুক্তির পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- চুক্তির বিষয়বস্তু কী ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- লক্ষ্মৌচুক্তির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	লক্ষ্মৌচুক্তি, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, সংখ্যালঘু, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন বা মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতবাসীর সব দাবি-দাওয়া পূরণে যথেষ্ট সহায়ক হয় নি। এ আইনে যদিও প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি স্বীকার করে নেয়া হয় এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার প্রদান করা হয় তথাপি এতে মুসলিম সম্প্রদায় পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এ সময় কয়েকটি ঘটনা মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা তাদেরকে বৃটিশ সরকারের প্রতি

সন্দিহান করে তোলে। এ রকম আরও একটি ঘটনা হচ্ছে বলকান যুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলিম দেশ তুরস্কের প্রতি বৃটেনের বিরুদ্ধাচারণকে ভারতের মুসলমানরা সমালোচনার চোখে দেখে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাছাড়া ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কানপুর মসজিদের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে কয়েকজন মুসলমান নিহত হলে মুসলমানদের মধ্যে সরকার বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে উঠে।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও অসন্তোষ ভারতের মুসলমানদের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। অভিজাত, রক্ষণশীল ও বৃটিশ অনুগত নেতাদের বদলে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম লীগের তরুন সদস্যগণ দলের মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠে। এ সময়েই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, (যিনি একজন কট্টর কংগ্রেসী ছিলেন) মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুসলিম লীগের লক্ষ্নৌ অধিবেশনে দলের নতুন গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। এতে বলা হয় যে, জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং স্বরাজ অর্জনই হচ্ছে লীগের অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এর ফলে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। অতঃপর লীগ ও কংগ্রেস প্রায় একই সময়ে ও স্থানে এদের বার্ষিক অধিবেশন আহবান করে। এক দলের প্রতিনিধিগণ আরেক দলের অধিবেশনে যোগদান করে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে শহরে অনুষ্ঠিত উভয় দলের সম্মেলনেই সরকারী নীতির সমালোচনা করা হয় এবং হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দেয়া হয়।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এদের বার্ষিক সম্মেলন লক্ষ্নৌ শহরে অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময়ে উভয় সম্প্রদায় ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের নীতির প্রশ্নে একটা সমঝোতায় আসে। এটাই ইতিহাসে লক্ষ্নৌ চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস ও লীগ মিলিত দাবি পেশ করে। চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

লক্ষ্নৌ চুক্তির বৈশিষ্ট্য

১. লক্ষ্নৌ চুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্যসংখ্যা ১৫০ জন করার সুপারিশ করা হয়। এদের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগ হবেন নির্বাচিত সদস্য এবং বাকী একভাগ মনোনীত সদস্য। যতদূর সম্ভব ব্যাপক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত সদস্যের এক তৃতীয়াংশ হবে মুসলিম সদস্য এবং নিজ সম্প্রদায়ের দ্বারাই তারা নির্বাচিত হবেন। কেন্দ্রের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, শুল্ক, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ। ভারত সচিবের কাউন্সিল বিলুপ্ত করতে হবে এবং বৃটিশ সরকারই তাঁকে বেতন দেবে। তাঁর সাহায্যকারী থাকবেন দু'জন এবং এদের মধ্যে একজন হবেন ভারতীয়।

২. প্রাদেশিক আইনসভার ক্ষেত্রে দাবি করা হয় যে, বৃহৎ প্রদেশে সদস্য সংখ্যা ১২৫ জনের কম হবে না। ছোট প্রদেশগুলোতে এ সংখ্যা হবে ৫০ থেকে ৭৫ এর মধ্যে। প্রদেশের ক্ষেত্রেও চার পঞ্চমাংশ সদস্য হবেন নির্বাচিত এবং অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ মনোনীত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। প্রদেশগুলোতে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার ক্ষেত্রে মুসলিম সদস্য থাকবে পাঞ্জাবে ৫০%, যুক্তপ্রদেশে ৩০%, মধ্যপ্রদেশে ১৫%, বাংলায় ৪০%, বিহারে ২৫%, মাদ্রাজে ১৫% ও বোম্বেতে ৩৩%। এখানেও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমেই মুসলিম প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবে। তবে শর্ত ছিল যে, এসব সংরক্ষিত আসন ছাড়া মুসলমানরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক অন্যকোন আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

৩. লক্ষ্নৌ চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন পরিষদে উপস্থিত কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন বিল কখনো গৃহীত হবে না যদি উক্ত সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্য সে বিলের বিরোধিতা করে।

৪. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একত্রে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৫. চুক্তিতে দাবি করা হয় যে, ডোমিনিয়ন সরকারসমূহের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের উপনিবেশ মন্ত্রীর যে সম্পর্ক, ভারত সরকারের সাথে ভারত সচিবের সম্পর্কও হতে হবে অনুরূপ।

উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্বকালের ইতিহাসে লক্ষ্নৌচুক্তিই হচ্ছে প্রথম হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সমঝোতার স্বাক্ষর। ভারতের জন্য একটি সংবিধানের মূল রূপরেখা প্রণয়নে এটা ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যৌথ প্রয়াস। এ চুক্তি হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তি রচনা করে। এর দ্বারা উভয় সম্প্রদায় সরকারের নিকট যুক্তভাবে নিজেদের দাবিনামা পেশ করার সুযোগ পায়। লক্ষ্নৌচুক্তিতে কংগ্রেস প্রথমবারের মতো মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করে। মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন বলেও মেনে নেয়। তবে এ

চুক্তির কিছু সমালোচনা হয়েছে। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। শুধু হিন্দু মুসলিম সমঝোতার খাতিরে তাদেরকে এ দুই প্রদেশে জনসংখ্যা অনুপাতে কম সংখ্যক নির্দিষ্ট আসন মেনে নিতে হয়েছে। বাংলার নেতা নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী এ চুক্তির প্রতিবাদে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ান এবং সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশনে যোগদান করেন। অন্যদিকে এ চুক্তির ফলে পাঞ্জাবে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। মাদ্রাজে তামিল ভাষী মুসলমানরা চুক্তির বিরোধিতা করে। তথাপি এটা অনস্বীকার্য যে, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্মৌচুক্তি ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ লক্ষ্মৌ চুক্তি সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্পাদিত লক্ষ্মৌচুক্তি হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতা ও সামাজিক সম্প্রীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইংরেজদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে পা বাড়ায় এবং ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যপথ স্থির করে। লক্ষ্মৌচুক্তির মাধ্যমে এ দুই সম্প্রদায় বৃটিশ সরকারের কাছে যুক্ত দাবিনামা পেশ করে। এ চুক্তিতে কংগ্রেস প্রথমবারের মতো মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিকে স্বীকার করে নেয় এবং ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে যৌথ প্রয়াস গ্রহণ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯১৩ খ্রিস্টাবেদ মুসলিম লীগের প্রণীত নতুন গঠনতন্ত্রে কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করা হয়?

i. স্বরাজ অর্জন
ii. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা
iii. সাম্প্রদায়িক সৌহার্য প্রতিষ্ঠা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কত খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

ক) ১৯১১ খ) ১৯১৩
গ) ১৯১৬ ঘ) ১৯২০

৩। লক্ষ্মৌচুক্তিতে কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা কতজন করার সুপারিশ করা হয়?

ক) ৫০ খ) ৭৫
গ) ১২৫ ঘ) ১৫০

সৃজনশীল প্রশ্ন

একটি অঞ্চলের দুটি পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক দল জাতির বৃহত্তর স্বার্থে একই মঞ্চে চলে আসে। এ সময় তারা ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এ অবস্থায় উভয় দল পরস্পরকে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি দেয়। এ চুক্তির মাধ্যমে একটি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র নির্বাচনী সুবিধা প্রদান করা হয়। এটিই উক্ত অঞ্চলের ইতিহাসে দুটি দলের প্রথম ঐক্যমতের পদক্ষেপ। ইতিহাস কী এ চুক্তির গুরুত্ব ব্যাপক।

ক. লক্ষ্মৌচুক্তি কী? ১
খ. লক্ষ্মৌচুক্তির পটভূমি কী ছিল? ২
গ. উক্ত সমঝোতা চুক্তিটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৩
ঘ. ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল বলে আপনি মনে করেন? ৪

পাঠ-১০.২ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারতে খিলাফত আন্দোলন কেন হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- অসহযোগ আন্দোলন কেন শুরু হয়, সে সম্পর্কেও বিবরণ দিতে পারবেন।
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে পারবেন।
- আন্দোলন দু'টি কেন ব্যর্থ হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	খিলাফত, অসহযোগ, গান্ধী, মাওলানা মোহাম্মদ আলী

ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন দু'টি ছিল প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা এ আন্দোলন বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভীতকে কাঁপিয়ে তোলে। এ দুটি আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের প্রতীক তুরস্কের খলিফার প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য ও সম্মানবোধ অনেক দিন থেকেই ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশের নেতৃত্বে গঠিত মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে এবং জার্মানির পক্ষে অবতীর্ণ হওয়ায় ভারতীয় মুসলমানদের মনে দ্বৈত আনুগত্যের প্রশ্ন দেখা দেয়। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের মুসলমানগণ বৃটিশ সরকারকে এ শর্তে সমর্থন দেয় যে বৃটিশ সরকার যুদ্ধ শেষে তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু যুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর বৃটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। মিত্রপক্ষ 'প্যারিস চুক্তির' মাধ্যমে তুর্কী সাম্রাজ্যের ব্যবচ্ছেদ এবং খলিফাকে অর্মযাদা করা হয়। ফলে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এক আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন ইতিহাসে 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত। মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মিত্রপক্ষ তুরস্কের উপর 'সেভার্স চুক্তি' চাপিয়ে দিয়ে তুরস্ক সাম্রাজ্যকে চূড়ান্তভাবে খণ্ড বিখণ্ড করার এবং তুরস্কের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্তির উদ্যোগ নিলে খিলাফত আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় মুসলমানদের একটি বৈঠকে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। বোম্বেকে কেন্দ্র করে সব প্রদেশে কমিটির শাখা প্রশাখা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। পরের মাসে এ. কে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে দিল্লীতে খিলাফত কমিটির প্রথম সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, বৃটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার মর্যাদা রক্ষার কোনো প্রতিশ্রুতি না দিলে মুসলমানরা সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতি অনুসরণ করবে। প্রয়োজনে তারা বৃটিশ পণ্যও বর্জন করবে। মহাত্মা গান্ধী যিনি এ সময় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে ছিলেন তিনি কয়েকজন কংগ্রেস নেতাসহ উক্ত খিলাফত সম্মেলনে যোগ দেন। তিনি খেলাফতের বিষয়ে কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাওলানা মোহম্মদ আলীর নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন খিলাফতের ভবিষ্যৎ আলোচনার জন্য লন্ডন ও প্যারিস সফর করেন। কিন্তু বৃটেন অথবা মিত্রপক্ষের কেউই এ ডেপুটেশনকে কোনো বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি। ফলে প্রতিনিধিরা ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে আসলে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র এবং জোরদার হয়। ১৯২০ সালের ১৯ মার্চ সারা ভারতে খিলাফতের দাবিতে হরতাল পালিত হয়। মে মাসে বোম্বেতে খেলাফত কমিটির সভায় বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। জুন মাসে এলাহাবাদে খিলাফত কমিটির আহবানে হিন্দু ও মুসলিম নেতাদের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি চূড়ান্ত করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

ইতোমধ্যে খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি আরেকটি আন্দোলন কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ সরকার চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে নিবর্তনমূলক রাওলাট

আইন পাশ করে এবং বিনা বিচারে শত শত লোককে কারাবন্দী করে। উক্ত আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ও প্রতিবাদ আন্দোলনের পটভূমিতে সংঘটিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। বৃটিশ জেনারেল ডায়ার নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে প্রায় ৪০০ লোককে হত্যা করে। এতে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব চাঙ্গা হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের জন্য ইতিপূর্বে সৃষ্ট খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করেন। তিনি বৃটিশদের দেয়া 'কায়সার-ই-হিন্দ' উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট সেভার্স চুক্তির পর এর প্রতিবাদে মুসলমানগণ ৩১ আগস্ট খিলাফত দিবস পালন করে। ঐ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের এবং পূর্ণ স্বরাজের দাবির ঘোষণা দেয়া হয়। জাতীয় কংগ্রেস অসহযোগের কর্মসূচি হিসেবে সরকারী চাকুরী ও পদবী ত্যাগ, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ আদালত ও আইন ব্যবসা বর্জন, বিলাতী দ্রব্য পরিহার ইত্যাদি প্রস্তাব গ্রহণ করে। একই সময়ে নাগপুরে খিলাফত কমিটি ও মুসলিম লীগ অসহযোগ আন্দোলনের বিস্তারিত কর্মসূচি অনুমোদন করে এবং স্বরাজ উভয়ের মূল লক্ষ্য বলে ঘোষণা দেয়। ফলে খিলাফত ও অসহযোগ হিন্দু মুসলমানের যৌথ আন্দোলনে পরিণত হয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের শুরুতে উভয় আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং এক চরম অবস্থার সৃষ্টি হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করে, শ্রমিকরা কারখানা ত্যাগ করে, সরকারী চাকুরীতে ভারতীয়রা ইস্তফা দেয় এবং আইনজীবীরা আদালত ছেড়ে চলে যায়। আন্দোলনের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠন গড়া রাজনৈতিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। দমন নীতির অংশরূপে বৃটিশ সরকার হাজার হাজার লোককে গ্রেফতার করে। অনেকে আবার স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। মুসলমানরা বৃটিশ সেনাবাহিনী ত্যাগের হুমকি দেয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে আহমেদাবাদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং সর্বত্র অচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকারকে কর ও খাজনা প্রদান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আন্দোলনের সে চূড়ান্ত পর্যায়ে অহিংসার স্থলে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মালাবারে মোপলা কৃষকরা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার আশ্রয় নেয়। এরপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরা নামক স্থানে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহী ও একজন দারোগাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।

গান্ধী তাঁর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন এভাবে সহিংসায় পরিণত হতে দেখে মর্মাহত হন। কংগ্রেসের বারদালি সম্মেলনে তিনি হঠাৎ সমগ্র আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এতে সারাদেশে হতাশার সৃষ্টি হয়। সরকার শীঘ্রই গান্ধীকে গ্রেফতার করে। অসহযোগ আন্দোলনের অবসানে খিলাফত আন্দোলনও দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক খিলাফত উচ্ছেদ করার পর এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন সফল না হলেও সে গণজাগরণ ছিল অভূতপূর্ব ও অবিস্মরণীয়। উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে আন্দোলন দুটির অবদান ও গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে হিন্দু-মুসলিম যৌথ আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এটাই ছিল প্রথম জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন। তুরস্কের খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার জন্য ভারতের মুসলমানগণ খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেয়। অন্যদিকে অসহযোগের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন দুটি একই সঙ্গে ও যৌথ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। কিন্তু অহিংস পন্থায় আন্দোলন চালানো সম্ভব হচ্ছে না দেখে হঠাৎ গান্ধী আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন। এর ফলে খিলাফত আন্দোলনও শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক খিলাফত প্রতিষ্ঠান বাতিল ঘোষণা করায় ভারতবর্ষে এ আন্দোলন অকেজো হয়ে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন দেশের ঘটনায় খিলাফত আন্দোলনের সূচনা হয়?
ক) বাংলা খ) ভারত গ) ব্রিটেন ঘ) তুরস্ক

২। 'কায়সার-ই-হিন্দ' কার উপাধি?
ক) এ কে ফজলুল হক খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গ) মহাত্মা গান্ধী ঘ) মতিলাল নেহেরু

৩। খিলাফত আন্দোলন চূড়ান্তভাবে বন্ধ হওয়ার কারণ কী?
ক) অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হলে খ) তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় এলে
গ) সরকারের দমন অভিযান শুরু হলে ঘ) খিলাফত নেতাদের বন্দী করলে

৪। অসহযোগ আন্দোলনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল?
ক) অহিংস পদ্ধতিতে খ) হিংসাত্মক কার্যক্রমের মাধ্যমে
গ) গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে ঘ) আইন অমান্য পদ্ধতিতে

সৃজনশীল প্রশ্ন

শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও নির্যাতনমূলক আইন এবং একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে একটি অঞ্চলের দুটি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দুটি পৃথক আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক ঐক্যের মাধ্যমে একত্রিত হয়। এতে উভয় আন্দোলন শাসকগোষ্ঠীকে প্রায় কোনঠাসা করে ফেলে। এক পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন কারণে আন্দোলন দুটি থেমে গেলেও এর ব্যাপক প্রভাব শাসকগোষ্ঠীর অবস্থাকে সংকটাপন্ন করেছিল।

ক. ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কারা পৃথক নির্বাচনের অধিকার লাভ করে? ১
খ. "১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ছিল এক রকম দ্বৈত শাসন।" উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত আন্দোলন দুটি ব্রিটিশ শাসনাধীনে কোন কোন ভারতীয় আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের দুটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১০.৩ বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলন (১৯১১-৩৪ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- আন্দোলনের সাথে জড়িত সংগঠন এবং নেতাদের নাম বলতে পারবেন।
- সশস্ত্র আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বিপ্লব, মাস্টার দা, প্রীতিলতা, দ্বীপান্তর

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে মহারাষ্ট্রে। কিন্তু পরে এ আন্দোলন অধিক জোরদার হয়ে উঠে বাংলায়। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে সরকারী দমন নীতির মোকাবেলায় বাংলার এক শ্রেণির যুবক বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নেয়। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তারা বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করে এবং সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করে। গুপ্ত সমিতিগুলোর মধ্যে 'ঢাকার অনুশীলন সমিতি' ও কলকাতার 'যুগান্তর সমিতি' ছিল প্রধান। সারাদেশে এসব সংগঠনের অনেক শাখা প্রশাখা ছিল। 'যুগান্তর' নামে যুগান্তর

সমিতির একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও বের হতো। এ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীগণ। ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক ছিলেন পুলিন বিহারী দাস। গুপ্ত হত্যা, সন্ত্রাস ও ডাকাতির মাধ্যমে ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে এসব সংগঠনের নেতারা বোমা তৈরি, অস্ত্র সংগ্রহসহ নানাবিধ কাজে জড়িত হয়। পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে দুবার হত্যার চেষ্টা চলে। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করেন এবং একই অপরাধে ধৃত ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। সরকার মানিকতলা বোমা হামলাসহ বিভিন্ন অভিযোগে আরও কয়েকজনকে ফাঁসি দেন এবং অনেককে কারাবন্দী ও দ্বীপান্তর করা হয়। সরকারী দমন নীতির ফলে এবং বিপ্লবী নেতাদের একাধিক ব্যক্তি এ রাজনীতি থেকে সরে পড়ায় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্বেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা থেমে আসে।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিপ্লবী আন্দোলন প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল। ঐ সময় কলকাতার রাজাবাজারে অমৃত হাজরার পরিচালনায় একটি বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতা, যশোর ও খুলনায় অনেকগুলো সশস্ত্র ডাকাতি হয়। একই বছরের শেষ দিকে বিপ্লবী নেতা রাস বিহারী বসুর পরিকল্পনা অনুযায়ী দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জকে লক্ষ করে বোমা ছোঁড়া হয়। কিন্তু তিনি অল্পের জন্য বেঁচে যান। সরকার রাস বিহারীকে ধরার জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলায় বিপ্লবীদের মধ্যে একদল বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে সম্মুখ যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে থেকে ক্ষমতা দখলের নীতি গ্রহণ করে। এঁদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন, ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। নরেন্দ্র নাথ পরে এম.এন.রায় নামে বিখ্যাত হন। তাঁরা ইংরেজ বিরোধী শক্তি জার্মানি থেকে অস্ত্র সাহায্যের আশ্বাস পান। কিন্তু ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের এ চক্রান্তের কথা আগেই জেনে যাওয়ায় জার্মানির জাহাজ আসার পথ রুদ্ধ হয়। এ দিকে বাঘা যতীন ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী উড়িষ্যার বালেশ্বরে জার্মান জাহাজের উপস্থিতির আশায় হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে কলিকাতা থেকে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। বাঘা যতীন ও তাঁর সহকর্মীদের সাথে পুলিশ বাহিনীর গুলি বিনিময়কালে চিত্ত প্রিয় নামের একজন বিপ্লবী নিহত হন। অন্য তিন আহত সহকর্মীসহ বাঘা যতীন ধরা পড়েন এবং বন্দী অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর দুই সহকর্মীর ফাঁসি হয় এবং একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

কিন্তু এসব ব্যর্থতা বিপ্লবীদের হতোদ্যম করেনি। দেশি বিদেশি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হত্যা অব্যাহত ছিল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুরে হত্যা করা হয়। পুলিশের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ লেগে থাকত প্রায়ই। ১৯১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ভারত প্রতিরক্ষা আইনে অনেককে গ্রেফতার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এদের মুক্তি দেয়া হয়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার পর বাংলায় আবার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয়। পর বছর 'লাল বাংলা' শীর্ষক প্রচার পত্রে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার আহবান জানানো হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোপীনাথ সাহা নামে জনৈক বিপ্লবী কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে মি: ডে নামে সাহেবকে হত্যা করে। উক্ত ঘটনায় গোপীনাথের ফাঁসি হয়। সে বছরের মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরির এক গোপন কারখানা আবিষ্কৃত হয়। আলিপুর জেলের সুপার বন্দি বিপ্লবীদের পরিদর্শন করতে গেলে প্রমোদ চৌধুরী তাঁকে লোহার রড় দিয়ে হত্যা করে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারী করে বহু বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করেন। এর ফলে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ অনেকাংশে হ্রাস পায়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ পুনরায় বাড়ে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সূর্যসেন, যিনি মাস্টার দা নামে অধিক পরিচিত, তাঁর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। সূর্যসেনের সহযোগী ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ ও অন্যান্য বহু বিপ্লবী। জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে, তাতে সূর্যসেনের ১২জন সঙ্গীর মৃত্যু হয়। সেনাবাহিনীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন বাংলার যুব সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং একের পর এক নানা সংঘর্ষ ঘটতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্র বিনয় বসু পুলিশের বড় সাহেব লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করে। বহুদিন আত্মগোপন করার পর অবশেষে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সূর্যসেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। কলকাতায় যুগান্তর দলও এ সময় সক্রিয় ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ আগস্ট ডালহৌসী স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার আরো একটি চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। বিনয় ও বাদল এর পর আত্মঘাতী হন এবং পুলিশের হাতে ধরা পাড়ার পর দীনেশের ফাঁসি হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার চট্টগ্রামের

পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন ও দেশের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। ঐ বছরই বীনা দাস বাংলার গভর্নর জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টা করেন। তাঁর সে চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ হয় এবং তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ দিকে মেদেনীপুরে ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পর পর তিনজন ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডি, বরার্ট ডগলাস এবং বার্জ বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স নামের বিপ্লবী উপদলের হাতে নিহত হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায় এবং বিপ্লবীদের রাজনৈতিক কর্মধারা ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ প্রীতিলতার বিপ্লবী জীবনের উপর একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিণতিতে বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। প্রধান দুটি সংগঠন যুগান্তর সমিতি ও অনুশীলন সমিতি বিপ্লবী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ কাজ করে। সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে বাংলার অসংখ্য যুবক এ আন্দোলনে অংশ নেয় এবং জীবন উৎসর্গ করে। সরকারকে সন্ত্রস্ত করার জন্য বিপ্লবীরা পুলিশ কর্মকর্তাসহ বহু সরকারী অফিসারকে হত্যা করে। বিদেশি সাহায্য নিয়ে অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টাও করা হয়েছিল। কিন্তু এসবই ব্যর্থ হয়। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের পর বাংলার বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠন কে ছিলেন?
ক) অরবিন্দ ঘোষ খ) বারীন্দ্র ঘোষ গ) পুলিন বিহারী দাস ঘ) ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত

২। বাঘা যতীন কীভাবে মারা যান?
ক) পুলিশের সাথে সংঘর্ষে খ) ফাঁসির দন্ড পেয়ে
গ) কারাগারে বন্দী অবস্থায় ঘ) আত্মঘাতি বোমার বিস্ফোরণে

৩। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
ক) সূর্য সেন খ) গনেশ ঘোষ গ) প্রীতিলতা ঘ) লোকনাথ বল

৪। 'মাস্টার দা' নামে কোন নেতা পরিচিত?
ক) এম এন রায় খ) রাসবিহারী বসু গ) পুলিন বিহারী দাস ঘ) সূর্যসেন

পাঠ-১০.৪ ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- উক্ত আইনের গুরুত্ব বা ত্রুটি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভারত শাসন আইন, দ্বৈত শাসন, হস্তান্তর, সংরক্ষিত

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। লক্ষ্ণৌচুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে এক যৌথ দাবিনামা সরকারের নিকট পেশ করে। এ দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং ভারতবাসীকে আরো অধিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার আইন সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই লক্ষে ভারত সচিব মন্টেগু ও ভারতের বড়লাট চেমসফোর্ড একটি

পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এর ভিত্তিতেই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আইন পাস করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ সংস্কার আইন 'মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার' আইন নামে পরিচিতি।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্যাদি যথাসম্ভব সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক, মুদ্রা, বাণিজ্য, রেল ও ডাক প্রভৃতি সর্বভারতীয় বিষয়গুলো ন্যস্ত করা হয়। প্রদেশের হাতে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা, বিচার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জেল, সেচ, স্থানীয় সরকার প্রভৃতির দায়িত্ব রাখা হয়। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সরকারী আয় ও বণ্টন করে দেয়া হয়।

এ আইনে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পূর্বের ন্যায় ভারতের বড়লাট ও ভারত সচিব বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন, ভারতীয় আইন সভার নিকট নয়। ভারতের কেন্দ্রীয় আইন সভাকে পুনর্গঠন করে রাষ্ট্র পরিষদ ও আইন পরিষদ নামে দুটি কক্ষে ভাগ করা হয়। রাষ্ট্রপরিষদ বা উচ্চকক্ষের সদস্যসংখ্যা ৬০ জনে নির্ধারিত করা হয়, এর মধ্যে ৩৪ জন নির্বাচিত সদস্য ও বাকী ২৬ জন বড়লাট কর্তৃক মনোনীত হবেন। আইন পরিষদ বা নিম্নকক্ষের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ১৪৫ জনে, এদের মধ্যে ১০৫ জন নির্বাচিত এবং বাকীরা মনোনীত হবেন। মনোনীতদের মধ্যে ২৬ জন সরকারী কর্মচারী এবং অবশিষ্ট হবেন বেসরকারী সদস্য। রাষ্ট্রপরিষদ ও আইন পরিষদের মেয়াদ যথাক্রমে ৫ ও ৩ বছর করা হয়। রাষ্ট্র পরিষদেই সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এ আইনে মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও পাঞ্জাবের শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়গণও পৃথক নির্বাচনের সুযোগ ও অধিকার লাভ করে।

যদিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছিল, তথাপি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদকে সমগ্র ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়। কোন কোন বিষয়ে আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপনের পূর্বে বড়লাটের অনুমতি নেয়ার বিধান রাখা হয়। অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তাব একমাত্র আইন পরিষদেরই বিবেচনার এখতিয়ার নির্ধারিত হয়। তবে কোন বিল বা আইনের খসড়া আইন পরিষদে অগ্রাহ্য হলেও বড়লাট তা কার্যকরী করতে পারতেন। ফলে এ বিষয়ে আইন পরিষদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী বার্মা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ মোট দশটি গভর্নর শাসিত প্রদেশ ছিল। প্রচুর ক্ষমতা ও সুযোগ সুবিধার অধিকারী গভর্নর প্রদেশের যথার্থ কর্তৃত্বের অধিকারী হন। প্রাদেশিক শাসন কার্য 'সংরক্ষিত' ও 'হস্তান্তরিত'-এ দুভাগে ভাগ হয়ে এক ধরনের দ্বৈত শাসনের সূত্রপাত ঘটায়। আইন-শৃংখলা, অর্থ, পূর্ত, বিচার, রাজস্ব প্রভৃতি বিষয়গুলো সংরক্ষিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং গভর্নর ও তাঁর শাসন পরিষদ কর্তৃক শাসিত হতো। পক্ষান্তরে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় শাসন প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয়াদির অধীনে থাকে। গভর্নর তাঁর মন্ত্রীসভার পরামর্শক্রমে এগুলো শাসন ও পরিচালনা করবেন। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য মন্ত্রীসভা প্রাদেশিক আইন সভার নিকট দায়ী ছিল। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত উভয় বিষয়গুলোর উপর গভর্নরের অবাধ কর্তৃত্ব বহাল রাখা হয়। গভর্নর প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যগণের মধ্য হতে যেকোন সদস্যকে মন্ত্রী নিয়োগ করার অধিকারী হন।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলোতে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এর সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। তা ছাড়া এ আইনে প্রাদেশিক আইন পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা শতকরা ৭০ জনের কম এবং সরকারী সদস্যের সংখ্যা ২০ জনের অধিক হবে না বলা হয়।

এ আইনে ইংল্যান্ডে ভারতীয় হাই কমিশনার পদের সৃষ্টি হয়। তিনি সেখানে ভারতীয় ছাত্র ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করতেন। ভারত সরকার কর্তৃক তিনি ৫ বছরের জন্য নিয়োগ পেতেন।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দিক থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ছিল নি:সন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রথমত, এ আইন দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রথা চালু হয় এবং ভোটাধিকারও সম্প্রসারিত হয়। দ্বিতীয়ত, আইন সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীপরিষদ এর মাধ্যমে গঠিত হয়। এসব মন্ত্রীরা ছিলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও বেসরকারী ব্যক্তি। সুতরাং এতে দায়িত্বশীল সরকারের সূচনা হয়েছিল বলা যায়। তৃতীয়ত, এ আইনের ফলে ভারতীয় জনগণ রাজনৈতিক জ্ঞান ও শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পায়।

তবে এ আইনের সমালোচনাও ছিল। কংগ্রেস অধিবেশনে এ আইনকে অপর্যাপ্ত ও নৈরাশ্যজনক বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবে বিচার করলে কেন্দ্র ও প্রদেশের শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে এ আইনের ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমত, সর্বক্ষেত্রেই কার্যনির্বাহক পরিষদ আইনসভার নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, প্রদেশের শাসনকার্য সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এ দুভাগে ভাগ করে একদিকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব ও অন্যদিকে দায়িত্বহীন ক্ষমতা অর্পনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নষ্ট হয়। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের পথে এটা অন্তরায় সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের উপর একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ব্যর্থতা নতুনভাবে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিকে জোরালো করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌচুক্তি নামে এক যৌথ দাবিনামায় ভারতীয়দের পক্ষ থেকে নিজেদের কথা তুলে ধরেন। পরবর্তী সময়ে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার বা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে ঐ দাবিনামার কিছু বৃটিশ সরকার বিবেচনা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ভারতীয়দের কোনো দাবিই গৃহীত হয় নি। বস্তুত ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইনে এক প্রকার এককেন্দ্রিক শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অন্য কী নামে পরিচিত ছিল?
ক) স্বায়ত্ত শাসন আইন খ) ভারত স্বাধীনতা আইন
গ) মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন ঘ) মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন

২। ভারত শাসন আইন ১৯১৯-এ রাষ্ট্র পরিষদের সদস্য সংখ্যা কতজন নির্ধারিত হয়?
ক) ৪০ খ) ৬০ গ) ১০৫ ঘ) ১৪৫

৩। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে গভর্নর শাসিত প্রদেশের সংখ্যা কত?
ক) ৩ খ) ৫ গ) ১০ ঘ) ১৪

৪। মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইনের প্রাদেশিক শাসনে কোনটি হস্তান্তরিত বিষয়?
ক) স্থানীয় প্রশাসন খ) পূর্ত বিভাগ গ) বিচার বিভাগ ঘ) রাজস্ব আদায়

পাঠ-১০.৫ বেঙ্গল প্যাক্ট, ১৯২৩ খ্রি.

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বেঙ্গল প্যাক্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বেঙ্গল প্যাক্টের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বেঙ্গল প্যাক্ট, দেশবন্ধু, সংরক্ষিত চাকুরী

স্বরাজ্য দলের নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং বাঙালি মুসলিম নেতা সিলেটের অধিবাসী আবদুল করিম ছিলেন ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা। উদার চিত্ত রাজনীতিক দেশবন্ধু অনুভব করেছিলেন যে, মুসলমানদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন সম্ভব নয়। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা ও নায্য দাবি পূরণে উদার মনোভাব প্রদর্শন করেন এবং সে কারণে রাজনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ফরোয়ার্ড পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বাংলার মুসলমানদেরকে তাদের নায্য হিস্যা দিতে হবে। তারা সুযোগ্য হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুক- এ দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এ যুক্তি দিয়েই বিদেশি শক্তি হিন্দু-মুসলমান উভয়কেই শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে রেখেছে। চিত্তরঞ্জন দাস বাংলার মুসলমানদের নেতা ফজলুল হক ও

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং হিন্দু-মুসলমানদের দাবি দাওয়ার ব্যাপারে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেন। এ চুক্তি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'বাংলা চুক্তি' নামে পরিচিত।

অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের মতানৈক্য হয়। সি.আর.দাস ও তাঁর সমর্থকগণ ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোতে যোগদানের পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁরা আইনসভায় প্রতিবন্ধকতামূলক নীতি অবলম্বন করে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সংস্কার আইন অচল করে দিতে চেয়েছিলেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তাঁর দেয়া উক্ত প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এতে ব্যর্থ হয়ে তিনি মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খানকে নিয়ে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে স্বরাজ্য পার্টির সমর্থকগণ বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সি.আর. দাস ও সুভাষ বসু যথাক্রমে এর সভাপতি ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ছিলেন একজন দূরদর্শী ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ। তিনি বুঝেছিলেন যে ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমানদের সমর্থন লাভ করতে পারলে তিনি সেখানে তাঁর 'প্রতিবন্ধক নীতি' কার্যকরী করতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের নায্য অধিকার স্বীকার করতেন এবং স্বরাজ লাভে তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন যে অত্যাবশ্যক তা বিশ্বাস করতেন। ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী সহ কয়েকজন মুসলিম নেতার সঙ্গে তিনি মত বিনিময় করেন এবং শেষে তাঁদের সঙ্গে বেঙ্গল প্যাক্ট নামক রাজনৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর এটি স্বরাজ্য পার্টির কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ঐক্যমতে আসেন যে, যখন স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এ চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার ভোগ করবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থায় বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের বিধান থাকবে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘুরা পাবে শতকরা ৪০টি আসন। মুসলমানদের জন্য সরকারি চাকুরীর ৫৫% সংরক্ষিত থাকবে এবং যে পর্যন্ত তারা এ সংরক্ষিত পর্যায়ে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে শতকরা ৮০ জনকে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে। এ ক্ষেত্রে নূন্যতম যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদেরকে চাকুরীতে নেয়া হবে। পরে মুসলমানগণ চাকুরীর ৫৫% ও অসুমলমানরা ৪৫% লাভ করবে। আইন পরিষদে যেকোন সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন না থাকলে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কীয় কোনো আইন গৃহীত হবে না। মসজিদের সামনে গান বাজনা ও শোভাযাত্রা করা চলবে না এবং ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য গরু জবাই করা হলে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

উপরিউক্ত চুক্তির ফলে সি.আর. দাসের হাত শক্তিশালী হয়। ফলে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মুসলমানদের সংরক্ষিত ৩৯টি আসনের মধ্যে এ দল ১৯টি লাভ করে এবং পরে আরো দুজন এতে যোগ দেয়। পরের বছর কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে স্বরাজ্য পার্টি ৭৫টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৫৫টি লাভ করে। সি.আর. দাস মেয়র এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। বেঙ্গল প্যাক্টের শর্ত অনুযায়ী কলকাতা কর্পোরেশনের চাকুরিতে কতিপয় মুসলমানকে নিয়োগ করা হয়। মুসলমানদের সমর্থন লাভ করার ফলে আইন সভায় স্বরাজ্য পার্টির একটি শক্ত ভিত গড়ে উঠে এবং সি.আর. দাস সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপে বাধা দিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর বিপক্ষ দল এতে নিশ্চুপ ছিল না। খান বাহাদুর মোশাররফ হোসেনকে দিয়ে সরকার স্বরাজ্য পার্টি বহির্ভূত মুসলমানদেরকে এর বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়।

এ চুক্তির ফলে স্বভাবতই মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ খুশী হন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত ও জমিদার শ্রেণি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র বেঙ্গল প্যাক্টের বিরূপ সমালোচনা করে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের কোকনাদ অধিবেশনে এ চুক্তি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রদর্শিত হয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কোনো পৃথক প্রাদেশিক চুক্তি মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সি.আর দাসের মৃত্যুর পর বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হয়ে যায়। বাংলায় হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান করতে চেয়ে তিনি যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন তাঁর অনুসারীরা সেটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। স্বরাজ্য পার্টির কর্মসূচির মধ্যে অনেক পরিবর্তনের ফলে হিন্দু মুসলমান সভ্যদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। সাম্প্রদায়িকতা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এর ফলে হিন্দু মুসলিম ঐক্যে ভাঙ্গন ধরে এবং সি.আর. দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট অচল হয়ে পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রূপকার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জীবনের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতা ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি চুক্তি হয়। এ চুক্তিই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। এ চুক্তিতে মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু বেশি সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুতে এবং কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরোধিতার কারণে এ চুক্তি অকার্যকর হয়ে পড়ে। রাজনীতিতে পুনরায় সাম্প্রদায়িকতা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। স্বরাজ্য পার্টি গঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯২২ খ) ১৯২৩ গ) ১৯২৪ ঘ) ১৯২৫

২। বেঙ্গল প্যাক্টের উদ্যোক্তা কে?

i. চিত্তরঞ্জন দাস ii. আবদুল করিম iii. সুভাষ বসু

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। স্বরাজ্য পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন কে?

ক) মতিলাল নেহেরু খ) হাকিম আজমল গ) সি আর দাস ঘ) সুভাষ বসু

৪। বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেন কে?

i. চিত্তরঞ্জন দাস ii. এ কে ফজলুল হক iii. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৬ নেহেরু রিপোর্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নেহেরু রিপোর্ট কেন তৈরি হয়েছিল, তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- নেহেরু রিপোর্টের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- নেহেরু রিপোর্টের প্রতি বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	নেহেরু রিপোর্ট, ডোমিনিয়ন, যৌথ নির্বাচন

উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক বিকাশের ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট এক মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বেসরকারী উদ্যোগে ভারতের জন্য সংবিধানের খসড়া রচনার ভার পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটির উপর অর্পিত হয়। উক্ত কমিটির সুপারিশ ভিত্তিক দলিল 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। এ বিষয়ে পুনরায় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড আরউইন জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি পার্লামেন্টারি কমিশন নিয়োগ

করেন। কিন্তু সাইমন কমিশনে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব না থাকায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এ কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং যেদিন উক্ত কমিশনের সদস্যরা ভারতে পদার্পণ করেন সেদিন হরতাল আহবান করা হয় এবং 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি উত্থিত হয়। ইত্যবসরে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি বিধানে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ একের পর এক প্রয়াস চালিয়ে যান। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য দলের সাথে মত বিনিময় করে একটি 'স্বরাজ শাসনতন্ত্র'-এর খসড়া প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে মুসলিম লীগও একটি সাব কমিটি গঠন করে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের খসড়ায় নিজেদের দাবি দাওয়া যাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তার ব্যবস্থা করে। পরে সব দলের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কংগ্রেস একটি সর্বদলীয় সভা ডাকে।

ইতোমধ্যে ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতীয়দের সর্বসম্মত একটি শাসনতন্ত্র রচনার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এ লক্ষ্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে এলাহাবাদে সর্বদলীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে বিরোধের কারণে কোন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয় না। ১৯ মে তৃতীয় বারের মতো সর্বদলীয় সম্মেলন বসে বোম্বেতে। উক্ত সম্মেলনে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ কমিটিতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা ছিলেন এবং কমিটির নেতৃত্ব দেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। কমিটির প্রস্তাবে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে কতগুলো দাবি চূড়ান্ত করা হয়।

নেহেরু রিপোর্ট

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের নেহেরু রিপোর্টে ভারতের জন্য পূর্ণ ডোমিনিয়নের মর্যাদা দাবি করা হয়। দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট একটি আইন সভা গঠনের প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবিত আইন সভার ক্ষমতা হবে সর্বোচ্চ এবং শাসন বিভাগের উপর আইন সভার পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রদেশগুলোর ক্ষেত্রে ও দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয় এবং কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে দেয়া হয়। প্রদেশগুলোতে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নিম্নকক্ষ ও প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলো জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হবে। আগেকার সমস্ত আইনে স্বতন্ত্র নির্বাচনের যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল এ প্রস্তাবে তা প্রত্যাহার করে যৌথ নির্বাচন নীতি গ্রহণ করা হয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নি। তবে কেন্দ্র ও অমুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য কোনো আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা ছিল না। আপাতত দশ বছরের জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে আসন সংরক্ষণ প্রথা চালু থাকবে। ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের পর সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে আলাদা প্রদেশরূপে স্বীকৃতি দিয়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মর্যাদা প্রদান করা হবে। তবে সেখানে অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত থাকবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তার কথা বলা হয়।

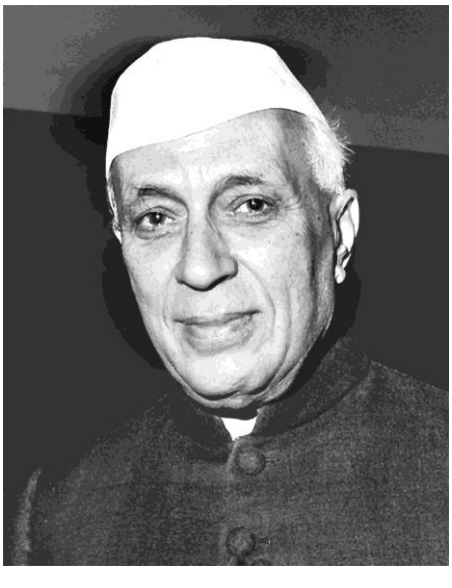

জরহরলাল নেহেরু

নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো পৃথকভাবে এ রিপোর্টের বিচার বিবেচনা করে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক সমিতি নেহেরু রিপোর্টের প্রস্তাবগুলোর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। তবে জওহরলাল নেহেরু এ রিপোর্টে পূর্ণ স্বরাজের বদলে ডোমিনিয়ন মর্যাদা মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কংগ্রেস সচিবের পদ থেকে ইস্তফা দেন।

কিছু শিখ নেতৃবৃন্দ রিপোর্টে প্রস্তাবিত সাম্প্রদায়িক ধারাগুলো গ্রহণে অসম্মত হন। সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের বিশেষ অধিকারগুলো স্বীকৃত না হওয়ায় হরিজনেরা অসন্তুষ্ট হয়। নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা এবং বিভিন্ন দলের মতামত

গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতায় যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে মুসলিম লীগের পক্ষে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নেহেরু রিপোর্ট সংশোধনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব আনেন। এগুলো ছিল-

১. কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আসন;

২. প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ;

৩. প্রদেশগুলোর জন্য রেসিড্যুয়ারি ক্ষমতা;

৪. বোম্বে থেকে সিন্ধুর পৃথকীকরণ।

কিন্তু হিন্দু মহাসভা এসব দাবি মানতে কোনভাবেই রাজী ছিল না। কংগ্রেসও জিন্নাহ্‌র প্রস্তাবগুলোর বিরোধিতা করে। কোনো সমঝোতা না হওয়ায় মুসলিম লীগ নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। লীগ নেতৃবৃন্দ এ রিপোর্টকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করে একে প্রত্যাখ্যান করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ নেহেরু রিপোর্টের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে নেহেরু রিপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানদের সমঝোতার লক্ষ্যে এবং ভারত সচিব বার্কেনহেড-এর দেয়া চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির দাবিনামা নেহেরু রিপোর্ট নামে পরিচিত। ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সম্মিলিত উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সাইমন কমিশনে প্রতিনিধিত্ব করেছিল শুধু–
- ক) মুসলিম লীগ
- খ) কংগ্রেস
- গ) দেশীয় রাজ্য
- ঘ) ব্রিটিশ

২। নেহেরু রিপোর্টের প্রস্তাব কোনটি?
- ক) যৌথ নির্বাচন নীতি চালু করা
- খ) প্রদেশে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রণয়ন করা
- গ) কেন্দ্রে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রণয়ন করা
- ঘ) ভারতে পূর্ণ স্বরাজ চালু করা

৩। নেহেরু রিপোর্ট প্রণীত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
- ক) ১৯২৭
- খ) ১৯২৮
- গ) ১৯২৯
- ঘ) ১৯৩০

৪। 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনিটি কেন উঠেছিল?
- ক) মুসলিম লীগের কোন প্রতিনিধি কমিশন ছিল না
- খ) কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি কমিশনে ছিল না
- গ) ভারতীয় কোন প্রতিনিধি কমিশনে ছিল না
- ঘ) কমিশনের রিপোর্ট ভারতীয়দের পছন্দ হয় নি

পাঠ-১০.৭ জিন্নাহর চৌদ্দ দফা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর চৌদ্দ দফা কোন পরিস্থিতিতে উত্থাপিত হয়েছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- চৌদ্দ দফার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- চৌদ্দ দফা দাবির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	জিন্নাহ, চৌদ্দ দফা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, মুসলিম

বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা দাবি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নেহেরু রিপোর্টে ভারতীয় মুসলমানদের দাবি দাওয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শিত হওয়ায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ্ মুসলিমলীগের পক্ষ থেকে তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র রচনার যে প্রয়াস সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত হয়, চৌদ্দ দফা দাবি সে ক্ষেত্রে ছিল আরেকটি সংযোজন।

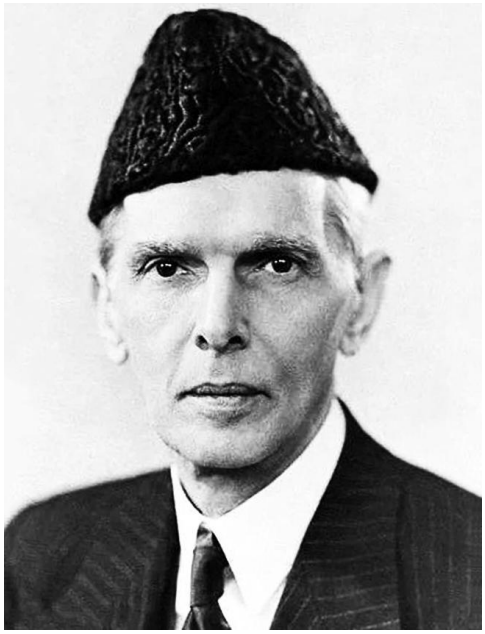
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

আপনারা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছেন রাজকীয় সাইমন কমিশন বয়কটের পাশাপাশি ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্যোগে শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। নেহেরু রিপোর্ট নামে উক্ত কমিটির সুপারিশে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন এবং আইনসভায় আসন সংরক্ষণের স্বীকৃতি না থাকায় মুসলিম লীগ সে রিপোর্ট গ্রহণ করতে রাজী হয় নি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে কলকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ লীগের পক্ষ থেকে কিছু সংশোধনী আনেন। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলমানদের জন্য তিন ভাগের এক ভাগ আসন সংরক্ষণ, রেসিড্যুয়ারি বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেয়া ইত্যাদি ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হিন্দু মহাসভাসহ অন্যান্যরা জিন্নাহ্‌র প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় জিন্নাহ্ একে হিন্দু মুসলমানের পথের বিভক্তি বলে আখ্যায়িত করেন। তেজ বাহাদুর সাপ্রু জিন্নাহর প্রস্তাব মেনে নিয়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু বহু সদস্য তাতে রাজী না হওয়ায় সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হলো না। এ দিকে জিন্নাহ্ শীঘ্রই মুসলমানদের দাবিসমূহ বিন্যস্ত করেন, যা তাঁর চৌদ্দ দফা নামে খ্যাত। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ্ তাঁর বিখ্যাত চৌদ্দ দফা পেশ করেন। দফাগুলো নিম্নরূপ —

১. ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের গঠন হবে ফেডারেল পদ্ধতির। রেসিড্যুয়ারি বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে।
২. সব প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।
৩. প্রদেশসমূহের আইন পরিষদে ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থায় সংখ্যালঘুদের যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। তবে সে প্রতিনিধিত্বের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয় সে দিকে নজর দিতে হবে।
৪. কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের কম হবে না।
৫. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করলে পৃথক নির্বাচনের বদলে যেকোনো সময় যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবে।

৬. ভূখণ্ডগত কোনো পুনর্গঠন দ্বারা পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ক্ষুণ্ন করা যাবে না।
৭. সকল সম্প্রদায়ের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও শিক্ষার অধিকার দিতে হবে।
৮. কোনো সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ছাড়া কোনো আইন পরিষদ বা নির্বাচিত সংস্থায় উক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো আইন বা প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।
৯. সিন্ধুকে বোম্বে প্রেসিডেন্সি থেকে পৃথক করতে হবে।
১০. ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।
১১. সমস্ত রাষ্ট্রীয় ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের চাকুরীতে যোগ্যতা অনুসারে অন্যান্য ভারতীয়দের ন্যায় পর্যাপ্ত হারে মুসলমানদের নিয়োগ করতে হবে।
১২. মুসলমানদের সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন শাসনতন্ত্রে থাকতে হবে।
১৩. কমপক্ষে সংখ্যানুপাতিক এক তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী ছাড়া কেন্দ্র বা কোনো প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করা যাবে না।
১৪. ভারত ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত সব রাজ্যের সম্মতিছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক শাসনতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না।

চৌদ্দ দফার গুরুত্ব

হিন্দু মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সফল হতে না পেরে শেষ পর্যন্ত উপরিউক্ত চৌদ্দ দফা দাবিনামা তৈরি করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ দাবিগুলো ছিল নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদস্বরূপ। এগুলো বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌচুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাংখা বাস্তবায়নের যে শর্তাদি প্রদত্ত হয়েছিল তার প্রতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও তাদের মিত্রদের অশ্রদ্ধা ও অনীহা ভারতের মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের নেহেরু রিপোর্ট ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই সৃষ্টি করে অধিক। তবে এতে মুসলমানদের একটা লাভ হয়েছে যে, ইতিপূর্বে বিভক্ত মুসলিম উপদলসমূহ এখন থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনীতিতে অংশ নেয়। তাছাড়া পরবর্তীকালে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মূলত জিন্নাহ্র চৌদ্দ দফার উপর ভিত্তি করেই প্রণীত হয়েছিল ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। কাজেই চৌদ্দ দফা দাবির গুরুত্ব ছিল অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	চৌদ্দ দফা জিন্নাহ কেন প্রণয়ন করেছিলেন তার পটভূমি ব্যাখ্যা করে শিক্ষার্থীগণ একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সংবিধানের যে খসড়া প্রণীত হয়েছিল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে, এটি নেহেরু রিপোর্ট নামে খ্যাত। শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচনের দাবির মতো বিষয় নিয়ে যে অনৈক্য সৃষ্টি হয় এর ফলে হিন্দু মুসলমানদের রাজনৈতিক পথ আলাদা হবার উপক্রম হয়। জিন্নাহ্ মুসলিম লীগের পক্ষে মুসলমানদের দাবিগুলো বিন্যস্ত করেছেন চৌদ্দ দফা নামে। উক্ত দফাগুলোতে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন দাবি সন্নিবেশিত হয়। কিন্তু এর একটা বড় ফল ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিন্ন পথে মোড় নেয়া। শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক চেতনার ফলে ভারত বিভক্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মুসলিম লীগের কোন কাউন্সিল অধিবেশনে জিন্নাহ চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করেন?

ক) দিল্লী খ) পাঞ্জাব
গ) সিন্ধু ঘ) বোম্বে

২। বোম্বে থেকে সিন্ধুর পৃথকীকরণ কে চেয়েছিলেন?
ক) তেজ বাহাদুর সাপ্রু খ) মতিলাল নেহেরু
গ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) জওহরলাল নেহেরু

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন
প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সমস্যা শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রোউইলসন ১৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

৩। ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উক্ত সংখ্যক দফা পেশ করেন–
ক) মতিলাল নেহেরু খ) মহাত্মা গান্ধী
গ) জওহরলাল নেহেরু ঘ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

৪। উক্ত নেতা কত খ্রিস্টাব্দে দফাগুলো পেশ করে–
ক) ১৯২৭ খ) ১৯২৮
গ) ১৯২৯ ঘ) ১৯৩০

পাঠ-১০.৮ গোল টেবিল বৈঠক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে আহূত গোল টেবিল বৈঠকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যা আলোচিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- গোল টেবিল বৈঠকের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	গোল টেবিল, গান্ধী- আর.উইন চুক্তি, পৃথক নির্বাচন, সংখ্যালঘু

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে 'আইন অমান্য আন্দোলন' চলছিল। সে বছরের মে মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল এ রিপোর্টের সুপারিশ গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। সে অবস্থায় বৃটিশ সরকার লন্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে এক গোল টেবিল বৈঠক আহবান করেন। উদ্দেশ্য ভারতে বিরাজমান পরিস্থিতি ও সংকটের নিরসনকল্পে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং ভারতের ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা প্রণয়ন করা। আহূত বৈঠক তিনটি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১২ নভেম্বর। অধিবেশনে বৃটেনের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে ১৬, ভারতীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে ১৩ এবং বৃটিশ শাসিত ভারত থেকে ৫৭ জন সহ সর্বমোট ৮৯ জন সদস্য যোগ দেন। কংগ্রেস এ অধিবেশনে যোগ দেয় নি। উপস্থিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. আম্বেদকার, মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এবং তেজ বাহাদুর সাপ্রু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে মেকডোনাল্ড এ বৈঠকে কতগুলো সংবিধানিক প্রস্তাব দেন; তার মধ্যে ১. ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন, ২. প্রদেশগুলোতে দায়িত্বশীল সরকার এবং ৩. কেন্দ্রে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো অন্যতম।

ভারতের রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিরা মোটামুটিভাবে প্রস্তাবগুলো মেনে নেন। কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিরা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমান সম্প্রদায়ের ন্যূনতম দাবি হিসেবে তাঁর চৌদ্দ দফা দাবির পুনরুল্লেখ করেন। তপসিলী সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ডক্টর আম্বেদকারও পৃথক নির্বাচনের দাবি করেন। হিন্দু প্রতিনিধিরা

যৌথ নির্বাচনের পক্ষে ছিলেন, যদিও তাঁরা সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষন নীতি সমর্থন করেন। যা হোক, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মতদ্বৈততার কারণে কংগ্রেস এ বৈঠক বর্জন করায় গোল টেবিল বৈঠক মুলতবি হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক

গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসের একক প্রতিনিধিরূপে এম. কে গান্ধী এ বৈঠকে যোগদান করেন। ফেডারেল ব্যবস্থা ও সংখ্যলঘু প্রশ্ন-এ দুটি ছিল বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয়। শুরুতে গান্ধী কংগ্রেসকে ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্বের একমাত্র দাবিদার বললে উপস্থিত অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সম্মিলিতভাবে এর কড়া প্রতিবাদ জানান। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের ব্যাপারে এর পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থাকে। কিন্তু গান্ধী এতে রাজী ছিলেন না। তিনি বরং অবিলম্বে কেন্দ্রে ও প্রদেশে একই সঙ্গে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতারও তিনি বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংখ্যলঘুদের প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়। ফলে গান্ধীর প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যেই মুসলমান, শিখ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ আসন সংরক্ষণের দাবি জানায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ বিবৃতির মাধ্যমে পৃথক নির্বাচন প্রথা বহাল রাখার আবেদন করেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় নি। গান্ধী শত চেষ্টা করেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের স্বমতে আনতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি মেকডোনাল্ড ঘোষণা করেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হলে সংবিধান রচনা করা সম্ভব নয়। ভারতবাসী এ বিষয়ে একমত হলেই তবে বৃটিশ সরকারের কিছু করণীয় আছে। এভাবে কোনো সমস্যারই সঠিক সমাধান দিতে পারে নি গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন। ফেডারেল পদ্ধতি, সম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়, কেন্দ্র-প্রদেশ সম্পর্ক এ সব সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি। এসব সমস্যা সামনে রেখেই ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ১ ডিসেম্বর গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষ হয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর। ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। আগের দুটি অধিবেশনের তুলনায় অনেক কম প্রতিনিধি এতে অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসও এ অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠায় নি। তিনটি বিষয় এ সম্মেলনে গুরুত্ব লাভ করে, যথা- ১. কি কি শর্তের ভিত্তিতে রাজ্যগুলো ফেডারেশনে যোগ দেবে, ২. অবশিষ্ট ক্ষমতার বণ্টন এবং ৩. বৃটিশ শাসনের গ্যারান্টি। প্রতিনিধিবর্গের অনেক দাবি বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। যা হোক, ভারতে তখনও আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল। ভারতীয় জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্যে বৃটিশ সরকার গোল টেবিল আলোচনার ফলাফল একটি শ্বেতপত্র আকারে প্রকাশ করে। যদিও এসব প্রচেষ্টায় শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোনো সমাধান সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় নি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ঐতিহাসিক গোল টেবিলের আলোকে নিজেদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে একটি গোল টেবিল আলোচনা করবেন।

সারাংশ

নেহেরু রিপোর্টের সুপারিশ মুসলিম লীগ গ্রহণ করে নি। অন্যদিকে সাইমন কমিশনের রিপোর্টও ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অগ্রাহ্য করেন। এর ফলে শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকে আহ্বান করেন। প্রথম বৈঠকে জাতীয় কংগ্রেস অনুপস্থিত থাকে। দ্বিতীয় বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে এম. কে গান্ধী যোগদান করেন। কিন্তু আইন সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষণ ও পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার দাবি কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস না থাকায় শেষ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত বা চুক্তি কিছুই অর্জন সম্ভব হয় নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯২৯ খ) ১৯৩০ গ) ১৯৩১ ঘ) ১৯৩২

২। ব্রিটিশ শাসনামলে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত সাংবিধানিক প্রস্তাব কী?
i. যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন
ii. প্রদেশে দায়িত্বশীল সরকার
iii. কেন্দ্রে আংশিক দায়িত্বশীল সরকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
একটি অঞ্চলের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর দেশে পরপর কয়েকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত কোনো শাসনতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত না হওয়ায় উক্ত বৈঠক ব্যর্থ হয়।

৩। বর্ণিত বৈঠকটির নাম কী?
i. প্রথম গোল টেবিল বৈঠক
ii. দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক
iii. তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। উক্ত বৈঠকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন কে?
ক) ড. আম্বেদকার খ) তেজ বাহাদুর সাপ্রু গ) মহাত্মা গান্ধী ঘ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

পাঠ-১০.৯ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ (১৯৩২ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ কেন ঘোষিত হয়েছিল, বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, মুসলমান, শিখ, হরিজন

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের কার্যকারিতা নিরূপণ এবং শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের ক্ষেত্রে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন নিয়োগ করে। কিন্তু ভারতের সব রাজনৈতিক দল একে বয়কট করায় কমিশনের রিপোর্ট গ্রহণ করতেও তারা অস্বীকার করে। বৃটিশ সরকার এ সময়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য লন্ডনে এক গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দাবির ক্ষেত্রে সমঝোতার অভাবে এবং কংগ্রেস এ অধিবেশনে যোগ না দেয়ায় উক্ত অধিবেশন ব্যর্থ হয়। পরের বছর অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনের শেষ দিকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড অতি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করেন যে, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেরা নিজেদের গ্রহণযোগ্য ফর্মূলা বের করতে না পারলে বৃটিশ সরকার এককভাবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হবেন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকেও সংখ্যালঘু সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে কোনো মতৈক্য হয় নি। ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন এ সমস্যার সমাধানের জন্যে। তিনি উদ্ভুত পরিস্থিতিতে স্বীয় উদ্যোগে এ রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। এটাই 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' বা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নামে অভিহিত। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট এ রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে নিম্নের সিদ্ধান্তসমূহ আরোপ করে:

১. প্রদেশগুলোর আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন বণ্টন করা হয়।
২. রোয়েদাদে মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও নারী সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিয়ে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ এসব সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনে কেবল সে সম্প্রদায়ের লোকরাই ভোট দেবে। এরা একই সঙ্গে আবার সাধারণ নির্বাচনী এলাকায়ও ভোট দিতে পারবে।
৩. শ্রমিক ও বণিক সংগঠন, জমিদার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও নির্দিষ্ট আসন এবং পৃথক নির্বাচনী এলাকা প্রদান করা হয়।
৪. সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হরিজনদের সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এসব অনুন্নত শ্রেণির হিন্দুদের জন্য পৃথক আসন নির্ধারিত হয়। তাদেরকে একাধারে পৃথক নির্বাচনী এলাকা এবং সাধারণ নির্বাচনী এলাকায় ভোট দানের সুযোগ দেয়া হয়।
৫. হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা দান করে এ রোয়েদাদ।
৬. পাঞ্জাবে শিখ ও বাংলা প্রদেশে ইউরোপিয়ানদেরকে তাদের জনসংখ্যার হারের চেয়ে অধিক আসন বরাদ্দ করা হয়।
৭. বোম্বে প্রদেশে মারাঠীদের জন্য সংরক্ষিত হয় ৭টি আসন। এছাড়া নারীদেরকেও সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে আসন প্রদান করা হয়।
৮. নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারনের সুবিধার্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে দেয়া আসনের সামান্য রদবদল হতে পারে বলে রোয়েদাদে ঘোষণা করা হয়।

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও রাজনৈতিক দল তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। হরিজন সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র নির্বাচনের সুবিধা দেয়ায় হিন্দুদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শিখ সম্প্রদায়ও এর বিরোধিতা করে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রোয়েদাদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন যে, মুসলমানরা অনেক প্রদেশে সংখ্যা লঘু হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যার তুলনায় তাদেরকে বেশি আসন দেয়া হয়েছে। আবার পাঞ্জাব প্রদেশে শিখদের জনসংখ্যার তুলনায় অধিক প্রতিনিধিত্ব দেয়ায় সেখানে হিন্দুদের আসন কমে যায়।

হরিজনদের পৃথক নির্বাচন প্রদানের মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার প্রতিবাদে গান্ধী পুনা কারাগারে আমরন অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশন ধর্মঘট ভারতের সর্বত্র গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর জীবন বাঁচাবার উদ্দেশ্যে হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ড: আম্বেদকারসহ অন্যারা তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সুবিধা ত্যাগ করতে রাজী হন। তাঁরা পুনাতে গান্ধীর সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এটাই পুনা চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে স্থির হয় যে, হরিজনদের জন্য কিছুসংখ্যক আসন নির্দিষ্ট থাকবে। তবে তারা সাধারণ হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত হবেন। কংগ্রেস ও অন্যান্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'জাতির রাজনৈতিক সংহতি বিনাসের চক্রান্ত' বলে আখ্যায়িত করেন।

এ দিকে মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কারণ তাতে মুসলমানদের আসন সংরক্ষণ সম্পর্কিত দাবি পরিপূর্ণভাবে মানা হয় নি। তাছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভার ব্যাপারেও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবে কিছুই উল্লেখ ছিল না। পাঞ্জাব প্রদেশের ব্যাপারে মুসলমানদের আপত্তি ছিল সবচেয়ে বেশি। তবু তারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মেনে নেয়। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের অধিবেশনে বলা হয় যে, যদিও এ সিদ্ধান্ত মুসলিম দাবির তুলনায় অপ্রতুল, তবুও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মুসলমানরা এটা মেনে নিচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের উপর একটি রচনা লিখবেন

সারাংশ

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রত্যাখ্যান করে। এরপর বৃটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লন্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠকে আহবান করেন। দুটি গোল টেবিল বৈঠক শেষেও আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের দাবির বিষয়ে কোন ঐক্যমত হয়নি। তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড এ বিষয়ে সমস্যার সমাধানকল্পে স্বীয় উদ্যেগে এক 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। মুসলমানরা অবশ্য প্রতিবাদ সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পুনা চুক্তি কিসের প্রভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
   i. নারীদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন
   ii. মোহন দাস করম চাদ গান্ধীর আমরন অনশন
   iii. সাম্প্রাদায়িক রোয়েদাদ
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i ও ii খ) i ও iii
   গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে ঘোষিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
   ক) ১৯২৯ খ) ১৯৩০
   গ) ১৯৩১ ঘ) ১৯৩২

৩। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে কাদেরকে সংখ্যালঘু ঘোষণা করে সংরক্ষিত আসন দেয়া হয়?
   ক) মুসলমান খ) শিখ
   গ) ভারতীয় খ্রিস্টান ঘ) হরিজন

৪। বোম্বে প্রদেশে মারাঠীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কতটি ছিল?
   ক) ৫ খ) ৬
   গ) ৭ ঘ) ৮

পাঠ-১০.১০ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন যে পটভূমিতে তৈরি হয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- এ আইন সম্পর্কে বিভিন্ন দলের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভারত শাসন আইন, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনটি ছিল একটি সুবৃহৎ দলিল। ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির সময়ও এ আইন কার্যকরী ছিল। স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের নিজস্ব সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ আইন সংশোধিত আকারে বলবৎ থাকে।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো একে প্রত্যাখ্যান করে। আপনারা পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছেন বৃটিশ সরকার সংবিধান বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মতামত জানার জন্য লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছিল। তিনটি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা করেও শাসনতান্ত্রিক সমস্যার কোনো সমাধান হয় নি। ইতোমধ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড আইন সভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে স্বীয় সিদ্ধান্তে এক সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। কংগ্রেসসহ বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় এর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা সম্বলিত একটি শ্বেতপত্র বৃটিশ সরকার প্রকাশ করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট এবং উক্ত শ্বেতপত্রের আলোকে পরের বছর ভারতের জন্য একটা নতুন সংবিধানের খসড়া প্রকাশিত হয়। এ খসড়ার ভিত্তিতেই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টের উভয় হাউসে ভারতের শাসনকার্যের জন্য একটা নতুন শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। এটাই ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত ভারত শাসন আইন।

ভারত শাসন আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভারত শাসনে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন ছিল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ আইনে স্থির হয় যে, বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটা যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনভার গভর্নর জেনারেল ও তাঁর মন্ত্রীসভার হাতে ন্যস্ত থাকবে। মন্ত্রীগণ আইন সভার মধ্য থেকে গভর্নর জেনারেল কর্তৃক নিয়োজিত হবেন এবং তাঁরা আইন সভার নিকট দায়ী থাকবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত-এ দুভাগে বিভক্ত হবে। সংরক্ষিত বিষয়গুলোর যেমন দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ধর্ম ও উপজাতি সম্পর্কীয় বিষয় ইত্যাদি পরিচালনার দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল ও তিনজন উপদেষ্টার হাতে ন্যস্ত থাকবে। হস্তান্তরিত বিষয়গুলো যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃংখলা ইত্যাদি গভর্নর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত হবে। ক্ষমতার এ বণ্টন দ্বারা কেন্দ্রে দ্বৈতশাসন প্রবর্তনের পরিকল্পনা করা হয়। এ আইনে গভর্নর জেনারেলকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাও দেয়া হয়। তিনি ইচ্ছা করলে আইন সভার পরামর্শ না নিয়েই মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যগুলোর যোগদান স্বেচ্ছামূলক করা হয়। আইনে এটাও বলা হয় যে ফেডারেল আইনসভার উচ্চ পরিষদের মোট আসন সংখ্যার অর্ধেক দেশীয় রাজ্যগুলো দ্বারা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে না।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনে কেন্দ্রে একটা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ কক্ষটি রাষ্ট্রসভা এবং নিম্নকক্ষ ফেডারেল পরিষদ নামে অভিহিত হবে স্থির হয়। মোট এগারটি গভর্নর শাসিত প্রদেশের মধ্যে ছয়টিতে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা এবং অবশিষ্ট পাঁচটিতে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুযায়ী কেন্দ্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশেও মুসলিম ও অনুন্নত শ্রেণির জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা হয়।

এ আইনে প্রদেশগুলোতে দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করা হয়। নতুন আইন অনুযায়ী প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার প্রধান হবেন একজন গভর্নর। জনগণের নির্বাচনে গঠিত হবে একটি আইন সভা। ঐ আইন সভার সদস্যদের মধ্য থেকে গভর্নরকে পরামর্শ দান ও সাহায্যের জন্য একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। আইন-শৃংখলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গভর্নরের এখতিয়ারে থাকবে। মন্ত্রীগণ তাদের কাজের জন্য দায়ী থাকবেন প্রাদেশিক আইন সভার নিকট। গভর্নরকে বিশেষ ক্ষমতাও দেয়া হয়। সে ক্ষমতা বলে তিনি ইচ্ছা করলে আইনসভা ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তাছাড়া যেকোন অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

ভারত সচিবের কাউন্সিল এ আইনের বলে বিলুপ্ত হয়। বার্মাকে ভারত থেকে আলাদা করা হয়। সিন্ধু ও উড়িষ্যা নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপূরকরূপে এ আইনে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

ভারতশাসন আইনের প্রতিক্রিয়া

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন দ্বারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা কার্যকর করা হয় নি। ভারতে কোন রাজনৈতিক দল এ আইনে সন্তুষ্ট হতে পারে নি। কংগ্রেস এ আইনের তীব্র নিন্দা করে। জওহরলাল একে 'দাসত্বের এক নতুন অধ্যায়' বলে অভিহিত করেন। কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিযোগ করেন যে, এ আইনে স্বায়ত্ত শাসনের স্বাভাবিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ নেই। হিন্দু মহাসভাও এ আইন সমর্থন করে নি। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এ আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সমালোচনা করেন। তবে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিধানগুলো সমর্থন করেন। অবশ্য সে আইনে প্রাদেশিক গভর্নরকে এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল যে এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে প্রকৃত দায়িত্বশীল বলা যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসনের উপর একটি রচনা লিখবেন

সারাংশ

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন এ দেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রয়াস এ আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হয় নি। অবশ্য প্রদেশ সমূহে এক ধরনের স্বায়ত্তশাসন চালু হয়। কিন্তু প্রদেশের প্রধান নির্বাহীকর্তা গভর্নরের হাতে কতগুলো বিশেষ ক্ষমতা থাকায় সে ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার বলা যায় না। তথাপি ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল–
   i. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
   ii. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
   iii. কেন্দ্রে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা
   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কতটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়?
   ক) ১ খ) ২ গ) ৩ ঘ) ৪

৩। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কতটি প্রদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা প্রবর্তিত হয়?
   ক) ৫ খ) ৬ গ) ১০ ঘ) ১১

৪। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কোন অঞ্চলকে ভারত থেকে বাদ দেয়া হয়?
   ক) সিন্ধু খ) পাঞ্জাব গ) বার্মা ঘ) দেশীয় রাজ্য

পাঠ-১০.১১ লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০ খ্রি.)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া এবং এ প্রস্তাবের ফলাফল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	লাহোর প্রস্তাব, চৌধুরী রহমত আলী, শেরে বাংলা, জিন্নাহ

উপমহাদেশের মসুলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি উঠে। লাহোর প্রস্তাবের মধ্যদিয়েই এই দাবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ প্রস্তাবের ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

ঔপনিবেশিক ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে ভোট দিয়ে নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করার অধিকারের দাবি মুসলমানদের বহুদিনের। লক্ষ্ণৌচুক্তিতে কংগ্রেস মুসলমান সম্প্রদায়ের এ অধিকার মেনে নিলেও পরে আবার অস্বীকার করে। বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম বিরোধের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা জটিল বিষয়। এ কারণে শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের কতগুলো উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে কার্যকর করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। তাছাড়া মুসলিম লীগের সাথে কোনো প্রকার আলাপ-আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মন্ত্রীসভা গঠন করে। কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ সময় দাবি করেন যে, ভারতে দুটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়- একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস। অন্যকোনো দলের অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করতে নারাজ। তাঁর এ মন্তব্য মুসলমান নেতাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। জিন্নাহ্ এতদিন পর্যন্ত যিনি রাজনীতিতে হিন্দু মুসলিম মিলনের প্রবক্তা ছিলেন, তিনিও এতে ব্যথিত হন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভায় তিনি হিন্দু ও মুসলমানদেরকে দুটি পৃথক জাতি বলে আখ্যায়িত করেন। বস্তুত ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পূর্বেই অনেক মুসলমান নেতাদের মধ্যে ভারত বিভাগ এবং হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের চিন্তাধারা প্রবল হয়ে উঠে। লীগ সভাপতি জিন্নাহ্ও একে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলে স্থির করেন।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পেছনে রাজনৈতিক ধারার একটা পটভূমি রয়েছে। এ প্রস্তাবে যে স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির দাবি করা হয়েছে অনুরূপ একটা প্রস্তাব ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কবি ইকবাল তাঁর একটি ভাষণে উল্লেখ করেন। তিন বছর পর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলোর জন্য 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভাবন করেন।

কিন্তু ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক কোনো রাষ্ট্রের কথা ভাবেন নি। কংগ্রেস নেতাদের দম্ভোক্তি তাঁকে আহত করে এবং রাজনীতির নতুন কৌশল তিনি অবলম্বন করেন। যদিও কখনও তিনি কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি ছিলেন না। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের পর যেসব প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল, সেখানে তাদের কার্যকলাপ মুসলমানদেরকে যথেষ্টভাবে আহত করে। তারা বুঝেছিল সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিন্দুদের শাসনাধীনে কখনো বাস্তব রূপ নেবে না। এ ধরণের পরিস্থিতিতে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জিন্নাহ্ তাঁর "দ্বি-জাতিতত্ত্ব" ঘোষণা করেন। পরবর্তী বছর লাহোরে মুসলিম লীগের ঘোষণায় এরই প্রতিধ্বনি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। এ অধিবেশনেই বাংলার নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে বলা হয় যে, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি একটি নিম্নবর্ণিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। যথা-

ক. ভৌগোলিক দিক থেকে সংলগ্ন এলাকাগুলোকে প্রয়োজনীয় রদবদলের মাধ্যমে পৃথক অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে;

খ. ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহে স্বাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠন করতে হবে এবং

গ. এভাবে গঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গরাজ্যগুলো থাকবে স্ব-শাসিত ও সার্বভৌম।

লাহোর প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষাকল্পে সংবিধানে প্রয়োজনীয় রক্ষা-কবচ রাখতে হবে। প্রকৃত পক্ষে আঞ্চলিক স্বাধিকার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব অর্জনই ছিল লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য।

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। কারও কারও মতে লাহোর প্রস্তাবে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছে। একটি উত্তর পশ্চিমে এবং অন্যটি পূর্বে। অন্যমত হলো লাহোর প্রস্তাবে একটি রাষ্ট্রের কথাই বলা হয়েছে, যার ইউনিটগুলো হবে স্ব-শাসিত। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগ দলীয় আইন সভার সদস্যদের অধিবেশনে লাহোর প্রস্তাব সংশোধন করে এক রাষ্ট্রের দাবি রাখা হয়। এর ফলে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটিমাত্র মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' গঠিত হয়।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাদের প্রতিক্রিয়া ছিল তীব্র। পণ্ডিত নেহেরু এ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি গঠন অবান্তর বলে আখ্যায়িত করেন। মহাত্মা গান্ধীও তাঁর লেখায় এর সমালোচনা করেন এবং ভারত বিভাগ করাকে পাপের সমতুল্য বলে মন্তব্য করেন। বর্ণ হিন্দুরা এ প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত বিভক্তি পছন্দ না করলেও ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার দাবি তোলে। এটা অনস্বীকার্য যে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাবের প্রভাব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ লাহোর প্রস্তাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটি বিতর্কসভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

'লাহোর প্রস্তাব' ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে নি:সন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বাংলার নেতা শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা জানান এবং একে অবান্তর দাবি বলে মন্তব্য করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভারতের স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির দাবিতে সর্বপ্রথম ভাষণ দিয়েছিলেন কে?
ক) কবি ইকবাল খ) চৌধুরী রহমত গ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) এ কে ফজলুল হক

২। দ্বিজাতিতত্ত্ব কত খ্রিস্টাব্দে ঘোষিত হয়?
ক) ১৯৩৭ খ) ১৯৩৮ গ) ১৯৩৯ ঘ) ১৯৪০

৩। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচন কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৩৫ খ) ১৯৩৭ গ) ১৯৩৮ ঘ) ১৯৩৯

৪। লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোন মুসলিম অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়েছে?
i. পূর্বাঞ্চল
ii. দক্ষিণাঞ্চল
iii. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

দক্ষিণ এশিয়ার একটি অঞ্চলে প্রধানত দুটি সম্প্রদায়ের বসবাস। বিদেশি শাসনের অধীনে এ অঞ্চলটি স্বাধীনতা লাভের অবস্থায় পৌঁছলে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হয়। এমতাবস্থায় একটি সম্প্রদায় আলাদা আবাসভূমি বা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি করে বসে। অর্থাৎ দুটি সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র। শেষ পর্যন্ত এ দাবির আলোকেই উক্ত অঞ্চলটি স্বাধীনতা লাভ করে।

ক. 'পাকিস্তান' নামটির উদ্ভাবক কে? ১
খ. 'দ্বি-জাতিতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত আলাদা আবাসভূমি দাবির সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত দাবির আলোকে বিদেশি শাসক ও ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১০.১২ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনায় নেওয়া প্রস্তাবসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা, অন্তবর্তী সরকার, ব্রিটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য

আগের পাঠে আপনারা দেখেছেন লাহোর প্রস্তাব এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এরপর থেকে দ্রুত বেশকিছু ঘটনা ঘটতে থাকে। বোঝা যায় একটা বড় রকমের পরিবর্তন যেন আসন্ন। এসময়ের ইতিহাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা বা কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কী?

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা নেয়ার আগে 'ক্রিপস মিশন' সম্পর্কে একটু জানতে হবে। আপনারা জানেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড সরাসরি জড়িয়ে পড়েছিল। এ সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া জরুরী মনে করে। এই উদ্দেশ্যেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল তাঁর মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। পরামর্শ দেন ভারতবাসীর সাথে যেন একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ ক্রিপস দিল্লীতে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের সাথে আলোচনা করে একটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিহাসে এই প্রস্তাব 'ক্রিপস মিশন পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। এ পরিকল্পনায় যুদ্ধ শেষে ডোমিনিয়ন বা ঔপনিবেশিক স্বায়তশাসন দান, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন ও একটি অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ক্রিপসের দেয়া প্রস্তাব কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ গ্রহণ করে নি। বরং কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে।

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর হাল ছেড়ে দেয় নি বৃটিশ সরকার। এবার এগিয়ে আসেন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সিমলায় একটি বৈঠকে মিলিত হন। কিন্তু এই বৈঠকও ব্যর্থ হয়। অবশেষে সিমলা বৈঠকের সূত্র ধরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল ভারতে আসে। লরেন্স ছাড়া এই প্রতিনিধি দলের অন্য দুই সদস্য ছিলেন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ.ভি. আলেকজান্ডার। এই মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সাথে আলোচনার পর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ভারতের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিহাসে একে 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা' বলা হয়।

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবসমূহ

মূলত ভারত উপমাহদেশকে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব ছিল মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায়। তিন স্তর বিশিষ্ট ছিল এই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা। এগুলো হচ্ছে —

ক. প্রস্তাব অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তবর্তী কালীন সরকার গঠন করা হবে

খ. একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা হবে সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলো এবং

গ. ভারতীয় প্রদেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে
'ক' গ্রুপে থাকবে, মাদ্রাজ, বোম্বে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা, 'খ' গ্রুপে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু এবং 'গ' গ্রুপে থাকবে বাংলা ও আসাম। সিদ্ধান্ত হয় প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে। মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব পেশের পাশাপাশি শর্ত জুড়ে দিয়েছিল যে পরিকল্পনার পুরোটিই গ্রহণ করতে হবে- অংশবিশেষ নয়।

ভারতীয় ইউনিয়নের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ এবং মুদ্রা বিভাগের দায়িত্ব। অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে। এছাড়াও বলা হয় কেন্দ্রীয় সংসদে মোট ৩৮৫টি আসনের মধ্যে ৭৮টি মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করা হয়। পরিকল্পনায় এই সুযোগ রাখা হয় যে, কোনো গ্রুপ ইচ্ছা করলে দশ বছর পর কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।

মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ভারতের বিভিন্ন দলের রাজনীতিকদের মধ্যে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ এ বিষয়টি সবার সামনে স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের নিকট এখন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়। সুতরাং কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই পরিকল্পনার খুঁটিনাটি বিষয় বিশ্লেষণ করতে থাকে। এই পরিকল্পনার ভিতর উভয় দলই নিজেদের মতো করে সুবিধা খুঁজতে থাকেন। এক কেন্দ্রিক সরকার গঠনের প্রস্তাব কংগ্রেসের ভাল লাগে। কারণ এর ভিতর দিয়ে তারা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেখতে পায়। অন্যদিকে গ্রুপিং ব্যবস্থা উৎসাহ দেয় মুসলিম লীগকে। কারণ এই ব্যবস্থায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে গ্রুপগুলো ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বলে লীগ নেতারা মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে নেয় যদিও পরবর্তী সময় পুরো পরিকল্পনাকেই প্রত্যাখ্যান করে। অন্য দিকে প্রথম থেকেই কংগ্রেসের অসহযোগিতার ফলে মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবেন।

সারাংশ

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের অবসান ঘটার কিছু আগে বৃটিশ সরকার কীভাবে এ দেশ ছেড়ে যাবে অথবা কোনো পদ্ধতিতে এদেশবাসীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিবে, তা নিয়ে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা করতে থাকে। এরই চূড়ান্ত একটি পদক্ষেপ ছিল 'মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা'। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে, ব্রিটিশ সরকার এখন ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে চায়। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় যে প্রস্তাব রাখা হয়, তাতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়ই তাদের দলীয় স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হলেও কংগ্রেস পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করে। এভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত মন্ত্রী মিশন এর সদস্য ছিলেন–

i. লর্ড পেথিক লরেন্স
ii. স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস
iii. এ ভি আলেকজান্ডার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় কোন অঞ্চলকে 'গ' গ্রুপে রাখা হয়?

ক) আসাম খ) পাঞ্জাব
গ) সিন্ধু ঘ) উরিষ্যা

৩। মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কত খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয়েছিল?

ক) ১৯৪২ খ) ১৯৪৫
গ) ১৯৪৬ ঘ) ১৯৪৭

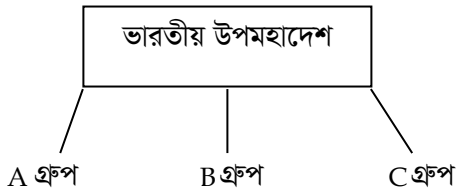

ক. অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব কারা উপস্থাপন করে? ১

খ. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. প্রদত্ত চার্টটি আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন পরিকল্পনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উক্ত পরিকল্পনাটি কী ব্যর্থ হয়েছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

মডেল উত্তর

ক. অখণ্ড স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবক হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসু।

খ. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি সুবৃহৎ দলিল।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইন সম্পর্কে কংগ্রেস তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। মুসলিম লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে কিছুটা নমনীয় হলেও অন্যান্য বিষয়াবলি নিয়ে আপত্তি জানায়।

গ. বর্ণিত চার্টটি বৃটিশ শাসিত ভারতে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ইঙ্গিত বহন করে।

ভারতের শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনকল্পে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স এর নেতৃত্বে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি মিশন প্রেরণ করে। এটিই ইতিহাসে মন্ত্রী মিশন নামে অভিহিত। তাদের প্রণীত পরিকল্পনা হলো মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। এগুলো হলো–

A গ্রুপ– মাদ্রাজ, বোম্বে, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উরিষ্যা। এ অঞ্চলগুলো ছিল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ।

B গ্রুপ– উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু। এ অঞ্চলগুলো ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ।

C গ্রুপ– বাংলা ও আসাম। এ অঞ্চরে হিন্দু ও মুসলমান প্রায় সমান ছিল।

ঘ. মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় তিন স্তর বিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে। স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়নের এ অন্তবর্তীকালীন সরকারে ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি থাকবে। এ সরকার বিধিবদ্ধ নিয়মে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। এতে কেন্দ্রীয় ৩৮৫টি আসনের মধ্যে ৭৮টি মুসলমানদের মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। প্রণীত তিনটি গ্রুপের যেকোনো গ্রুপ দশ বছর পর ইচ্ছা করলে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগও রাখা হয়।

কংগ্রেস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় অখণ্ড ভারতের সম্ভাবনা দেখতে পায়। অপরদিকে গ্রুপিং ব্যবস্থা মুসলিম লীগকে অনুপ্রাণিত করে। কেননা লাহোর প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্য আবাসভূমি এবং মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় গ্রুপগুলোর জন্য দশ বছরের সীমারেখা মুসলিম লীগের পক্ষে চলে আসে। অর্থাৎ দশ বছর পর তারা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে যা লাহোর প্রস্তাবেরই বাস্তবায়ন। কিন্তু উভয় দলের জন্য সেটি সমস্যা ছিল তা হলো– পরিকল্পনার পুরোটাই গ্রহণ করতে হবে– অংশ বিশেষ নয়। তাই শেষ পর্যন্ত এ পরিকল্পনা কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কাউকেই খুশি করতে পারে নি।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ব্যাপারে কংগ্রেস প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়েছিল। মুসলিম লীগ প্রথমে অংশ বিশেষ সমর্থন করলেও শেষ পর্যন্ত পুরো পরিকল্পাই প্রত্যাখ্যান করে। অর্থাৎ স্বার্থের বেড়াজালে আবদ্ধ মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কারোরই যথার্থ স্বার্থ পূরণে অপারগ হয়। তাই শেষ পর্যন্ত এটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

পাঠ-১০.১৩ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বসু-সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব কী ছিল তার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	১৯৪৭ সালের ভারত শাসন আইন, মাউন্ট ব্যাটন, বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব, অখণ্ড স্বাধীন বাংলা

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করা হয়। এটিই ইতিহাসে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' নামে পরিচিত।

ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষাপট

মন্ত্রীমিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা নেমে আসে। এ সময়ের বিশৃঙ্খল অবস্থার ভিতর থেকেই জন্ম নিয়েছিল ভারত স্বাধীনতা আইনটি। কংগ্রেস মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার জন্যই ব্যর্থ হয়েছিল এই পরিকল্পনা। এই ঘটনা মুসলিম লীগেকে আহত করে। লীগ দাবি করে যেহেতু তারা পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছে, তাই সরকারের উচিত লীগকে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনে সম্মতি দেওয়া। কিন্তু বিষয়টি একদলীয় হয়ে যাচ্ছে বলে বড়লাট ওয়াভেল লীগের দাবির প্রতি সম্মতি জানাতে পারেন নি। লীগের কাছে সরকারের এই মনোভাব চুক্তি ভঙ্গ বলে মনে হলো। লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্টি হলো দূরত্ব।

মুসলিম লীগ এবার নিজের মতো করে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বোম্বাইয়ে একটি সম্মেলন ডাকে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় পাকিস্তান অর্জনের জন্য মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (ডাইরেক্ট এ্যাকশন) শুরু করবে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট দেশব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের ডাক দেয়া হয়। মুসলিম লীগ নেতা অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ব্রিটিশ সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় বসে তবে বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে এবং পাল্টা সরকার গঠন করবে। তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো রাজস্ব দেবে না এবং কেন্দ্রের সাথে কোনো সম্পর্কও রাখবে না।

এদিকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিন ঘনিয়ে আসে। বোম্বাই থেকে কোলকাতায় ফিরে আসেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের সেক্রেটারি আবুল হাশেম। তাঁরা জনমত গঠন করতে থাকেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের দিন কলকাতায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যায়। দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায়। দাঙ্গা কলকাতায় শুরু হলেও ক্রমে তা বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। অবস্থার মারাত্মক অবনতি হতে থাকলে ব্রিটিশ সরকার শেষ রক্ষার চেষ্টা করে। তারা ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা ঘোষণা করে। সুতরাং কিভাবে দেশ বিভক্ত করা হবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তার জন্য একটি নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। এ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেল এর পরিবর্তে ভারতের বড়লাট করে পাঠান লর্ড মাউন্ট ব্যাটনকে।

লর্ডমাউন্ট ব্যাটন ও কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী

বড়লাটের ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথম দিল্লীতে আসেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটন। তিনি ঘোষণা দেন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মধ্যেই বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। মাউন্ট ব্যাটনের সহানুভূতি ছিল কংগ্রেসের প্রতি। কংগ্রেসের সমর্থক হিসেবে তিনি অখণ্ড ভারতের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু এভাবে লীগের সাথে আপোস করা সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস লীগের দাবি

মেনে নিয়ে ভারত বিভাগ করতে রাজি হয়। কিন্তু এতে বেশকিছু শর্ত আরোপ করে যা লীগের পক্ষে মানা সম্ভব হয়নি। এরকম ভিন্ন মত ও চিন্তা রাজনৈতিক আকাশকে আবার অন্ধকার করে ফেলে।

বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দীর অখণ্ড স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাব

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে রাজনৈতিক মত পার্থক্য যখন তীব্র হচ্ছিল তখনই বাংলার কয়েকজন নেতা অখণ্ড বাংলা গড়ার প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। বেশ ক'জন প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতাও এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তাঁরা হচ্ছেন- শরৎবসু, কিরণ শংকর রায় প্রমুখ। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশেমও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। শরৎবসুর সক্রিয় সমর্থনের কারণে প্রস্তাবটি 'বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাব' নামে পরিচিত হয়। বাংলার এই দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ বুঝেছিলেন, কংগ্রেস ও লীগের কাছে দলীয় স্বার্থই বড়। বাংলার স্বার্থের কথা কখনই তারা বিশেষ বিবেচনায় রাখবে না। তাই অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব ঘোষণা ও বিশ্লেষণ করেন শরৎবসু ও সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁদের মতে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা সম্ভব। এই প্রস্তাবের ভিতর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও নেয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মহৎ প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হতে পারে নি। এবারও প্রথম বিরোধিতা আসে কংগ্রেসের পক্ষ থেকেই। কংগ্রেসের অবাঙালী ও রক্ষণশীল সদস্যরা প্রচণ্ড বিরোধিতায় মেতে ওঠে। কংগ্রেস এবার অখণ্ড বাংলার বদলে পাকিস্তান দাবিকেই মেনে নেয়। এভাবে ভারত বিভাগের প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল

ভারত স্বাধীনতা আইনের মধ্যে দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আপনারা পাঠ-১১ এ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কথা জেনেছেন। এই ভারত শাসন আইনকেই অনেক পরিবর্তন ও সংস্কার করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে রূপান্তর করা হয়। এ আইনের তিনটি ফলাফল লক্ষ করা যায় —

ক. পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি ভিন্ন ডোমিনিয়ন স্থাপন করা হয় এবং এই ডোমিনিয়ন দুটি ছিল সমান মর্যাদা সম্পন্ন ও স্বায়ত্তশাসিত

খ. পাকিস্তানের মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। ডোমিনিয়ন আইন সভায় যে সব আইন গৃহীত হতো তাতে স্বাক্ষর দানের পূর্ণ অধিকার থাকতো গভর্নর জেনারেলের।

গ. ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুযায়ী গঠিত আইনসভা গণপরিষদের মর্যাদা লাভ করে। এই গণপরিষদের উপর দায়িত্ব ছিল দেশের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের উপর একটি নিবন্ধ রচনা করবেন।

সারাংশ

বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ ও ১৪ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টো রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারত স্বাধীনতা আইন হঠাৎ করেই তৈরি হয় নি। মন্ত্রী মিশনের ব্যর্থতার পর যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা বাংলার নেতাদের আতঙ্কিত করে তোলে। তাই বসু-সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে অখণ্ড বাংলার চিন্তা জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কিন্তু কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের তীব্র বিরোধিতার মুখে এই প্রচেষ্টা ভেঙ্গে যায় মধ্য দিয়ে। অবশেষে শেষরক্ষা করতে হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণয়ন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় বসে তা হলে বাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।" উক্তিটি কার?

ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ) শরৎ বসু

গ) কিরন শংকর রায় ঘ) আবুল হাশেম

২। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনটি হলো–
ক) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সংস্কার
খ) বসু সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাবের সংস্কার
গ) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের সংস্কার
ঘ) মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার সংস্কার

৩। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঘোষণা দেয় কারা?
ক) দেশিয় রাজ্যসমূহ খ) কংগ্রেস
গ) মুসলিম লীগ ঘ) হরিজন সম্প্রদায়

সৃজনশীল প্রশ্ন

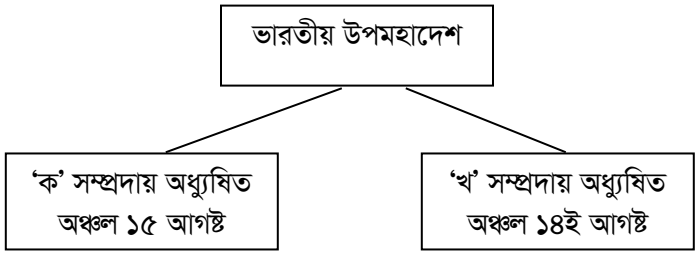

ক. লাহোর প্রস্তাব কে কত খ্রিস্টাব্দে পেশ করেন? ১
খ. জিন্নাহ কেন ১৪ দফা প্রস্তাব পেশ করেন? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত অঞ্চল দুটি আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন আইনের বাস্তব রূপ? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত অঞ্চল দুটির জন্ম যে প্রস্তাবের প্রভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করুন। ৪

পাঠ-১০.১৪ পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে যেসব প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্র সৃষ্টির সময়ের ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ভারত, পাকিস্তান, সোহ্‌রাওয়ার্দী, গান্ধী

আপনারা পূর্ববর্তী পাঠে দেখেছেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এবং ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের অবসান ঘটে, জন্ম নেয় নতুন দুটি রাষ্ট্র — ভারত ও পাকিস্তান। এত বড় একটি ঘটনা হঠাৎ করে ঘটে যেতে পারে না। ভারত বিভাগের প্রেক্ষাপট হিসেবে কিছু ঘটনার কথা আপনারা জেনেছেন। এখন এই দুই রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের সময়কালে তাৎক্ষণিক কিছু ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

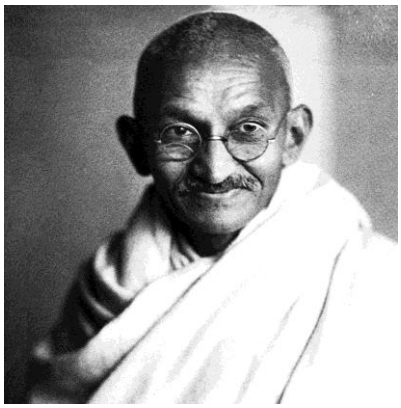

মহাত্মা গান্ধী

হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রতিক্রিয়া

আগের পাঠে আপনারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা জেনেছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে প্রচুর রক্ত ঝরেছিল এ দেশবাসীর। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টেই প্রচুর দাঙ্গার খবর আসতে থাকে। হতাশ হয়ে পড়েছিল এ দেশবাসী। এ সময়েই হঠাৎ আশার আলো দেখা যায়। নতুন প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসেন দু'জন ব্যক্তিত্ব। এঁদের একজন এম. কে গান্ধী এবং অপরজন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন সঙ্কটের উৎস। দেশ বিভাগের পর কীভাবে সীমানা নির্ধারণ করা হবে তা নিয়ে বিতর্ক ও অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যে খবর প্রচারিত হচ্ছিল তাতে উত্তপ্ত হচ্ছিল চারপাশ। হিন্দু মুসলিম উভয়ই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল। ফলে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ বাড়ে। দাঙ্গাও বিস্তার লাভ করতে থাকে। সরকার সে দাঙ্গা থামাতে পারে নি। সে অসাধ্য সাধিত হলো গান্ধীর ব্যক্তিত্বে। দাঙ্গার কথা ভুলে গিয়ে জনতার মধ্য থেকে শ্লোগান উঠতে থাকল 'হিন্দু-মুসলমান এক হও', 'হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই'; এইভাবে শান্তি ও সম্প্রীতির আবহাওয়া ক্রমে বিস্তার লাভ করতে থাকে। দাঙ্গা অধিক জোরদার হচ্ছিল বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশে। কারণ দুটি প্রদেশই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিভক্ত হচ্ছিল। তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতায় দাঙ্গা দমনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মহাত্মা গান্ধীও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল সফরে এলে সোহ্‌রাওয়ার্দী তার সঙ্গে দাঙ্গা কবলিত এলাকায় সফর করেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান

জুন মাসেই মাউন্ট ব্যাটন সকল দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাদের আহবান জানালেন যেন মেনে নেয়া হয় দেশ বিভাগের ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা। এ সময়ের নেতা নেহেরু, জিন্নাহ ও সরদার বলদেব সিং, মাউন্ট ব্যাটনের

পরিকল্পনা গ্রহণ করে রেডিওতে বক্তৃতা করেন। স্থির হয় যে ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হবে। এ সময়ের প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব লর্ড ইজমে ভাইসরয়কে একটা নোট লিখে পাঠান। শিরোনাম ছিল 'ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসের অনুষ্ঠান'। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত। তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে বিবেচনায় রাখতে হবে।

ক. ভারত-পাকিস্তান উভয় ডোমিনিয়নের রাজধানীতেই ক্ষমতা হস্তান্তর উপলক্ষে অনুষ্ঠান হওয়া প্রয়োজন। সকালের দিকে দিল্লীতে এবং বিকেলের দিকে করাচীতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তাতে ভাইসরয়ের যোগদান সম্ভব।

খ. দিল্লীর অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমকের সাথে করা উচিত। এ ব্যাপারে উভয় ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে ভাইসরয়ের ইচ্ছার বাইরে যাবে না কোনো সিদ্ধান্ত।

গ. দিল্লীর ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠান দরবার হলে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যাশা থাকবে ১৫ আগস্ট মহামান্য ব্রিটিশ সম্রাটের বাণী ভাইসরয় পড়ে শোনাবেন।

ঘ. উভয় ডোমিনিয়নের প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠানে যোগদান নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ. ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসে উভয় ডোমিনিয়ন তাদের নিজস্ব লোক দিয়ে অন্তত একটি ইউনিট গড়ে তুলবে। ব্রিটিশ সৈন্যদেরও এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে। উভয় ডোমিনিয়নের রাজধানীতেই সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট মওজুদ থাকবে।

চ. এ ব্যাপারে মতামত চেয়ে লন্ডনে *ইন্ডিয়া অফিসে* একটি চিঠি লিখতে হবে।

প্রতিক্রিয়া

লর্ড ইজমের প্রস্তাবের বেশকিছু প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ প্রশাসন অংশগ্রহণ করুক এটা জিন্নাহ বা নেহেরু কেউ চান নি। তবে ১৪ আগস্ট করাচীর স্বাধীনতা দিবসের প্রথম অনুষ্ঠানে জিন্নাহ্ মাউন্ট ব্যাটনকে যোগ দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর দিবসে মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের বাণী পাঠানোর যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, বৃটেনের শ্রমিক দলের সরকার তার সাথে একমত হতে পারে নি। কারণ, তাদের ধারণা ছিল ভারতীয় জনগণ এটা পছন্দ করবে না।

পাকিস্তান ও ভারতের অভ্যুদয়

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় ১৩ আগস্ট করাচী পৌঁছেন। বিকেলের আনুষ্ঠানিক ভোজ সভায় জিন্নাহ্ দীর্ঘ ভাষণ পাঠ করেন। ভাইসরয়ও সেখানে তাঁর বক্তব্য দেন।

১৪ আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভাইসরয় পাকিস্তান সৃষ্টিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেন। এই দিন বিকেলেই দিল্লীতে ফিরে আসেন ভাইসরয়।

স্বাধীনতার আকাঙ্খায় ১৪ আগস্ট সন্ধ্যা থেকেই দিল্লীতে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতার উৎসবে যোগ দেয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসতে থাকে দিল্লীর দিকে। ১৫ আগস্ট নেহেরু ভারতীয় বিধান সভার উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এদিন স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়ে, দিল্লী তথা ভারত। এভাবে উপমহাদেশের ইতিহাসে দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটে, জন্ম নেয় ভারত আর পাকিস্তান নামের দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্র।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ বৃটিশ ভারত-ভাগ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপর একটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন।

সারাংশ

বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৪৬ ও ৪৭ খ্রিস্টাব্দের হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ভারত বিভাগের প্রশ্নটিকে জরুরী করে তুলেছিল। বৃটিশ সরকার ভারতীয় নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে একটি নীতি নির্ধারণ করেছিলেন। তারই পথ ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মধ্য থেকে বেড়িয়ে এলো একটি স্লোগান– "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।" উক্ত অসাধ্য সাধনে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

ক) মহাত্মা গান্ধী খ) লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

গ) মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) শরৎ বসু

২। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেয়া হয় কোথায়?

i. করাচী ii. লাহোর iii. দিল্লী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এদের মধ্যে আজারবাইজান, জর্জিয়া, লিথুনিয়া, এস্তোনিয়া অন্যতম।

৩। বর্ণিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাষ্ট্র হলো–

i. পাকিস্তান ii. বাংলাদেশ iii. ভারত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। উক্ত রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা লাভের কিছু দিন পূর্বে যে সংকটে পড়েছিল, তা হলো–

ক) ভয়াবহ যুদ্ধ খ) ভয়াবহ দাঙ্গা

গ) তীব্র আন্দোলন ঘ) নেতৃত্বের তীব্র কোন্দল

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১। ক ২। গ ৩।ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১। ঘ ২। গ ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১। গ ২। গ ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৫ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৬ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। খ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৭ ঃ ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৮ ঃ ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৯ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১০ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১১ ঃ ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১২ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ

পূর্ব বাংলা থেকে মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)

ইউনিট ১১

ভূমিকা

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করাকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বাধিকারের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনগণকে শুরুতেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে সংকটের শুরু। ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষার অধিকার আদায় করতে গিয়ে শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। তাদের রক্তের বিনিময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অর্জন করে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার অধিকার। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় নি। ফলে স্বাধিকার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এরই পথ ধরে ছয় দফা ও এগার দফার আন্দোলন বিকশিত হয়। ধারাবাহিক পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান। বর্বর অপারেশন সার্চলাইটের বাস্তবায়নে পাকিস্তানি শাসকদের হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র পূর্বপাকিস্তানিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের প্রতিরোধে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তারপর দীর্ঘ নয়মাস রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মধ্য দিয়ে বিজয় আসে মুক্তিযুদ্ধে। বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-১১.১ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	উর্দু, বাংলা, তমদ্দুন মজলিস, রোমান হরফ

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান ছিল। কিন্তু এত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং একই বছর জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের পক্ষে মত দেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি লেখক,

বুদ্ধিজীবী এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলার পক্ষে বক্তব্য দেন। পূর্ব বাংলায় ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পত্র-পত্রিকায় মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন।

বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি এসময়ে পূর্ব বাংলায় গঠিত বিভিন্ন সংগঠনও এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে *তমদ্দুন মজলিশ* গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল বাঙালির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন যা এই আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি

ভাষার ওপর আঘাত একটি জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো পরের দিকে গুরুত্ব পেয়েছিল বেশি। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

ভাষার মধ্যে ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মের পর মুসলিম লীগের রক্ষণশীল অংশ পূর্ববাংলার ক্ষমতায় বসে 'রেনেসাঁ সোসাইটি' ও 'সাহিত্য সংসদ' গঠন করে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের নীতি গ্রহণ করে। প্রথমেই তারা বাংলা ভাষার মধ্যে একটি ইসলামী রূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রচুর আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে উৎসাহ দিতে থাকেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার ইচ্ছাও তারা তখন ঘোষণা করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষায় আরবি হরফ চালুর চেষ্টা করে। এরপর আরবিতে বাংলা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। চালু হয় এ ধরনের অনেকগুলো শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে বয়স্ক ছাত্রদের বিনামূল্যে আরবি হরফের বই দেওয়া হতে থাকে। পূর্ববাংলার জনগণ কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানিদের অসাধু উদ্দেশ্য বুঝতে পারে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়। ফলে সরকারের অসৎ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। প্রথমে এগিয়ে আসে পূর্বপাকিস্তান মুসলিম লীগের 'ভাষা কমিটি'। এই কমিটির বক্তব্য ছিল, পূর্ববাংলার মানুষকে অশিক্ষিত বানানোর জন্যই শাসকদের এই ষড়যন্ত্র। প্রবল নিন্দা জানায় 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশ'। প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলনের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি এবং কবি গোলাম মোস্তফাকে সম্পাদক করে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। দেড় বছর ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার প্রচুর সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয়। নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নকে কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়। এই রিপোর্টটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ হয় নি বলেই তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শুরু থেকেই যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে জন্ম নিতে থাকে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আহ্বায়ক মনোনিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনটি ক্রমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত। এ সমস্ত সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে ভাষা প্রশ্নের গুরুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে পূর্ববাংলায় সব ধরনের উন্নতি থেমে

যাবে। তমুদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় পূর্ববাংলার শিক্ষার বাহন, আইন আদালত ও অফিসের ভাষা বাংলা করতে হবে। এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। যার শক্তির উপর দাঁড়িয়ে রূপলাভ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা শুরু করে। এ দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে তারা উর্দু করতে চায়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। এদেশের মানুষের কাছে এই অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের পক্ষে মত দেয় কে?

i. চৌধুরী খালিকুজ্জামান
ii. ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
iii. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি?

ক) তমদ্দুন মজলিশ খ) রেনেসাঁ সোসাইটি
গ) সাহিত্য সংসদ ঘ) রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ

৩। কার নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়?

ক) অধ্যাপক নুরুল হক ভূইয়া খ) অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ) মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ঘ) কবি গোলাম মোস্তফা

৪। আরবি হরফে বাংলা লেখার অপচেষ্টা করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৪৮
গ) ১৯৫১ ঘ) ১৯৫২

পাঠ-১১.২ ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, সালাম, বরকত, রফিক

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৩৭ সাল থেকে ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক মনোনীত হন নূরুল হক ভূঁইয়া। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আশ্বাস দেন যে, মানি অর্ডার, ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি-উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় লেখা হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্যে হতে 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্যদের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এই সংবাদ ঢাকায় পৌছুলে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন। ২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। শুরু হয়ে যায় একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন তীব্রতর হলে নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন। কিন্তু ৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদের বিরোধী দলের প্রতিবাদের ফলে প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপিত হলেও বাস্তবায়ন হয় নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কঠোর নীতি

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দুই এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। আন্দোলনকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তখনও ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কর্মসূচি

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। এই সময়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আকরাম খানকে সভাপতি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদে সভাসমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের এক উক্তিকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপলাভ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন

খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনিও জিন্নাহর মতো ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ৩১ জানুয়ারি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আন্দোলন দমন করার জন্য ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর মাধ্যমে ঢাকায় যেকোনো প্রকার সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা সরকারি এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নিতে পারে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলে সভা করে তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আবদুল মতিন, ওলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতারা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে জোড়ালো মত দেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বর) ছাত্রদের সমাবেশে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিকেলে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভার দিকে প্রতিবাদ মিছিল অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। মাতৃভাষার দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন– আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার এবং আহত হন কয়েকজন ছাত্রীসহ অনেকে। সে সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা শহীদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহীদ হন। অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩ ফেব্রুয়ারিতে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে। পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারির

হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফুলার রোডে একজন কিশোর নিহত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ডা. সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে রাতে মেডিকেল কলেজের গেইটের সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি তা উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহীদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ১৯৭২ সালে পূর্বের নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহীদ মিনারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষিত হয়। নিম্নে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত গণআন্দোলন। এটি শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠে নি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বাঙালিরা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

দ্বিতীয়ত, ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনগণের মানসিকতা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয় নি।

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালে সংবিধানে তা বহাল থাকে।

ভাষা আন্দোলনের শহীদগণ

পঞ্চমত, যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, ভাষা বৈষম্য তুলে ধরে। যা ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।

ষষ্ঠত, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ দলীয়ভাবে তাদের স্টাডি সেন্টারে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন একটি প্রভাত ফেরি আয়োজন করবে এবং প্রভাতফেরি শেষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবে।

সারাংশ

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ সময় পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজজীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ কোনো সহানুভূতি পায় নি। তাই তাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে সংঘবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে বুকের রক্ত দিয়ে। এই ঘটনা পূর্ববাংলার জনগণের মনের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলনে একুশের চেতনা সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন কোথায়?

i. রমনার রেসকোর্স ময়দানে
ii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

ক) নূরুল আমিন খ) খাজা নাজিমুদ্দিন
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান

৩। বর্তমান শহীদ মিনারের নকশা ও পরিকল্পনা কার?

ক) হামিদুর রহমান খ) ডা. সাঈদ হায়দার
গ) আবুল হাশিম ঘ) গোলাম মাহবুব

৪। কত খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি দেয়া হয়?

ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৯৯

সৃজনশীল প্রশ্ন

অ, আ, ক, খ আমার দুঃখীনি বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার রক্তাক্ত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার গর্বিত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার অহংকারী বর্ণমালা

ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট কী? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশটুকু আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. আপনি কী মনে করেন যে আমার বর্ণমালা অহংকারী ও গঠিত? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১১.৩ পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানি শাসকরা কীভাবে পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ কতটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বৈষম্য, পাট, চা, সেনাবাহিনী, শোষণ

ভূমিকা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় নি। বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ব বাংলাকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় যার সফল পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ

পূর্ব বাংলার সাথে পাকিস্তানি শাসকবর্গ প্রথম থেকেই বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল দুটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল নিয়ে। দুটি অঞ্চল সমান সম্পদের অধিকারি ছিল না। পূর্ব বাংলা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে সমৃদ্ধ। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান আয়তনে বড় হলেও অধিকাংশ অঞ্চল ছিল অনুর্বর ও মরুময়। সেখানে কৃষির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। এ অঞ্চল আর্থিক দিক থেকে ছিল দুর্বল। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে এখানে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় রপ্তানি পণ্য হিসেবে পাট, চা ও চামড়ার যোগান ছিল বেশি। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ দেশকে সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে এদেশের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। ফলে ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তান সমৃদ্ধ হতে থাকে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ট প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

পাকিস্তানের জনসংখ্যার প্রায় ৫৬% বাঙালি হলেও একমাত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আমল ছাড়া ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ২৫%-৪৭% অতিক্রম করে নি। ঐ সময়ে মোট ২২১ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৯৫ জন। আর ৯ জন সরকার প্রধানের মধ্যে মাত্র ৩ জন (খাজা নাজিমুদ্দিন, সোহরাওয়ার্দী ও মোহাম্মদ আলী বগুড়া) ছিলেন পূর্ব বাংলার। সময়ের হিসেবে ২৪ বছরের মধ্যে মাত্র ৬ বছর (২৫% সময়) পূর্ববাংলার মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। জেনারেল আইয়ুব খানের আমলে (১৯৫৮-৬৯)

মন্ত্রিসভার মোট ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ২২ জন (৩৫.৪৮%)। তবে এসব বাঙালিদের মধ্যে কেউ গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান নি।

প্রশাসনিক বৈষম্য

১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের মন্ত্রীপরিষদ, পররাষ্ট্র, কৃষি, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ৬৯ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন পাঞ্জাবি। বাঙালি ছিলেন মাত্র ৩ জন। বেসামরিক সিএসপি কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৯৪৮-৬৩ পর্যন্ত ৩৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ১২৬ জন (৩৬.৪%) ছিলেন বাঙালি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন ২১৮ জন (৬৩.৬%)।

সামাজিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। সরকারের অর্থনৈতিক এবং পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম থেকেই বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে দু'ধরণের সমাজজীবন পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের জীবনযাপন উন্নতমানের হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। বাঙালিরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে না পারে এজন্য তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগগ্রস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যেও দামের পার্থক্য থাকতো, যাতে তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেবার জন্য অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য ছিল। ক্ষমতার শীর্ষে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তাদের এই বৈষম্যমূলক নীতি সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত বাঙালি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশ এই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। উল্লেখ্য, সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি আধিপত্য নিশ্চিত করতে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে প্রাদেশিক কোটা নির্ধারণ করা হয়। এতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং বাদবাকি ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করার বিধান চালু করা হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানি শাসনামলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ছিল ভয়াবহ। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি। পূর্ববাংলা ছিল সম্পদশালী। এই সম্পদ এদেশবাসী ভোগ করতে পারত না। পাকিস্তানি শাসকরা তা ছিনিয়ে নিত। পুরো পাকিস্তানের আয়ের ৬০ ভাগ আয় হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হতে। অথচ আমাদের অঞ্চলে এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় করা হতো। আর বাকি সব নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ যেত পূর্বপাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানকে আমদানি দ্রব্যের মাত্র ২৫ ভাগ দেয়া হতো।

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৬০ ভাগের বসবাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু জাতীয় আয়ের মাত্র ২৭ ভাগ ব্যয় করা হতো এ অঞ্চলের জন্য। পাকিস্তানের অর্থ ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়েছে পূর্ববাংলার সম্পদে। কিন্তু এ দেশের উন্নয়নের দিকে কোনো নজর দেয়া হয় নি। তাই উর্বর পূর্ববাংলা বার বার বন্যা ও ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। আর মরুময় পশ্চিম পাকিস্তান হয়েছে আমাদের সম্পদে শস্য-শ্যামল।

শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তারও মালিকানা থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। কৃষি উন্নয়নের জন্য যে ঋণ পাওয়া যেত তার সিংহভাগ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তান

কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং এ আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রেও বাঙালিরা সুস্পষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের বেলায় ১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিই অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ফলে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেখানে প্রায় বিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে ২০৮৪.৬ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ হলেও পূর্ব পাকিস্তানে করা হয়েছে মাত্র ৭৯৭.৬ মিলিয়ন রুপি অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা চাকরির প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির মূল নিয়োগ দানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিজেদের মতো করে নীতি নির্ধারণ করা সহজ হতো। দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর সকল পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রধান দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে দেয়াই হতো না। এ ছাড়াও মনোনয়ন বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হতেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এসব কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পক্ষে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া ছিল খুব কঠিন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ। এদের ভাষা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অন্যদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৫ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে মাত্র ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে বাঙালিদের পাকিস্তানি করণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই বৈষম্য বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। তাই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ এবং পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ববাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আর একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চলে। যতদিন পর্যন্ত এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয় নি ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে নি। কিন্তু ক্রমে পাকিস্তানিদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কয়েক পর্যায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়–

প্রথমত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রতিবাদ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে নিয়ে। ৫৫% লোকের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে ১৯৪৮ ও ১৯৫২ সালে ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায়। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা হয়। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়।

তৃতীয়ত, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির বিরুদ্ধে বাঙালিরা আবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খানের সংবিধানের বিরুদ্ধে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন ক্রমে শিক্ষা রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে ছয় দফা ভিত্তিক, আগরতলা মামলা বিরোধী সর্বোপরি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের মাধ্যমে বৈষম্য বিরোধী প্রতিক্রিয়া সফল হয়।

চতুর্থত, পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ছিল ১৯৬৬ সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

পঞ্চমত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাঙালির রায় ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। যদিও বাঙালি জাতিকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ বৈষম্য-এর একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ববাংলা সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি পায় নি। তার বদলে সম্পদশালী পূর্ববাংলাকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ববাংলা। অবশেষে বাঙালিদের কাছে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবি ও পাঠান বাদে বাংলাসহ অপরাপর জাতির চাকুরির জন্য শতকরা কতভাগ কোটা নির্ধারণ করা হয়?

ক) ৫ খ) ২৫
গ) ৩৫ ঘ) ৬৫

২। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য করে?

i. অর্থনৈতিক
ii. প্রতিরক্ষা
iii. সাংস্কৃতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ১৯৭৪-৪৮ অর্থ বছরের পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের হার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে–

ক) কম খ) অনেক কম
গ) বেশি ঘ) অনেক বেশি

৪। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা কোন বৈষম্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক) শিক্ষা খ) সাংস্কৃতিক
গ) চাকুরি ঘ) সামাজিক

পাঠ-১১.৪ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কীভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	যুক্তফ্রন্ট, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, ২১ দফা

ভূমিকা

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন ছিল 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন জরুরি হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এই সময়ে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে *আওয়ামী মুসলিম লীগ*, *কৃষক-প্রজা পার্টি*, *পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি*, *নেজাম-ই-ইসলামী*, *পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস* প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের ভয়ে নানা টালবাহানায় নির্বাচনের তারিখ বারবার পিছিয়ে দেয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকারের প্রতি মুসলিম লীগ কোনো সম্মান দেখায় নি। তাই তাদের প্রতি পূর্ব বাংলার জনগণের কোন আস্থা ছিল না। মুসলিম লীগ সরকার বার বার নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের সম্মুখীন হয়। বিক্ষুব্ধ মানুষের চাপের মুখে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড় রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতোমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো ছিল মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী এবং হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার করা হয় ২১ দফা। ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

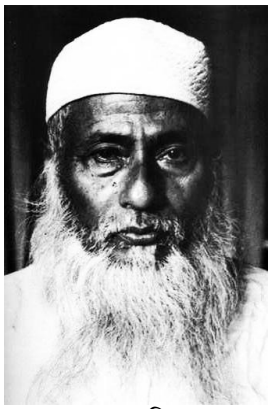
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসায় জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। এ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে।

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভের মধ্যে দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এদেশিয় দোসরদের দ্বারা প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। তাই তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে। অন্যদিকে বিভিন্ন দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হওয়ায় এই দলের ভেতর স্বাভাবিকভাবেই ভিন্নমতের নেতাদের উপস্থিতি ছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করলেও যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতা থেকে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতার বিষয়টি মুসলিম লীগের চোখে তেমন একটা ধরা পড়ে নি। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ে তারা খুব ভীত হয়ে পড়ে। এবার সুযোগ খুঁজতে থাকে কিভাবে এই বিজয়ের ফলাফলকে বানচাল করা যায়।

মন্ত্রিসভা গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।মে মাসে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। তাই শুরু থেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময়ে এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন।

তার এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ পেয়ে যান। তারা দেখতে পেলেন এই বক্তৃতার রেশ ধরে ফজলুল হককে অপসারণ করা যেতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। প্রচার করা হয় ফজলুল হক ভারতের কাছে পূর্ববাংলা বিক্রি করে দিতে চান। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে।

মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে। এই সময়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন। এ শাসন জারি ছিল ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পরাজয় কারণসমূহ চিহ্নিত করে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানি শাসক চক্রের শাসন ও শোষণে মানুষ মুসলিম লীগের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। এভাবে পূর্ববাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। তখন পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কত দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে?

ক) ৬ খ) ৮ গ) ১১ ঘ) ২১

২। কত খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৪৯ গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৫৪

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর লিখ।

বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে তথা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়।

৩। পাকিস্তানের ইতিহাসে উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথম জোটবদ্ধ দলটি কত খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে অংশ নেয়?

ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬ গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৭০

৪। উক্ত নির্বাচনে জয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে?

ক) এ কে ফজলুল হক খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

গ) আবু হোসেন সরকার ঘ) সৈয়দ আজিজুল হক

পাঠ-১১.৫ সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান জারি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সংবিধান, সামরিক শাসন, আইয়ুব খান, মৌলিক গণতন্ত্র

ভূমিকা

একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বিভিন্ন পর্যায় হতে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণয়নের জোড়ালো দাবি ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সংবিধান। এ সংবিধানের মাধ্যমে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। সংবিধানে সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃতি হয়। বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। তবে এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব বাংলার সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা নতুন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিহার কারণে এই কাজে বিলম্ব হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম। মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ হয় এবং কমিটির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হয়। মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়। ১৯৫৫ সালে গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান চালু ছিল মাত্র দু বছর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। সংবিধান স্থগিত করার সাথে সাথে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ

গোলাম মুহাম্মদের পদত্যাগের পর ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণ ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মধ্যে গোলযোগে পরিষদ কক্ষেই ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট মির্জা বেসামরিক শাসন অবসানের উদ্যোগ নেন।

সামরিক শাসন জারি

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসন ব্যবস্থায় একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।

সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। সংবিধান বাতিল, আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী উপরিউক্ত কার্যক্রমে প্রধান সহযোগী ছিলেন আইয়ুব খান। উচ্চবিলাসী আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে 'পোডো' (Public Office Disqualification Order, PODO) এবং 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order, EBDO) নামক দুটি আদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে একটি নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করা হয়। আইয়ুব খান ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরগুলো ছিল : ১. ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), ২. থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়) এবং তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), ৩. জেলা পরিষদ, ৪. বিভাগীয় পরিষদ। এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকতেন। এরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৯৬০ সালে এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬২ সালের সংবিধান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ পূর্ব-পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এই খবর পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকার গ্রেফতার নির্যাতন চালালে ছাত্র গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণরের ক্ষমতা সংকোচিত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়। এর প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালান। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপলাভ করে। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল চলাকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। ৮ জুন সামরিক আইন স্থগিত করে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কমিশন রিপোর্ট বাতিল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৬২ সালে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ অবস্থায় আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দলবিধি' প্রবর্তন করে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটান। আইয়ুব খান নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী দল সক্রিয় হয়। এসময়ে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এই ফ্রন্ট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party, COP) নামে একটি জোট গঠন করে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলও সরকারী দলের পক্ষে যায়। অবৈধ প্রভাব ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করেই আইয়ুব খান নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা প্রকাশিত হয়। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ একটি গনতান্ত্রিক দেশে সামরিক শাসন কী কী সংকট সৃষ্টি করতে পারে তার উপর একটি বিতর্কসভা আয়োজন করুন।

সারাংশ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার বিরোধী কার্যকলাপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের সূচনা করে। নানা রকম কূটকৌশল ও দমন নীপিড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তা আইয়ুবের শাসন ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫০

গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬২

২। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো–

ক) EBDO আদেশ জারি খ) PODO আদেশ জারি

গ) ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যু ঘ) সামরিক শাসন জারি

৩। কোন সমস্যার কারণে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

ক) তাসখন্দ খ) বাংলা

গ) পাঞ্জাব ঘ) কাশ্মীর

৪। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে–

ক) আদর্শ গণতন্ত্র খ) অভিনব গণতন্ত্র

গ) সার্বজনীন গণতন্ত্র ঘ) প্রচলিত গণতন্ত্র

পাঠ-১১.৬ ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছয় দফা দাবি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফা উত্থাপন করার পর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- এগার দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ছয় দফা, লাহোর, আগরতলা, এগার দফা

ভূমিকা

পাকিস্তানি শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সোচ্চার হন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। বিরোধী দলের এই সম্মেলন চলাকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখান করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল সম্মেলন বর্জন করেন। তারপর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে ঢাকায় চলে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ছয় দফাতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবী। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ-

ছয় দফার কর্মসূচিসমূহ

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২. শুধু দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে। অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. আঞ্চলিক সরকারে হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসেব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

প্রতিক্রিয়া

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ বিরোধী দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দিতে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করা

হয়। ছয় দফার পক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানে দিন দিন ছয় দফা জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আইয়ুব খানের সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়। তারা ধরপাকড় শুরু করে এবং ছয় দফাকে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুরু হয় হয়রানি ও নির্যাতন। বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পালন করে প্রতিবাদ দিবস। ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মানুষ মিছিল বের করে। এই দিন পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক মানুষ আহত হয়। পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ৮ জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

আগরতলা মামলা চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

সার্জেন্ট জহুরুল হক

এগার দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশকিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছয়দফা উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীগণ একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। এই দাবি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। তারা আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বিরোধী দলের অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই দমন নীতি তাদেরকে আরও প্রতিবাদী করে তোলে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে। তবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এতে থেমে যায় নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্ররা উত্থাপন করে এগার দফা দাবি। ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ছয় দফা কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে?

i. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

ii. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন

iii. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। আগরতলা ভারতের কোন রাজ্যের রাজধানী?

ক) আসাম খ) ত্রিপুরা গ) বিহার ঘ) পশ্চিবঙ্গ

৩। ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় কোন সম্মেলনে?

ক) ঢাকা খ) লাহোর গ) আগরতলা ঘ) রাজশাহী

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব 'ম' একটি অঞ্চলের বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি শাসক শ্রেণির বৈষম্যমূলক নীতি তথা শোষণের হাত থেকে জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি শাসক শ্রেণিকে কয়েকটি দাবি পেশ করেন। কিন্তু তারা দাবি না মেনে উক্ত নেতাকে একটি মামলায় কারাবন্দী করে প্রহসনমূলক বিচারের মুখোমুখি করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক. EBDO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. বর্ণিত দফাসমূহের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ উল্লিখিত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কী পাকিস্তানি শাসনের সমাধি তৈরি করেছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১১.৭ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	গণঅভ্যুত্থান, ডাকসু, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, আসাদ, মতিউর

ভূমিকা

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবার একসাথে আন্দোলনে নামে। আইয়ুব খানের পতনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। তাদের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর দশকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোন আস্থা ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতম হচ্ছিল।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান

১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তোলে। এ সময় আইয়ুব খান তাঁর শাসনকালের উন্নয়ন দশক (১৯৫৮-১৯৬৮) পালনের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নিকট আইয়ুব খানের শাসন ছিল শোষণ বঞ্চনা আর নির্যাতনের দশক। এই উন্নয়নের দশক পালন মানুষকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ায় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি মিলে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে।

জনসভার পর একটি বিরাট অংশ মিছিল করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে ৮ ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আওয়ামী লীগের ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১দফা দাবি পেশ করে।

এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক একটি মোর্চা গঠন করে ৮ দফা দাবি পেশ করে। এরপর 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডাক' এর আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।

ধর্মঘটে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা। পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল সরকারী পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও সরকার সমর্থক দৈনিক *মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিকশা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়। আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। মিছিলে যোগ দিতে থাকে অধিকহারে যুবক ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহুসংখ্যক মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হন।

মতিউর

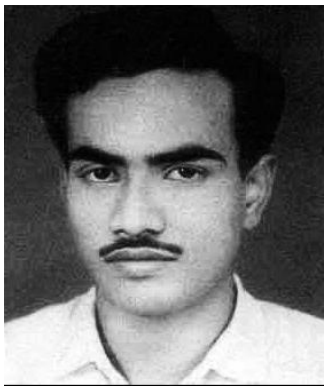

শহীদ আসাদ

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

শহীদ ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা

এরপর আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবস্থা বেগতিক দেখে বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়।

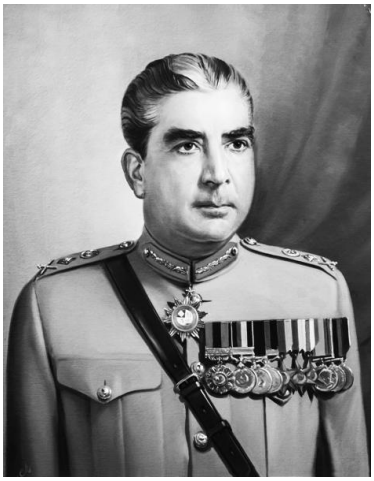

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার দাবি আদায় মূখ্য হয়ে উঠেছিল। গোলটেবিলের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে সরিয়ে দিয়ে ড. এম এন হুদাকে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাতেও গণআন্দোলন শান্ত হয় নি। তখন তিনি ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তার সাফল্যজনক পরিণতি আইয়ুব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা যে ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সারাংশ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইয়ুব খানের দমন নীতি, শোষণ নিপিড়ন, নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত গণরোষ বিপ্লবী করে তোলে প্রতিবাদী মানুষকে। মানুষের মিছিলের জোয়ারে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। আন্দোলনে শরিক হয় সমগ্র পূর্বপাকিস্তান। পুলিশ আর সৈন্যরা গুলি চালিয়েও থামাতে পারে নি আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারি প্রশাসন। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা 'ডাক' এর '৮' মহাত্ম হলো–
i. পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল
ii. প্রতিষ্ঠা ৮ই জানুয়ারি
iii. দাবির সংখ্যা ৮টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কেন বিখ্যাত?
ক) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যাহার খ) শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান
গ) সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা ঘ) আইয়ুব খানের পদত্যাগ

৩। ২৪ জানুয়ারিকে 'গণঅভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালন করা হয় কারণ ঐদিন–
i. সেক্রেটারিয়েট ভবনে আগুন লাগানো হয়
ii. দৈনিক মনিং নিউজ অফিসে আগুন লাগানো হয়
iii. সর্বস্তরের মানুষের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাম্প্রতিক সময়ে মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়। সরকারের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার এবং রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে এ আন্দোলন দানা বাধে। সরকার এ আন্দোলন দমন করতে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করলে শেষ পর্যন্ত সরকার পতনের এক দফার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন রচিত হয়। এ পর্যন্ত কয়েকটি দেশে জনতার বিজয় নিশ্চিত হয়।

ক. 'অপারেশন সার্চ লাইট' কী? ১
খ. ৭ মার্চের ভাষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন কী পরবর্তীতে স্বাধীকার অর্জনে প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১১.৮ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি, নির্বাচন পদ্ধতি, আসন বণ্টন প্রভৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, এক ইউনিট, আইন কাঠামো আদেশ, নির্বাচনী ইশতেহার, জুলফিকার আলী ভূট্টো, আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, সাইক্লোন।

ভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেশটির কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন চালু ছিল। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রথম দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। স্বভাবতঃই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জাতীয় পরিষদ গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি সামরিক আইনের অধীনে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে জারি করেন। ২৮ নভেম্বরের (১৯৬৯) বেতার ভাষণে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইয়াহিয়া খান দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রথমত ঃ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা দেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) ইয়াহিয়া খান আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেমন,

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার,
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন,
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা,
৪. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা এবং
৫. পাকিস্তানে একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ঘোষণা করা হয় 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal Frame Work Order, LFO)।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

নির্বাচন

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭ সংরক্ষিত নারী আসনসহ বরাদ্দকৃত আসন ছিল ১৬৯ টি। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির নূরুল আমিন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে)। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

পর্যালোচনা

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো মিল ছিল না।

৩. পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল রায় ছিল ৬ দফার প্রতি গণরায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেটস্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে প্রত্যাখান করে।

নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতি

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান করে। আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। পক্ষান্তরে পিপিপি সহ অন্যান্য দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। ভূট্টো হুমকি দেন যে, তাঁর মতামত গ্রহণ করা না হলে তাঁর দল জাতীয় সংসদে অধিবেশন বয়কট করবে। প্রত্যুত্তরে আওয়ামী লীগও তাদের দাবিতে অটুট থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর দাবিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পুরো পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় মার্চের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে নিজের ভাষায় একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এক ব্যক্তি এক ভোট ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করায় এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি সাধারণ ও ৭টি মহিলা আসন লাভ করার মাধ্যমে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের অবসানের পর কে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) টিক্কা খান
খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো
গ) লিয়াকত আলী খান
ঘ) ইয়াহিয়া খান

২। নিচের ছকটি দেখে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

নির্বাচন	মোট আসন সংখ্যা	আওয়ামীলীগ	পিপলস পার্টি
জাতীয় পরিষদ	৩১৩	১৬৭	৮৮
প্রাদেশিক পরিষদ	৩০০	২৮৮	-

উদ্দীপকে (ছকে) কত সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে?

ক) ১৯৫৪
খ) ১৯৬৫
গ) ১৯৭০
ঘ) ১৯৭৩

৩। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক) পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে
খ) পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়
গ) পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়
ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়

৪। বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ বাঙালিদের দুঃসময়ে এগিয়ে আসলেও পাকিস্তানের শাসকবর্গ নিষ্ক্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেয়?

ক) ১৯৬৯ সালের জলোচ্ছ্বাস
খ) ১৯৭০ সালের ঘুর্ণিঝড়
গ) ১৯৭১ সালের দুর্ভিক্ষ
ঘ) ১৯৭২ সালের বন্যা

পাঠ-১১.৯ অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পূর্ব পাকিস্তান, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন, টিক্কা খান, পল্টন ময়দান, স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ৭ মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা।

৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে পুরো পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১ তারিখেই পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র গণজমায়েত শেষে ডাকসু'র ভিপি আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। ইশতেহারে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করা হয়। এখানে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করার প্রতি জোর দেওয়া হয়। তখন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সকল কর্মপন্থা ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে;
২. আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি বাহিনী গঠন করতে হবে;
৩. সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে, ইত্যাদি।

২ মার্চ হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। তখনকার আন্দোলন কর্মসূচিতে ছিল : ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। পাশাপাশি ৭ মার্চ বেলা ২ টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথাও বলা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ (১৯৭১) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। একই দিন জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান।

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ

হরতাল ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহিংসতার দিকে মোড় নিতে শুরু করে। পুরো পূর্ব বাংলার মানুষ আন্দোলনে ফুঁসে উঠতে শুরু করে। এমনি পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স

ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন-

ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;

খ) অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;

গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং

ঘ) (জাতীয় অধিবেশনের পূর্বেই) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এই শর্তগুলো মানলেই যে শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এমন নিশ্চয়তা তিনি ভাষণে দেননি। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন। বিশেষ করে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে তিনি উচ্চারণ করেন। এই ভাষণে তিনি যে সংগ্রামের ঘোষণা দেন, তার সূচনা ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিব যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন তা না পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল অসহযোগ। ইতোমধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি শীর্ষক ইশতেহার প্রচারের ফলে স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, এমনটাই ছিল জনপ্রত্যাশা। কিন্তু স্বাধিকার, স্বাধীনতা অর্জন কিংবা আলাদা কোনো দেশ সৃষ্টির দাবির বিষয়ে তিনি তার ভাষণে স্পষ্ট করে কিছু না বলায় পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষ কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এই ভাষণের পর উদ্ভূত পরিস্থিতে এ ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নতুন প্রস্তাবনা ও সমঝোতার প্রচেষ্টা

পূর্ব পাকিস্তানে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করেন। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান সমঝোতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন জেনারেলসহ ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আগত। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলাকালেই ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান বুঝতে পারেন এই সংকট আর রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার সাধ্য তাদের নেই। তাই সামরিক হামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে দমনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আসা হয় আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে। পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর পরিচালিত হিংস্র সেই হামলার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ইয়াহিয়া খান আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐদিন মধ্য রাতেই ৩ ব্যাটেলিয়ান পাকিস্তানি সৈন্য 'অপারেশন সার্চলাইটে' অংশ গ্রহণ করে। তারা ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানদার বাহিনীর নির্মম আক্রমণে প্রাণ হারায় প্রায় বিপুল সংখ্যক নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালি। এভাবেই তারা সংঘটিত করে ইতিহাসের বর্বরতম এক গণহত্যা। এ বিভৎস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় গোটা জাতি বিস্ময়বিমুঢ় হয়ে পড়ে।

ঐদিন রাত ১:৩০ টায় পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে শেখ মুজিবকে আত্মগোপন করার জন্য তার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী ও সুহৃদগণ পরামর্শ দিলেও তিনি তা না করে নিজ গৃহে অবস্থান করেন। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে সহজেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়েই তাঁকে বন্দি রাখা হয়। ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বিভিন্ন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তার বন্দি হওয়ার খবরটি প্রকাশিত হলে জাতি তা জানতে পারে। গ্রেফতারের পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিকনির্দেশনা না দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার ফলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ কী ধরণের সংকট তৈরি হয় তার উপর একটি রচনা তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে লাগাতারভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যা ইতিহাসে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে আছে। ১৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার অভিনয় করেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলে ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। এ অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্থ জাতিকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান না করেই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ চরম সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় কোথায়?

ক) কলাভবন খ) সংসদভবন
গ) রেসকোর্স ঘ) বাংলামোটর

২। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন কে?

ক) মোশতাক আহমদ খ) আ স ম আবদুর রব
গ) তোফায়েল আহমদ ঘ) নেয়ামত আলী

৩। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' কোথায় গঠনের কথা বলা হয়?

i) মহকুমা
ii) শহর
iii) জেলায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.১০ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের ঘটনা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বাধীনতার ঘোষণা, জিয়াউর রহমান, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশীদের উপর নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬ প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগের প্রধান সারির নেতৃবৃন্দ জীবনের নিরাপত্তা ও কৌশলগত কারণে আত্মগোপনে চলে যান। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না পাওয়ায় তাদের কেউ কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয়ের জন্য রওয়ানা দেন। এ ভাবেই বাঙালি জাতির জীবনে এক চরম ক্রান্তিকাল উপস্থিত হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাদের দাবি অনুযায়ী ঘোষণাটি ই পি আর-এর ওয়ারলেস যোগে চট্টগ্রামে তাঁর ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগী জহুর আহমেদ চৌধুরী কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত একটি সরকারি বাহিনীর ওয়্যারলেস ব্যবস্থা, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তারাও দায়িত্বরত ছিলেন, ব্যবহার করে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণ করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়।

এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদ এর লেখা "তাজউদ্দিন আহমেদ: নেতা ও পিতা' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃ. ৪৪-৪৫ দ্রষ্টব্য) ২৫ মার্চ কালরাত ও শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার এ ঘোষণা বিষয়ে সংশয় তৈরি হয়। তার বর্ণনা মতে, পুরো জাতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেই গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালি জাতির এক মহাদুর্যোগকালে চট্টগ্রামস্থ সেনাবাহিনীর অষ্টম রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান কাপ্তারী হিসেবে হাজির হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় হত্যাকান্ডের সংবাদ শুনেই চট্টগ্রামে প্রথম প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'We revolt' বলে তিনি পকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জিয়া তাঁর অধীনস্ত সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেন। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী অফিসারগণ তাঁদের রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ও অন্যান্য অবাঙালি অফিসারদের গ্রেফতার ও হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জিয়াকে বিদ্রোহ করতে কেউ নির্দেশ দেয়নি বা আহ্বান জানায়নি। দেশের জন্য নিজের যে কর্তবববোধ তা থেকেই দেশ মাতৃকার চরম দুর্দিনে জিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে চট্টগ্রামের কালুরঘাটে একটি অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে জিয়াউর রহমান এই অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে নিজ নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। জিয়াউর রহমানের প্রদত্ত ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ:

"প্রিয় সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, প্রভিশানাল প্রেসিডেন্ট এবং লিবারেশন আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ', এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি, বাংলাদেশ স্বাধীন। আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করছি। আমাদের যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আমাদেরই হবে।" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, জিয়ার পূর্বোক্ত ঘোষণাটি অন্য কারো লেখা ছিল না। তিনি নিজেই এ ঘোষণাটি লিখেছিলেন। প্রথম ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি কৌশলগত কারণে এর আংশিক সংশোধন করেন এবং দ্বিতীয় ঘোষণাটিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন। প্রথম ঘোষণায় তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করলেও পরবর্তী ঘোষণায় তিনি নিজেকে 'প্রভিশনাল কমান্ডার-ইন-চিফ অব দ্যা বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি' হিসেবে উল্লেখ করেন।

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ইংরেজি ও বাংলা দু'ভাষাতেই পঠিত হয়েছিল। ঘোষণায় তিনি বাংলাদেশে পরিচালিত পাশবিক গণহত্যার বিরুদ্ধে যার যার দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সকল সরকারের কাছেও আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌম ও আইনানুগ সরকার বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জাতির স্বীকৃতির দাবিদার বলে উল্লেখ করেন। জিয়া তাঁর ঘোষণায় আরো বলেছিলেন, 'আমরা কুকুর-বিড়ালের মতো মরব না, বরং বাংলা মায়ের যোগ্য নাগরিক হিসেবে মরব।"

মেজর জিয়া তাঁর বেতার ঘোষণায় শেষ শত্রুটি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন। মেজর জিয়ার নির্দেশে পরবর্তীতে তাঁর পূর্বোক্ত ঘোষণাটি কিছুক্ষণ পরপর বেতার থেকে নিউজ বুলেটিন আকারে প্রচার করা হয়। ৩০ মার্চ একই বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের আরেকটি বিবৃতি প্রচারিত হয়, যাতে তিনি পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে দেওয়া জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালি জাতির চরম দুর্যোগ মুহূর্তে কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসা জিয়ার কণ্ঠস্বর 'আমি মেজর জিয়া বলছি' দীর্ঘ সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ বাঙালি জাতিকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাঁর স্বাধীনতার এ ঘোষণা দিশেহারা মানুষকে স্বস্তি দিয়েছিল, উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশি-বিদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের লেখনীর আলোকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বস্তুত, জিয়ার এই স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের মানুষদের জন্য এক মুক্তিবার্তা। এই বার্তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের বীর জনতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এক অকুতোভয় বীরযোদ্ধা। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যুদ্ধ পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত রণাঙ্গণকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১নং সেক্টরের (চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা) অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেজর জিয়া। ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নিয়মিত বাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে একটি ব্রিগেড তৈরি করে মেজর জিয়াকে এর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। অধিনায়ক মেজর জিয়ার নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স'।

বাঙালি জাতির এক চরম ক্রান্তিকালে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ও রণাঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী বীর যোদ্ধা হিসেবে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নিজের অক্ষয় স্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান, বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য তিনি একদিকে যেমন বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ও বীরত্বব্যঞ্জক অবদানের জন্য জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানকে দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পথ সুগম করে দেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে সবার আগে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এরপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

শহিদ জিয়াউর রহমান

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট নামের প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলেছিল প্রায় নয় মাস। এ যুদ্ধ আপামর জনসাধারণের কাছে মুক্তিযুদ্ধ নামেই পরিচিত। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সে কারণে এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে। এ জন্য দিবসটি আমাদের কাছে বিজয় দিবস নামে পরিচিত ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বিবরণ তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

২৫মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামের গণহত্যা শুরু করে। মেজর জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করেন। তারপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ

গ) ১৪ ডিসেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

২। কে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?

ক) আতাউল গনি ওসমানি খ) মাওলানা ভাসানী

গ) শহিদ জিয়াউর রহমান ঘ) অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ

৩। আকলিমা রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঘুরতে এসে জেনেছে ১৯৭১ সালে এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন পুলিশ বাহিনীর অসংখ্য সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত–

i) ২৫ মার্চ গভীর রাত

ii) অপারেশন ক্লিনহার্ট

iii) অপারেশন সার্চলাইট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.১১ প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রবাসী সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রবাসী সরকার গঠনের পটভূমি ও সরকারের সদস্যদের নাম বর্ণনা করতে পারবেন;
- ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণালাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রবাসী সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, ইন্দিরা গান্ধী, তাজউদ্দিন আহমদ, ১১টি সেক্টর।

প্রবাসী সরকার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয় ও অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জনের সময় পর্যন্ত এই সরকারের কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক। প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করা, দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা ছিল এই সরকারের সাফল্য। পাশপাশি স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

পটভূমি

মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত চলে যান। তারা ১ এপ্রিল 'ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় দিল্লি পৌঁছান। তারা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারপর তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী সরকার গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাখা হয় রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম নির্বাচিত করা হয়।

তাজউদ্দীন এই সরকারের অপর তিন মন্ত্রী নির্বাচিত করেন যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। তাজউদ্দীন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সংকটময় সময়ে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই প্রবাসী সরকারকে ভারত স্বীকৃতি প্রদান করে এপ্রিলের ৪ থেকে ৬ তারিখের মধ্যে। এপ্রিলের ৮ অথবা ৯ তারিখ তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে শুরুতে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমেদের দৃঢ়তার ফলে সরকার সুগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

তাজউদ্দিন আহমেদ ১২ এপ্রিল মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান	-	প্রেসিডেন্ট
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	-	ভাইস-প্রেসিডেন্ট
তাজউদ্দীন আহমেদ	-	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক আহমদ	-	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান	-	অভ্যন্তরীণ সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	-	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প

শেখ মুজিবুর রহমান

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমেদ

খন্দকার মোশতাক আহমদ

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

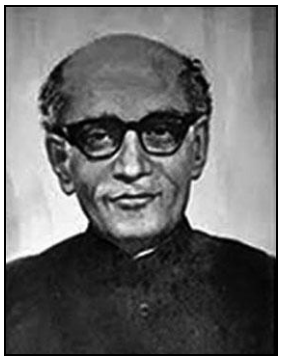
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১৭ এপ্রিল (১৯৭১) নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। বাংলাদেশ সরকার কখনই বৈদ্যনাথতলায় অবস্থান করেননি। সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কোলকাতায়।

প্রবাসী সরকার ও মুক্তিবাহিনী

শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য সুশৃঙ্খল সামরিক কাঠামোর অধীনে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। এই দিকে তাজউদ্দীন আহমেদ নজর দিয়েছিলেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ এপ্রিল বেতারে তিনি একটি ভাষণ দেন। এখানে তিনি সারা দেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেছিলেন। তারপর গঠন করা হয় মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ১১ টি সেক্টর। মুক্তিযুদ্ধের ১১ টি সেক্টর হলো:

১ নং সেক্টর

চট্টগ্রাম ও পাবর্ত্য চট্টগ্রাম এলাকা ছিল ১ নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। ফেনী নদী থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি ও ফেনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এই সেক্টর। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে মেজর জিয়াউর রহমান দায়িত্বরত ছিলেন।

২ নং সেক্টর

ঢাকা, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও কুমিল্লার অংশবিশেষ ছিল সেক্টর ২ এর অংশ। মেজর কেএম খালেদ মোশাররফ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর এটিএম হায়দার এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন।

৩ নং সেক্টর

কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ ছিল ৩ নং সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত। হবিগঞ্জ, আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ এবং কিশোরগঞ্জ ও ঢাকার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৩ নং সেক্টর। মেজর কেএম শফিউল্লাহ

এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন । মেজর এএনএম নুরুজ্জামান সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন ।

৪ নং সেক্টর

মৌলভীবাজার ও সিলেটের পূর্বাংশ সেক্টর ৪ এর অংশ ছিল। মূলত সিলেট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল ৪ নং সেক্টর। মেজর সিআর (চিত্তরঞ্জন) দত্ত এবং ক্যাপ্টেন এ রব ছিলেন সেক্টর নং ৪ এর কমান্ডার।

৫ নং সেক্টর

বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং সিলেট জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ৫ নং সেক্টর। সেক্টর নং ৫ এর সদর দপ্তর ছিল সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকের বাঁশতলায়। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর মীর শওকত আলী ।

৬ নং সেক্টর

রংপুর বিভাগ ছিল সেক্টর ৬-এর অন্তর্ভুক্ত। দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহাকুমা ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৬। কমান্ডার এমকে বাশার সেক্টর নং ৬-এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৭ নং সেক্টর

রাজশাহী বিভাগ ছিল সেক্টর ৭-এর অন্তর্ভুক্ত। রাজশাহী, পাবনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বগুড়া, দিনাজপুরের দক্ষিণ অঞ্চল ও রংপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৭। মেজর নাজমুল হক, সুবেদার মেজর এ রব ও মেজর কাজী নুরুজ্জামান- এই তিনজন সেক্টর নং ৭ এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৮ নং সেক্টর

কুষ্টিয়া, যশোর, দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলা ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৮। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার হিসেবে মেজর আবু ওসমান চৌধুরী দায়িত্বরত ছিলেন ও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ মঞ্জুর।

৯ নং সেক্টর

সুন্দরবন ও বরিশাল বিভাগ সেক্টর ৯ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ৯। এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল।

১০ নং সেক্টর

সকল নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল ছিল সেক্টর নং ১০-এর অংশ। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, নৌ কমান্ডো ও আভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন সেক্টর নং ১০-এর অধীনে ছিল। ১০ নং সেক্টরের কোনো সাব-সেক্টর ছিল না এবং ছিল না নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডার। এই সেক্টরে নৌ কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে মিশনে নিয়োজিত থাকতেন, তখন সে সেক্টরের কমান্ডারের নির্দেশে কাজ করতেন।

১১ নং সেক্টর

বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগ ছিল সেক্টর নং ১১-এর অন্তর্ভুক্ত। কিশোরগঞ্জ বাদে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল সেক্টর নং ১১। মেজর এম আবু তাহের এপ্রিল থেকে ৩ই নভেম্বর পর্যন্ত ১১ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তারপর এই সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ফ্লাইট লেফট্যান্যান্ট এম হামিদুল্লাহ।

প্রবাসী সরকারের দপ্তর বণ্টন হলে তাজউদ্দীন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রাখেন। ১৪ এপ্রিল কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক। মে ও জুন মাসে তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। ফোর্সগুলির নাম ছিল: 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' এবং 'কে ফোর্স'। অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান, লেঃ কর্ণেল কে. এম সফিউল্লাহ ও লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ।

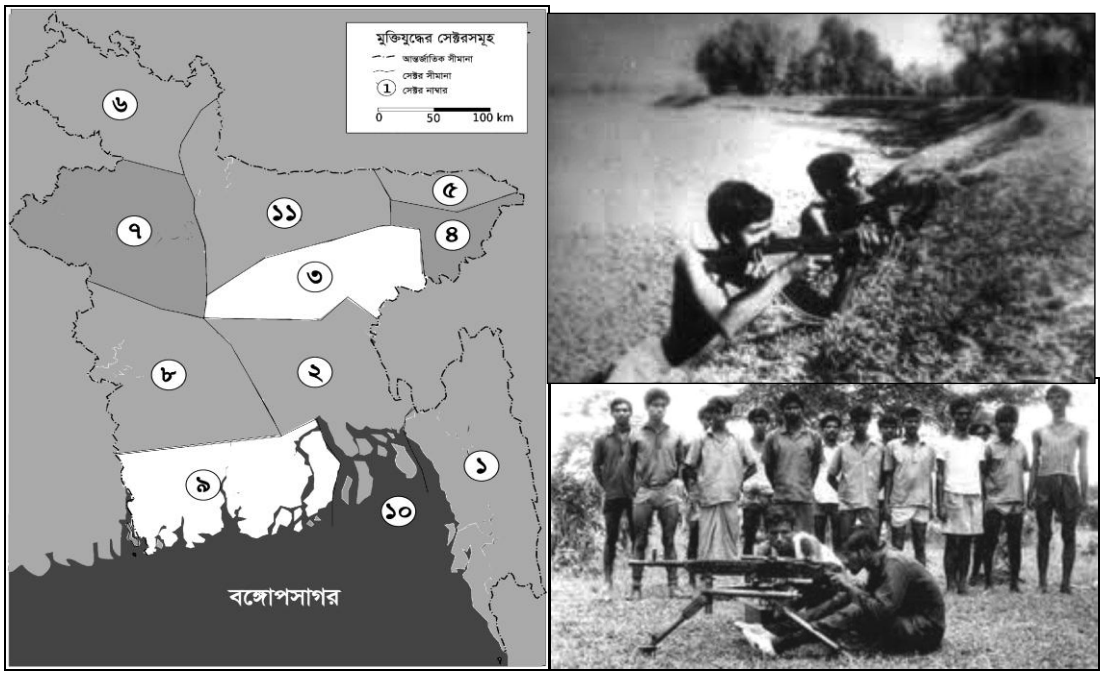

মুক্তিযুদ্ধের ১১টি সেক্টর এবং ৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামে অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপি.আর.-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

২৮ সেপ্টেম্বর এ.কে. খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করা নৌসেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া নৌকমান্ডোও গঠিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের গৌরবময় পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের বিজয়ের মাধ্যমে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। দেশের ভয়াবহ সংকটের মুখে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে। এরপর মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রবাসী সরকার ১০ এপ্রিল সারাদেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেন। ১১ থেকে ১৭ জুলাই উক্ত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৈদ্যনাথতলা কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞানমূলক)
ক) মেহেরপুর খ) ফরিদপুর
গ) যশোর ঘ) খুলনা

২। প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল কেন?
ক) দেশের অর্থ সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার জন্য খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য
গ) উজ্জীবিত বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ঘ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বহির্বিশ্বের সহায়তা লাভের চেষ্টার জন্য

৩। সৈয়দ নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য–
i) তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা
ii) তিনি প্রবাসী সরকারের উপরাষ্ট্রপতি
iii) তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
ক) ৮ টি খ) ৯ টি গ) ১০ টি ঘ) ১১ টি

৫। মুক্তিযুদ্ধকালে ব্রিগেড ফোর্স হিসেবে কোনটি সঠিক নয় ?
ক) জেড ফোর্স খ) কে ফোর্স গ) এস ফোর্স ঘ) এল ফোর্স

পাঠ-১১.১২ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও পেশাজীবী শ্রেণির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা ও ভারতের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে দালাল, রাজাকার, আলবদর-আলশামসদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বুদ্ধিজীবী, 'পূর্ববাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ', 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' তারামন বিবি, সিতারা বেগম, বামপন্থী দল, প্রবাসী বাঙালি, জর্জ হ্যারিসন, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, ইন্দিরা গান্ধী, পিস কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, বিহারী, টিক্কা খান, নারী নির্যাতন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের অতি দ্রুত জয়লাভের কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, নারী, শ্রমিক ও আপামর জনসাধারণের সমর্থন, প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ, ভারতের সমর্থন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

ক. ছাত্রদের ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৭৫% ছিল ছাত্র, যাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে– যেমন সেকশন কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল বেশি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ছাত্ররাই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে মাত্র তিন সপ্তাহের সামরিক ট্রেনিংকে সম্বল করে তারা নিজ জীবনকে বাজি রেখে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে যারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কেউ শরণার্থী শিবিরে ও ইয়োথ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে। কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মুক্তি যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছে।

খ. বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করা, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, প্রচার মাধ্যমকে সচল রাখার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা, রেডিওতে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম প্রচার করা, প্রবাসী সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এসব কাজের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কেবল ১৯৭১ সালেই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তাতেও বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেসময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ব বাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' (৬.৩.১৯৭১), 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' (৬.৩.১৯৭১) ইত্যাদি সংগঠন। তাছাড়া শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, আইনজীবী সমিতি, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ও বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির ব্যানারে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণির সদস্যবৃন্দ রাস্তায় নেমে আসেন এবং বিভিন্ন মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অসংখ্য শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অসামরিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন: প্রবাসী শিক্ষকগণ ভারতীয় শিক্ষকবৃন্দের নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ২১ মে (১৯৭১) গঠন করেন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল কোলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'।

ভারতের শিক্ষকগণের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শরণার্থী শিবিরে ৫৬ টি স্কুল চালু করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি 'বাংলাদেশ : দ্যা রিয়েলিটি', 'বাংলাদেশ : দ্যা ট্রুথ' প্রভৃতি নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকার, চারু ও কারু শিল্পী প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইনটেলিজেন্টশিয়া'। এই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত গঠনের কাজ করে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে নারী

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। কেউ সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারীরূপে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার রান্না করে, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে, সেবাদান করে ইত্যাদি নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিটি নারী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন ও স্ত্রী-এর যেকোনো একটি। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো: কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা স্কোয়াড-এর আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর ট্রেনিং হয়। রণাঙ্গনের যোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। চিকিৎসার কাজে নারী চিকিৎসকগণের গৌরবময় দৃষ্টান্ত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম। তিনিও বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন। জনমতগঠনে দেশী-বিদেশী নারী মহিলা সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবংগ মহিলা সমিতি, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রশংসনীয় অবদান ছিল।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দল

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মস্কোপন্থী বামদলগুলো যেমন কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ), ন্যাপ (মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও কৃষক সমিতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চারদলের প্রায় ছয় হাজার সদস্য বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা পালন করে এবং স্পেশাল গেরিলা বাহিনীর ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল বাহিনীর একটি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরে আসার পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

চ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে (যেখানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন) বাঙালিরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন, স্মারকলিপি দেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লন্ডনে ইউরোপের অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিরা এসে মিলিত হতেন। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদেশের দূতাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : কোলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের হোসেন আলী এবং অন্যান্য বাঙালি স্টাফ (১৮.০৪.৭১), নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেলের ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী (২৬.০৪.৭১), লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ (১.০৮.৭১), ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসে ইকনমিক কাউন্সিল পদে কর্মরত আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১.০৮.৭১),

আবুল ফতেহ (ইরাকে কর্মরত ২১.০৮.৭১), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (দিল্লীতে কর্মরত, ৪.১০.৭১), আবদুল মোমিন (আর্জেন্টিনায় কর্মরত, ১১.১০.৭১), ওয়ালিউর রহমান (সুইজারল্যান্ডে কর্মরত, ০৩.১১.৭১) প্রমুখ।

ছ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও সেদেশের নাগরিকেরা বাঙালিদের সমর্থনে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা বাঙালিদের সংগে রাস্তায় নেমেছেন। পাকিস্তানে সিভিল সমাজের অনেকেই বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক কবি বাঙালি শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারের দানের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে অনশন করেছেন। বুয়েনস আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোহের্স, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জর্জ হ্যারিসন, রিংগো স্টার, লিয়ন রাসেল, ওস্তাদ রবিশঙ্কর প্রমুখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। জন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গ বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছেন।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠি

লে. জেনারেল টিক্কা খান ৬ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও ৭ মার্চ গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ঐ দুই পদে বহাল থাকেন। ২ সেপ্টেম্বর ডা. এ.এম. মালিক গভর্নর এবং লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়। ডা. মালিকের নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর বাঙালিদের এক মন্ত্রিসভা গঠন করার মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সকল বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক নয়। এসব বিশ্বাসঘাতক বাঙালিরাই মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সরকারের বাইরে থেকেই সৃষ্টি করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, সারাদেশে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও বিডি মেম্বারদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পিস কমিটি। এসব পিস কমিটির সদস্য এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ওপর চালিয়েছিল অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও তা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য কাজ।

শান্তি কমিটি

৯ এপ্রিল (১৯৭১) ঢাকায় ডানপন্থী বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করে। ১৪ এপ্রিল কমিটির নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। পরে জেলা, মহকুমা, থানা ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি কমিটি সাধারণ মানুষের কাছে পিস কমিটি নামে বেশি পরিচিত। পিস কমিটির সদস্যদেরকে দালাল বলা হয়। এখনও মানুষ রাজাকার ও দালালকে আলাদা নামে চেনে। রাজাকার বাহিনী গঠন, রাজাকারদেরকে পরিচালনা করা, রাজাকারের অপকর্মকে সম্মতি দেয়া এবং রাজাকারকে দিয়ে লূটপাট, অগ্নিসংযোগ করা, মেয়েদেরকে ধরে আনা এসব কাজ দালালরাই করেছে।

রাজাকার বাহিনী

লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ৭১' জারি করেন। তার পূর্বেই '৭১-এর মে মাসে মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ ৯৬ জন জামায়াত কর্মীর সমন্বয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে 'রাজাকার বাহিনী' গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যান্সে এই নাম গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফ রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান রক্ষার সংগ্রামের চাইতে লুটপাট, ছিনতাই, নারী ধর্ষণ এসব কাজে মগ্ন থেকেছে। মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান দেওয়া, হানাদার বাহিনীকে তাদের বাড়িঘর চিনিয়ে দেওয়া, গ্রাম থেকে গরু-ছাগল-মুরগি ধরে এনে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে সরবরাহ করা, গ্রাম থেকে যুবতী নারী ধরে এনে আর্মি ক্যাম্পে সরবরাহ করা ইত্যাদি অপকর্মে রাজাকারদের নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

আলবদর বাহিনী

রাজাকার বাহিনী গঠনের পর আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তবে রাজাকারের অধ্যাদেশের মত এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উদ্যোগ ও প্রেরণায় এই বাহিনী গঠিত হয়। আলবদরদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে

পাকিস্তান বাহিনী। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরাই আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই বাহিনীর কাজ ছিল দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ভাবধারার সমর্থক ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক শ্রেণিকে হত্যা করা।

আলশামস বাহিনী ও বিহারী সম্প্রদায়

আলশামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানত অবাঙালি (বিহারি)-দের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী বাহিনী এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এবং বাঙালি নিধনে দেয় অবাধ অধিকার। বাঙালির সম্পদ লুট করতেও এদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে বিহারী সম্প্রদায় যে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা অকল্পনীয়। শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর বাহিনী প্রধানত গঠিত হয়েছে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মীয় পাকিস্তান পন্থী দলের কর্মী ও বিহারিদের দ্বারা। তবে, নৃশংস আলবদর বাহিনী গঠিত হয়েছিল জামায়াতের ছাত্র সংগঠন ছাত্রসংঘের সদস্যদের দ্বারা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ও দল সম্পর্কে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, পেশাজীবী শ্রেণি, শিল্পী, খেলোয়াড়, প্রবাসী বাঙালি প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও অবদান ছিল। অনেক বিদেশী নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তান সরকারকে ও বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে–

i) কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক ii) পুলিশ ইপিআর সেনাবাহিনী iii) আলবদর আল শামসবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে কতজন নারী সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহন করেন? (জ্ঞান)

ক) ২০০ জন খ) ৪০০ জন

গ) ৬০০ জন ঘ) ৮০০ জন

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন, শুধু এদেশের সর্বস্তরের জনগণই নয় অনেক দল ও সংগঠন এমনকি অনেক দেশ ও এ যুদ্ধে সহায়তা করেছে প্রতিবেশী একটি দেশ প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে সে সময় আশ্রয় দেয়। যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা তৈরির সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছিল।

৩। এদেশকে বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করেছিল– (অনুধাবন)

i) অধিকাংশ রাজনৈতিক দল
ii) পেশাজীবী সংগঠন
iii) সেনাবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন দেশের কথা বলা হয়েছে–

ক) চীন খ) নেপাল
গ) ভারত ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বুয়েনস আয়ার্সে মিছিল করেছেন–

i) বোহের্স ii) অ্যালেন গিনসবার্গ iii) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ ঃ ১। ক ২। ক ৩। খ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ ঃ ১। ক ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ ঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ ঃ ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৬ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৭ ঃ ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৮ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৯ ঃ ১। গ ২। ক ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১০ ঃ ১। ঘ ২। ক ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১১ ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। খ